Contents

তালবীসুল ইবলীস

শয়তানের ধোঁকা

ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ)

তালবীসুল ইবলীস

[শয়তানের ধোকা]

মূল ঃ
হযরত আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ জাওযী

অনুবাদ ঃ
আবদুল জলীল

হক লাইব্রেরী
আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
১৮, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

গোযারেশ

আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে এবং পরকালে মুক্তি পাওয়ার মানসেই আমরা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের পরম শত্রু শয়তান কিভাবে যে চক্রান্ত করিয়া এই পথে বাধা দিয়া বিপথ এবং বিপদগামী করে—তাহা আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। ফলে ইবাদত বন্দেগীতে পুণ্য লাভ হওয়ার পরিবর্তে জাহান্নামের পথই মুক্ত হয় বেশী। শয়তান এমন সূক্ষ্মভাবে তাহার কাজ করিয়া যায় যে—উহা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যাহা পাপ এবং অন্যায় শয়তান উহাই আমাদের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া দেখায়। আল্লাহ ওয়ালা বিশিষ্ট আলেমগণই শয়তানের এইসব চক্রান্ত ধরিতে পারেন।

তালবীসুল ইবলীস অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়বস্তুই উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত হইতে নিরাপদে রাখিয়া একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানার্থে আমাদিগকে ইবাদত বন্দেগী করার তাওফীক দিন—আল্লাহর দরবারে ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা। আমীন—

বিনীত—

অনুবাদক

প্রকাশকের আরজ

শয়তান মানুষের জাতশত্রু ; বিভিন্নরূপে চক্রান্ত করিয়া সে আদম-সন্তানকে বিভ্রান্ত করিবে ; ধোকায় ফেলিবে—এই প্রত্যয় সে সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে সরাসরি ব্যক্ত করিয়াছে। সে নিজে এ কথাও বলিয়াছে—"কিন্তু হে প্রতিপালক ! তোমার খাঁটি বান্দারা ব্যতিক্রমভুক্ত ; তাহাদের উপর আমি পারঙ্গম নই।"

শয়তান তাহার সূক্ষ্ম চাল চালনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করে না। পাপ ও অন্যায়কে সে সুন্দর চাকচিক্যময় করিয়া খাঁটিদেরকে ধোকাগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করে। সূক্ষ্মদর্শীরা ব্যতীত শয়তানের এইসব চক্রান্ত অনুধাবন করা এবং ইহা হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব হয় না।

বক্ষ্যমান পুস্তিকায় শয়তানের এহেন বহুবিধ চক্রান্ত বিষয়কেই সবিস্তার তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

'তালবীসুল ইবলীস' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী মুহাক্কিক আল্লামা আবদুর রহমান ইবনে জাওযী (রহঃ) রচিত মহামূল্যবান সমাহার। সমাজে গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া আমাদের এ প্রকাশনা-প্রয়াস।

আল্লাহ্ পাক এ মেহনতটুকু কবূল করুন, সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন এবং শয়তান ইবলীসের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া দ্বীনের পথে অগ্রসর হইয়া দোজাহানের কামিয়াবী হাসিল করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

আরজগুজার

(মাওলানা) মুনীর আহমদ

(প্রকাশক)

হক লাইব্রেরী

বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

সূচীপত্র

Contents

॥ ॥ ॥

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی علی رسوله الكريم

সুন্নত ওয়াল জামাআত

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—আমি যেমন তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছি তদ্রূপ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিয়াছিলেন—তোমাদের মধ্যে যাহার জান্নাতের ভাল অংশ পছন্দনীয় তাহার কর্তব্য দলবদ্ধ হইয়া থাকা। কারণ শয়তান একার সাথী এবং দুইজন হইতে বহু দূরে অবস্থান করে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরা হইতে বর্ণিত আছে—জাবিয়া নামক স্থানে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব ভাষণ দানকালে বলিলেন—আমি যেমন তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছি তেমনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা আমার সাহাবাদের বুযুর্গী.ক স্বীকার কর তারপর তাহাদের পরবর্তীদের (তাবেয়ী) তারপর তাহাদের পরবর্তীদের (তাবে তাবেয়ী)। ইহার পর মিথ্যা প্রসার লাভ করিবে। এমন কি লোকে সাক্ষ্য দান করিবে অথচ তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। শপথ করিবে অথচ তাহাদিগকে শপথ করিতে বলা হইবে না। সুতরাং যে জান্নাতবাসী হওয়া পছন্দ করে তাহার কর্তব্য দলবদ্ধ (সুন্নত ওয়াল জামাআতভুক্ত) থাকা। কারণ শয়তান একার সাথী ; দুই হইতে বহু দূর। সাবধান কোন পুরুষ যেন কোন রমণীর (গায়ের মাহ্‌রম) নিকট একা না আসে। কারণ তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে শয়তান থাকে। সাবধান ! যে ব্যক্তি পাপে অসন্তুষ্ট এবং পুণ্যে সন্তুষ্ট থাকে সেই ব্যক্তিই মোমেন।

আরফাজা (রাযিঃ) বলেন—আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জামাআতের উপর আল্লাহর হাত থাকে। যে ব্যক্তি জামাআতের বিরোধিতা করে শয়তান তাহার সাথী।

উসামা ইবনে শরীফ (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—জামাআতের উপর আল্লাহর হাত। যখন কোন ব্যক্তি দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখন শয়তান তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যায় যেমন নেকড়ে বাঘ দল হইতে বিচ্ছিন্ন ছাগ উঠাইয়া লইয়া যায়।

জামাআত বা দলের উপর আল্লাহর হাত অর্থ তাহাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং তাহারা আল্লাহর হেফাযতে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হাত মুবারক দ্বারা একটি সরলরেখা টানিলেন। তারপর বলিলেন—ইহা সরল পথ। তারপর উক্ত সরলরেখার ডানে বামে কতগুলি রেখা টানিয়া বলিলেন—ইহা খারাপ রাস্তা। ইহার প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া শয়তান নির্ধারিত রহিয়াছে। উহারা সেই পথে যাওয়ার জন্য লোকদিগকে আহ্বান করে। তারপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করিলেন—

وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ -

নিশ্চয়ই ইহা আমার সরল পথ। তোমরা উহার অনুসরণ কর অন্য পথে চলিও না যাহাতে আমার পথ হইতে তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ। যেমন ছাগ পালের জন্য নেকড়ে বাঘ থাকে। যে ছাগ দল হইতে বিচ্ছিন্ন পায় নেকড়ে উহাকে লইয়া যায়। সাবধান তোমরা দলের বিরোধিতা করিয়া দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের কর্তব্য দলবদ্ধ থাকা, মোমেন জনসাধারণের সাথে থাকা এবং মসজিদে গমনাগমন করা।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—এক হইতে দুই, দুই হইতে

তিন, তিন হইতে চার ভাল। তোমাদের কর্তব্য একতাবদ্ধ হইয়া থাকা। কেননা আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতকে হেদায়াত ব্যতীত একতাবদ্ধ করিবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে আপদ বনী ইসরাঈলের উপর আসিয়াছিল ক্রমান্বয়ে উহা আমার উম্মতের উপরও আসিবে। তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রকাশ্যে মায়ের সাথে ব্যভিচারী করিয়া থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যেও তেমন ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে। মতবিরোধ করিয়া তাহারা বায়াত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল। আমার উম্মতের হইবে তিহাত্তরটি দল। একটি ব্যতীত আর সকলেই দোযখবাসী হইবে।

সাহাবা কেরামগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কোন্ গুণের অধিকারী?

ইরশাদ করিলেন–আমি এবং আমার সাহাবাগণ যেই গুণে গুণান্বিত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—সুন্নতমতে মধ্যম চালে ইবাদত করা বেদআতী পন্থায় অধিক ইবাদত করার চেয়ে শ্রেয়।

যে ব্যক্তি নাজায়েয তরীকার ইবাদত বন্দেগীর ধারা প্রবর্তন করে সে মরদুদ। এমন কি উহা মাকরুহ এবং কুফরী পর্যন্ত গিয়া পৌছে। যেমন কবরস্থানে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা মাকরুহ। এক পায়ে দাঁড়াইয়া নামাযে গাওসিয়া আদায় করা কুফরী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, সুন্নতের অনুসারী থাকিয়া যেই ব্যক্তি বেদআত কাজ হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত রাখে এবং সুন্নতের পথ নির্দেশ করে এমন ব্যক্তিকে দেখা ইবাদত।

কেননা এমন ব্যক্তি আল্লাহর অলী।

অলীর দর্শনে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আল্লাহকে স্মরণ করা ইবাদত।

আবুল আলিয়া তাবেয়ী বলেন—তোমরা প্রথম যুগের পথ অবলম্বন কর, মতবিরোধ হওয়ার পূর্বে যে পথে ঈমানদারগণ ছিলেন। এই যুগ ছিল হযরত আবু বকর ; ওমর (রাযিঃ)এর পূর্ণ খেলাফত যুগ এবং ওসমান (রাযিঃ)এর খেলাফতের অধিকাংশ সময়। আসেম বলেন—আমি

আবুল আলিয়ার এই কথা হযরত হাসান বসরীর নিকট বলিলে তিনি বলিলেন—খোদার কসম! আবুল আলিয়া সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করিয়াছেন।

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন—সুন্নতে দৃঢ় থাক। সাহাবাগণ যেখানে থামিয়াছেন তোমরা সেখানে থাম, তাহারা যাহা হইতে বিরত রহিয়াছেন তোমরাও উহা হইতে বিরত থাক। সাহাবাদের প্রদর্শিত পথে চল, তাহা হইলে তাহাদের স্থান যেখানে হইবে তোমাদের স্থানও সেখানে হইবে।

তিনি আরও বলেন—আমি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখিলাম। ইরশাদ করিলেন—হে আবদুর রহমান! তুমিই কি আমার পথে নেক কাজ করার জন্য তাকীদ কর এবং অন্যায় করা হইতে লোকদিগকে বিরত রাখ? আমি উত্তর করিলাম—হে প্রভু! ইহা তোমার মেহেরবানীতেই আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে। আরয করিলাম—হে খোদা! আমাকে ইসলামে রাখিয়াই মৃত্যুদান করিও। ইরশাদ হইল—বরং বল ইসলাম এবং সুন্নতের উপর।

হযরত সুফইয়ান সাওরী (রহঃ) বলিয়াছেন—কোন কথা ঠিক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত উহা কাজের সাথে মিল না হয়। নিয়ত ঠিক না থাকিলে কাজ ও কথা ঠিক হয় না। কথা, কাজ এবং নিয়ত ঠিক হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত মোতাবেক না হয়।

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন—সুফইয়ান সাওরী আমাকে বলিয়াছেন—হে ইউসুফ! তুমি যদি সংবাদ পাও যে দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে সুন্নতের অনুসারী কোন লোক আছে তবে তাহাকে সালাম প্রেরণ কর। তদ্রূপ দুনিয়ার পশ্চিম প্রান্তে এমন লোকের সংবাদ পাইলেও তাহাকে সালাম পাঠাও। কারণ, সুন্নত ওয়াল জামাআতের অনুসারী খুব কম লোকই রহিয়াছে।

আইউব সুখতিয়ানী বলিয়াছেন—সুন্নতের অনুসারী কোন লোকের মৃত্যু সংবাদ পাইলে আমার মনে হয় যেন আমার শরীরের কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

মোতামের ইবনে সোলায়মান তাইমী বলেন—আমি একদিন বিষন্ন বদনে আমার বাবার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমার বিষন্নতার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আমার একজন বন্ধু মারা গিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সে কি সুন্নতের অনুসারী ছিল? আমি বলিলাম—জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন—তবে আর চিন্তা করিও না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলিতেন—হাদীস ও সুন্নতের অনুসারী কোন ব্যক্তিকে দেখিলে আমার মনে হয় যেন আমি রাসূলুল্লাহর কোন সাহাবাকে দেখিলাম।

হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলিতেন—মানুষের জন্য সব পথই বন্ধ। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের অনুসারী, তাহার সুন্নতের অনুসারী এবং উহাতে দৃঢ়পদ তাহার জন্য সব পথই উন্মুক্ত।

নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই তোমাদের জন্য উত্তম পন্থা রহিয়াছে।

বেদআতের নিন্দাবাদ

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে এমন কোন কিছু প্রবর্তন করে যাহা আমাদের ধর্ম বহির্ভূত, তবে সেই ব্যক্তি মরদুদ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সে আমার (উম্মত) নয়।

আবদুর রহমান ইবনে আমর সুলামী এবং হাজর ইবনে হাজর কেলাবী আরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ)এর সাথে সাক্ষাত করিতে গিয়া বলিলেন—আমরা আপনার দর্শনে পুণ্য লাভ এবং কিছু জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার খেদমতে আসিয়াছি।

হযরত আরবায বলিলেন—একদিন নবীজী ফজরের নামাযের পর আমাদিগকে এমনভাবে নসীহত করিলেন যে, উহা শুনিয়া আমাদের চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল এবং আল্লাহর ভয়ে অন্তর কাঁপিতে লাগিল। সাহাবাদের মধ্যে কেহ বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় ইহা আপনার বিদায়ী নসীহত। আপনি আমাদিগকে আরও নসীহত করুন।

ইরশাদ করিলেন—তোমাদিগকে আমি অছিয়ত করিতেছি যে—আল্লাহকে ভয় করিবে, নেতার নির্দেশ পালন করিবে যদিও তোমাদের নেতা হাবশী গোলাম হয়।

কারণ আমার পর তোমরা যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা অধিক সংখ্যক মতবিরোধ দেখিবে। তোমাদের উচিত আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা, ... হাত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং দাঁত দ্বারা দৃঢ়তার সাথে মযবুত করিয়া রাখা। সাবধান! সাবধান!! নতুন প্রতিষ্ঠিত কোন কিছু হইতে দূরে থাকিবে। কারণ প্রত্যেকটি নতুন প্রবর্তিত কিছু বেদআত এবং প্রত্যেকটি বেদআত গোমরাহী।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—হাওযে কাউসারের নিকট আমি তোমাদের আমীরে মনযিল হইব। নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক লোক সেদিকে আসিবে। আমার নিকট পৌঁছার পূর্বেই তাহাদিগকে বাধা দান করা হইবে। আমি বলিব—হে প্রভু! ইহারা তো আমার সাহাবা। আমাকে বলা হইবে—আপনি জানেন না, আপনার পর তাহারা কি কি নতুন কাজের (বেদআতের) প্রবর্তন করিয়াছিল।

মোয়াম্মার বলেন—আমি তাউস তাবেয়ীর নিকট বসা ছিলাম। তাহার পুত্রও সেখানে বসা ছিল। এমন সময় একজন মোতাযেলাহ সেখানে আসিয়া শরীয়ত সম্বন্ধীয় কোন একটি বিষয় বদ এতেকাদের সাথে বলিতে আরম্ভ করে। হযরত তাউস তাহার কর্ণদ্বয় আঙ্গুল দিয়া ছেলেকেও বলিলেন—বৎস! কানে আঙ্গুল দাও যেন তাহার কথা কর্ণ কুহরে প্রবেশ না করে। কেননা অন্তর খুবই দুর্বল। আবার বলিলেন—বৎস! কান জোরে আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধর। মোতাযেলা উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত বার বার তিনি ছেলেকে এই কথাই বলিতে থাকেন।

ঈসা ইবনে আলী যাব্বী বলেন—এক ব্যক্তি আমাদের সাথে ইবরাহীম তাবেয়ীর নিকট যাতায়াত করিত। ইবরাহীম যখন জানিতে পারিলেন যে, উক্ত ব্যক্তি মারজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত, তখন একদিন তাহাকে বলিলেন—অতঃপর তুমি আমার নিকট আসিও না।

সালেহ বলেন—আমি সীরীন (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী)–এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তকদীর সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করিল। ইবনে সীরীন সেই ব্যক্তিকে বলিলেন—হয় তুমি উঠিয়া যাও, না হয় আমি উঠিয়া যাই।

আইউব সুখতিয়ানী বলেন—বেদআতী যত বেশী বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ ততই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

সুফইয়ান সাওরী বলেন—শয়তান পাপ করার চেয়ে বেদআতকে অধিক পছন্দ করে। কারণ, পাপ করার পর তওবাহ করা যায় কিন্তু বেদআতী কখনও তওবাহ করে না। সে মনে করে আমি যাহা কিছু করি ঠিকই করি।

মোয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল বলেন—আবদুল আযীয ইবনে আবু যাওয়াদ মারা গেলে তাহাকে জানাযার জন্য বাবুস সাফায় রাখা হইল। লোকে জানাযার নামায আদায় করার জন্য কাতারে দাঁড়াইল। ইত্যবসরে দেখা গেল হযরত সুফইয়ান সাওরী সেদিক আসিতেছেন। কিন্তু তিনি জানাযায় অংশগ্রহণ না করিয়া চলিয়া গেলেন। কারণ, মৃত ব্যক্তি মুরজিয়া (বেদআতী) ছিল।

সুফইয়ান সাওরী বলেন—যে ব্যক্তি বেদআতীর নিকট এলেম শিখে, আল্লাহ সেই এলমে বরকত দেন না। যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে মুসাফাহা করে সে যেন ইসলামের শক্তিকে খর্ব করিয়া দিল।

সাঈদ আল কারীরী বলেন—হযরত সোলায়মান তাইমী মৃত্যুর পূর্বে খুব কাঁদিতে থাকেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল—হযরত! আপনি কি মৃত্যু ভয়ে কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন—না। বরং একবার আমি এক বেদআতীর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাকে সালাম করিয়াছিলাম। এখন আমার ভয় হইতেছে যে, না জানি আল্লাহ আমাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন কি না?

হযরত ফোযায়েল ইবনে ইয়ায বলেন—যে ব্যক্তি বেদআতীর নিকট বসে, তুমি তাহার সাথে কোন সম্পর্ক রাখিও না।

তিনি আরও বলেন—যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে ভালবাসা রাখে আল্লাহ তাহার পুণ্যসমূহ নষ্ট করিয়া দেন এবং তাহার অন্তর হইতে ইসলামের নূর দূর করিয়া দেন। (চিন্তার বিষয় বেদআতীর অবস্থা হইবে?)

তিনি আরও বলেন—বেদআতীকে কোন পথে যাইতে দেখিলে তুমি অন্য পথে যাও। বেদআতীর কোন আমলই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি বেদআতীকে সাহায্য করে সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার সাহায্য করিল। যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে মেয়ের বিবাহ দেয় সে যেন মেয়ের সাথে পিতৃত্বের সম্পর্ক কর্তন করিয়া দিল। যে ব্যক্তি বেদআতীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি আশা করি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি বেদআতীকে সম্মান করে সে যেন ইসলামের বুনিয়াদ ধ্বংস করায় সাহায্য করিল।

লাইস ইবনে সাইদ (রহঃ) বলেন—কোন বেদআতীকে পানির উপর হাঁটিতে দেখিলেও আমি তাহাকে কোন মর্যাদা দিব না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই কথা শুনিয়া বলিলেন—ইহা তো কম হইল। আমি বেদআতীকে বাতাসে উড়িতে দেখিলেও কোন মর্যাদা দিব না।

মুহাম্মদ ইবনে সাহল বুখারী বলেন—আমরা ইমাম কারবানী (রহঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বেদআতীদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলে কোন একজন বলিলেন—আপনি এই কথা ছাড়িয়া কিছু হাদীস বর্ণনা করিলে খুব ভাল হইত। ইমাম কারবানী (রহঃ) ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—বেদআতীদের বিরুদ্ধে কথা বলা আমি ষাট বৎসরের ইবাদতের চেয়ে শ্রেয় মনে করি।

গ্রন্থকার বলেন—এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সুন্নত কি এবং বেদআত কি?

উহার উত্তর এই যে, সুন্নত অর্থ পথ। যাহারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী তাহারাই আহলে সুন্নত। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরামদের পর ধর্মে যে সমস্ত নতুনত্বের প্রবর্তন করা হইয়াছে উহা বেদআত। বেদআতীদের প্রধান কাজ শরীয়তের বিরোধিতা করিয়া শরীয়তকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া।

যদি এমন কোন বেদআতের প্রচলনও করা হয় যাহা শরীয়ত বিরোধী নয় তথাপি এমন বেদআত হইতেও প্রথম যুগের বুযুর্গগণ দূরে থাকিতেন।

আবুল বুখতারী বলেন—এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)কে বলিল যে, মাগরিবের পর একটি দল মসজিদে বসে। তাহাদের মধ্যে একজনে নির্দেশ দেয়—এতবার তাকবীর এতবার তাসবীহ ইত্যাদি পড়। সেই মতে সকলে উহা পাঠ করে।

হযরত ইবনে মাসউদ বলিলেন—আবার এমন কিছু দেখিলে আমাকে সংবাদ দিও। উক্ত ব্যক্তি সংবাদ দিলে ইবনে মাসউদ সেই মজলিসের এক পাশে গিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত মতে নির্দেশ দিতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কিছুটা কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বলিলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ! খোদার কসম যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তোমরা অযথা এক বেদআতের প্রচলন করিয়াছ। তোমরা নিজদিগকে আল্লাহর রাসূলের সাহাবাদের চেয়েও অধিক জ্ঞানী প্রতিপন্ন করিতেছ।

পরবর্তীকালে এই দলের অধিকাংশ লোকই খারেজী হইয়া গিয়াছিল।

হযরত যুননুন মিসরী তাহার ছেলেকে লাল মোজা পরিধান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—বৎস! ইহা তো খুব অহংকারের বস্তু। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল মোজা পরিধান করিতেন না। বরং সাদা এবং কালো মোজা পরিধান করিতেন।

গ্রন্থকার বলেন—পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যে কোন প্রকার বেদআত হইতে দূরে থাকিতেন। যদিও কোন প্রকার বেদআতে প্রকাশ্যভাবে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখা যাইত না।

তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, শরীয়তে এমন কোন কিছু যেন প্রচলন না হয় যাহার অস্তিত্ব প্রথম যুগে ছিল না। তথাপি এমন কিছুসংখ্যক কাজের প্রচলন হইয়াছে যাহাতে শরীয়তের কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় নাই।

বর্ণিত আছে—রমযানের রাতে কিছুসংখ্যক লোক একাকী আবার কেহ কেহ জামাআতের সাথে তারাবীহ পাঠ করিতেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযিঃ) হযরত উবাই ইবনে কাবের ইমামতীতে তারাবীহ নামায পড়িতে নির্দেশ দেন। অতঃপর একরাতে বাহির হইয়া উহা দেখিয়া বলেন—ইহা ভাল বেদআত।

ওয়ায করা সম্বন্ধে হাসান বসরী বলেন—ইহা বেদআত কিন্তু ভাল

বেদআত। এখানে বহু দ্বীনী বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয় এবং এখানকার অধিকাংশ দোআ আল্লাহ কবুল করিয়া থাকেন।

হযরত ওমর (রাযিঃ) জামাআতের সাথে তারাবীহ্ নামায এই জন্য পড়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন যে শরীয়ত মতে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা প্রমাণিত আছে। হযরত হাসান বসরী ওয়ায করাকে ভাল বেদআত এইজন্য বলিয়াছিলেন যে, ওয়ায করা শরীয়ত সিদ্ধ।

নিয়ম এই যে, যে নতুন কাজ মূল শরীয়তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রচলন করা হয় সেই বেদআত নিন্দনীয় নহে। কিন্তু যাহা শরীয়তের মূল ভিত্তির পরিপন্থী সেই বেদআত অত্যন্ত জঘন্য।

বেদআতী সম্প্রদায় মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত

হারুরিয়া, কাদরিয়া, জাহমিয়া, মুরজিয়া, রাফেযা এবং জাবরিয়া। ইহার প্রত্যেকটি আবার বারটি করিয়া শাখায় বিভক্ত। সুতরাং মোট বায়াত্তরটি হইল। এই বায়াত্তরটি দল সম্বন্ধে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—ইহারা সকলেই দোযখী।

১. হারুরিয়ার ১২টি শাখা ঃ

(ক) আযরাকিয়া—তাহাদের মতে আযরাকিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ব্যতীত আর কেহ মোমেন নয়। তাহারা আহলে কেবলাকে কাফের বলে।

(খ) আবাযিয়া—ইহারা বলে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোক মোমেন, আর সব মুনাফিক।

(গ) তাগলিবিয়া—তাহারা বলে আল্লাহ তাআলা ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী নহেন।

(ঘ) হাযিমিয়া—ইহারা বলে ঈমান কি আমরা জানি না। ঈমান সম্বন্ধে যখন অবগত নই, তখন ভালমন্দ যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।

(ঙ) খালফিয়া—পুরুষ হউক কিংবা রমণী জিহাদ পরিত্যাগকারী কাফের।

(চ) মাকরামিয়া—কেহ কাহাকে স্পর্শ করা জায়েয নহে। কেননা, আমরা পবিত্র অপবিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞাত। আমাদের সম্মুখে গোসল করিয়া তওবাহ না করা পর্যন্ত কেহ আমাদের সাথে বসিয়া খাইতে পারে না।

(ছ) কানযিয়া—কাহাকেও টাকা পয়সা দান করা জায়েয নহে। বরং টাকা পয়সা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিবে।

(জ) শুমরাখিয়া—অপরিচিত রমণীদিগকে স্পর্শ করা দোষণীয় নহে। কারণ, তাহাকে সুগন্ধি বস্তু হিসাবেই সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(ঝ) আখনাসিয়া—মৃত্যুর পর সুখ দুঃখ বলিতে কোন কিছু নাই।

(ঞ) মাহকামিয়া—লোকের নিকট বিচার প্রার্থী কাফের।

(ট) মোতাযেলা—ইহারা হযরত আলী ও মুআবিয়ার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে।

(ঠ) মাইমুনিয়া—আমাদের সম্প্রদায়ের সম্মতি ব্যতীত কেহই সর্দার হইতে পারে না।

২. কাদরিয়া সম্প্রদায় বারটি শাখায় বিভক্ত ঃ

(ক) আহমারিয়া—আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত এই যে, বান্দাকে স্বেচ্ছায় করার ক্ষমতা দিতে হইবে এবং পাপ করার সময় নিজে বান্দাকে ফিরাইয়া রাখিবে।

(খ) সানুবিয়া—ভাল আল্লাহর পক্ষ হইতে এবং মন্দ শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়া থাকে।

(গ) মুতাযিলা—কুরআন মাখলুক এবং পরকালে কেহ আল্লাহর দর্শন পাইবে না।

(ঘ) কীসানিয়া—ইহারা বলে আমরা জানি না কাজ আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়, না বান্দার পক্ষ হইতে। আমরা ইহাও জানি না যে, মৃত্যুর পর বান্দাকে পুণ্য দান করা হইবে, না শাস্তি দেওয়া হইবে।

(ঙ) শয়তানিয়া—আল্লাহ শয়তানের সৃষ্টিকর্তা নহেন।

(চ) শরীকিয়া—কুফরী ব্যতীত সব অন্যায় সীমিত।

(ছ) ওয়াহমিয়া—নেক বদী আল্লাহর সৃষ্টি নয়।

(জ) রাবুনদিয়া—আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার সমস্ত আদেশ নিষেধ পালন করা ফরয। কোন কিছুই পরিত্যাজ্য নহে।

এই পাপিষ্ঠদের মতে হযরত আদম (আঃ)-এর সময়ের ন্যায় এখনও ভাই-বোনে বিবাহ হইতে পারে।

(ঝ) বাতরিয়া—পাপ করিয়া তওবাহ করিলে কবুল হইবে না।

(ঞ) নাকেসিয়া—রাসূলুল্লাহর বায়আত ভঙ্গকারী পাপী হইবে না।

(ট) কাছেতিয়া—পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত হওয়ার চেয়ে আসক্ত হওয়া ভাল।

(ঠ) নেজামিয়া—আল্লাহ তাআলাকে যে বস্তু বলে সে কাফের।

৩. জাহমিয়ার বারটি শাখা ঃ

(ক) মো'তালা—ইহাদের মতে যে ব্যক্তি বলে আল্লাহর দর্শন পাওয়া যাইবে সে কাফের।

(খ) মুরাইসিয়া—আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী মাখলুক।

(গ) মুলতাযেকাহ—আল্লাহ তাআলাকে যে চিনিয়াছে সে দোযখে যাইবে না।

(ঘ) ওয়ারেদিয়া—আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।

(ঙ) যেনাদেকাহ—কাহাকেও নিজের প্রভু (রব) সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

(চ) হারকিয়া—কাফের একবার জ্বলিয়া অঙ্গার হইয়া গেলে তাহাকে আর জীবিত করা হইবে না বরং সেই অঙ্গার অবস্থায়ই জ্বলিতে থাকিবে, শাস্তি অনুভব করিবে না।

(ছ) মাখলুকিয়া—তাহাদের মতে কুরআন মাখলুক।

(জ) ফানিয়া—তাহারা বলে বেহেশত ও দোযখ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের কাহারও মতে বেহেশত ও দোযখ আজও সৃষ্টি করা হয় নাই।

(ঝ) মুগিরিয়া—তাহারা বলে পয়গম্বর আল্লাহর মনোনীত বা প্রেরিত ব্যক্তি নয় বরং তাহারা জ্ঞানী লোক।

(ঞ) ওয়াকেফিয়া—ইহারা কুরআনকে মাখলুক বা গায়ের মাখলুক কিছুই বলে না।

(ট) কবরিয়া—ইহারা কবরের আযাব এবং পরকালে শাফায়াতে বিশ্বাসী নয়।

(ঠ) লফযিয়া—কুরআন যখন উচ্চারণ করা হয় তখন উহা মাখলুক।

৪. মারজিয়া সম্প্রদায়ের বারটি শাখা ঃ

(ক) তারেকিয়া—আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়।

(খ) সায়েবিয়া—মানুষ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

(গ) রাজিয়া—কোন অন্যায়কারীকে পাপী এবং পুণ্যকারীকে পুণ্যবান বলা যায় না। কারণ, আল্লাহর নিকট তাহার কি মর্যাদা তাহা কেহ বলিতে পারে না।

(ঘ) শাকেরা—নেক আমলের ঈমানের সাথে কোন সম্পর্ক নাই।

(ঙ) বাহহাসিয়া—ঈমান এলম। যে ব্যক্তি ন্যায় অন্যায় এবং হালাল হারামে পার্থক্য করিতে পারে না সে কাফের।

(চ) মানকুসিয়া—কাজ করাই ঈমান।

(ছ) মুসতাশনিয়া—ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য নাই।

(জ) মুশাববাহ—মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়ই আল্লাহর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

(ঝ) হাশবিয়া—ফরয এবং নফল ত্যাগ করার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

(ঞ) যাহেরিয়া—ইহারা এজতেহাদে অবিশ্বাসী।

(ট) বিদইয়া—ইহারা প্রথম বেদআতের প্রচলনকারী।

(ঠ) আমালিয়া—ইহাদের মতে ঈমান আনার পর যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায়।

৫. রাফেযা সম্প্রদায় বারটি শাখায় বিভক্ত ঃ

(ক) উলুবিয়া—ইহারা বলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) ভুলে হযরত আলীর পরিবর্তে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী লইয়া আসেন। এই সম্প্রদায় কাফের।

(খ) আমরিয়া—নবুয়তের কাজে হযরত আলী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশীদার।

(গ) শিয়া—ইহাদের মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আলীই খেলাফতের অধিকারী ছিলেন। লোকে হযরত আবু বকরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কুফরী করিয়াছে।

(ঘ) ইসহাকিয়া—ইহাদের মতে কেয়ামত পর্যন্ত নবীর আবির্ভাব হইতে থাকিবে।

(ঙ) নাবুসিয়া—হযরত আলী সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অন্য কোন সাহাবাকে যে শ্রেষ্ঠ বলিবে সে কাফের।

(চ) ইমামিয়া—ইহাতে মতে দুনিয়ায় সব সময় একজন করিয়া ইমাম থাকিবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) ইমামের শিক্ষকতা করেন। একজন মারা গেলে অন্যজন ইমাম হইবেন। এই ইমাম হযরত হোসায়েন (রাযিঃ)—এর বংশধর হইবেন।

(ছ) ইয়াযেদিয়া—হযরত হোসায়েনের বংশধর উপস্থিত থাকিতে সে শরীয়ত পন্থী হউক বা না হউক অন্য কেহ নামাযে ইমামতী করিতে পারিবে না।

(জ) আব্বাসিয়া—ইহাদের মতে হযরত আব্বাসের বংশধরই খেলাফতের যথার্থ অধিকারী।

(ঝ) মুতানাসেখা—ইহাদের মতে আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে প্রবিষ্ট হয়। নেককারের আত্মা সম্পদশালীর দেহে আর বদকারের আত্মা অভাবক্লিষ্ট ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে।

(ঞ) রাজইয়া—হযরত আলী এবং তাহার সঙ্গী-সাথী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন।

(ট) লায়েনিয়া—ইহারা হযরত ওসমান, তালহা, যোবায়ের, মুআবিয়া, আবু মূসা এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে অভিশাপ দেয়।

(ঠ) মুতারাব্বেসাহ—ইহারা দরবেশী পোশাক পরিধান করিয়া থাকে এবং একজনকে নেতা বানাইয়া বলে এই ব্যক্তিই মেহদী। সে মারা গেলে অন্যজনকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করে।

৬. জাবরিয়া সম্প্রদায়ের বারটি শাখা ঃ

(ক) মুধতারিয়া—ইহাদের মতে বান্দার কোন কাজ করার ক্ষমতা নাই, যাহা কিছু আল্লাহই করেন।

(খ) আফয়ালিয়া—কাজ লোকের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও করা না করার সামর্থ লোকের নাই। লোককে বাধা জন্তুর ন্যায় যেদিক ইচ্ছা সেদিক লইয়া যাওয়া হইতেছে।

(গ) মাফরুগিয়া—যাহা কিছু সৃষ্টি হওয়ার হইয়াছে আর হইবে না।

(ঘ) নাজারিয়া—আল্লাহ তাআলা বান্দার নেক ও পাপ কাজের জন্য আযাব করেন না বরং নিজের কাজের জন্য আযাব করেন।

(ঙ) মুতানিয়া—তোমার অন্তরে যাহা উদিত হয় সেই কাজই কর।

(চ) কাসবিয়া—পুণ্য ও পাপ অর্জনকারী বান্দা নয়।

(ছ) সাবেকিয়া—ইচ্ছামত পুণ্য বা পাপের কাজ কর। কারণ পুণ্যবানের পাপে কোন ক্ষতি হইবে না ; আবার পাপীর পুণ্য কাজে কোন উপকার হইবে না।

(জ) হুবিবয়া—আল্লাহ প্রেমিকদের ইবাদত বন্দেগী করার প্রয়োজন নাই।

(ঝ) খাওফিয়া—খোদা প্রেমিকের খোদাকে ভয় করার প্রয়োজন নাই। কারণ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে ভয় করে না।

(ঞ) ফিকরিয়া—যে যত বেশী মারেফাতের অধিকারী তাহার ততই ইবাদতের যিম্মাদারী কমিয়া যায়।

(ট) হাসিয়া—পৃথিবীতে সকল মানুষের সমান অধিকার। কেননা সকলেই হযরত আদম (আঃ)এর উত্তরাধিকারী।

(ঠ) মায়িয়া—মানুষই সকল কাজ করার অধিকারী।

ইবলীসের চক্রান্ত

কাম রিপু লোভ লালসা মানুষের মধ্যে বিরাজমান। যাহার ফলে মানুষ আরাম আয়েশের সন্ধানে থাকে। মানুষের মধ্যে অবস্থানরত ক্রোধ দ্বারা সে কষ্টদায়ক জিনিসকে প্রতিহত করে। জ্ঞান তাহাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। পরম শত্রু শয়তান সদা সর্বদা মানুষকে অন্যায়ের দিকে ক্রমবর্ধমান অবস্থায় ধাবিত করে।

তাই জ্ঞানীদের কর্তব্য এমন শত্রু হইতে সর্বদা দূরে থাকা, যাহার শত্রুতা হযরত আদম (আঃ) হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে তাহার সারাটা জীবন এই শত্রুতা করার জন্য নিয়োজিত রাখিয়াছে। এই শত্রু হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ الاية -

হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদিগকে খারাপ কথা বলার এবং অন্যায় কাজ করার তাকীদ করে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলার নির্দেশ দেয় যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই।

আরও ইরশাদ করেন—শয়তান তোমাদিগকে গরীব হওয়ার ভয় দেখায় এবং অন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেয়। (কুরআন)

আরও ইরশাদ করেন—

وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ –

শয়তান যেন তোমাদিগকে আল্লাহ সম্বন্ধে ধোকায় নিপতিত না করে।

যে শয়তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর সেই শয়তানই প্রথমে বিপথগামী হইয়াছিল। হযরত আদম (আঃ)কে সেজদা করিতে বলায় সে গর্বোন্নত মস্তকে বলিয়াছিল—

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ –

আমি তাহার (আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

শয়তান আর সেজদা করিল না। সে চির অভিশপ্ত হইয়া রহিল। অথচ এই কথা বলিয়াই সে নিজেকে মর্যাদা সম্পন্ন করিতে চাহিয়াছিল।

সুতরাং শয়তান যখন কোন কিছু করিতে বলে তখন বলা উচিত যে—হে শয়তান! তুমি আমাকে যাহা কিছু আদেশ করিতেছ হয়ত উহা আমি পাইব। কিন্তু যে নিজের ভাল চেনে না সে অন্যের ভাল কি করিয়া করিতে পারে। সুতরাং তুমি তোমার পথ দেখ আমার নিকট তোমার চালাকি খাটিবে না।

শয়তান তখন নিরাশ হইয়া নফসে আম্মারার সাহায্য গ্রহণ করে। নফসে আম্মারা মানুষকে তখন নানাদিক হইতে প্ররোচিত করিতে থাকে। এই অবস্থায় মানুষের কর্তব্য জ্ঞানের সাহায্য লওয়া। আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করিয়া সাহায্যকারী সৈন্য দৃঢ়তাকে প্রেরণ করিলে শয়তানী ও নফসানী সৈন্য প্যালাইয়া যাইবে।

আইয়ায ইবনে হিমার (রাযিঃ) বলেন—নবীজী একদিন ইরশাদ

করিলেন—আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন তোমরা যাহা অজ্ঞাত আমি যেন তোমাদিগকে তাহা বলিয়া দেই। আজই আল্লাহ আমাকে ইরশাদ করিয়াছেন যে—আমি আমার বান্দাকে যেই সম্পদ দিয়াছি উহা তাহার জন্য হালাল। আমি আমার বান্দাদিগকে এক সত্য ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। তারপর শয়তান তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে তাহার ধর্ম হইতে ফিরাইয়া দেয় এবং এমন সব কিছুকে আমার অংশীদার করিতে নির্দেশ দেয় যে সম্বন্ধে বান্দার কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং যে সম্বন্ধে আমি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করি নাই।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—আল্লাহ তাআলা আরব হইতে আযম পর্যন্ত সমস্ত লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিছুসংখ্যক আহলে কিতাব ব্যতীত আর সকলের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

হযরত জাবের হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—অভিশপ্ত শয়তান পানির উপর তাহার সিংহাসন স্থাপন করিয়া তাহার বাহিনীকে নানা দিকে প্রেরণ করে। উহাদের মধ্যে যে বড় বড় ঝগড়া বিবাদ বাধায় সে শয়তানের নিকট অধিক প্রিয় বিবেচিত হয়। একটি শয়তান আসিয়া বলে আমি এমন করিয়াছি তেমন করিয়াছি। শয়তান বলে তুমি কিছুই কর নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—অন্য আর একটি শয়তান আসিয়া বলে আমি অমুক ব্যক্তি এবং তাহার পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছি। শয়তান তাহাকে আদরের সাথে কাছে বসাইয়া বলে তুমি খুব বড় কাজ করিয়াছ।

হযরত জাবের বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—নামাযী লোক শয়তানের পূজা করিবে—এই আশা হইতে শয়তান নিরাশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ বাধাইতে সমর্থ হইবে।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—শয়তান তাহার শুঁড় আদম সন্তানের অন্তরের উপর রাখিয়া দেয়। খোদার যিকর করিলে উঠাইয়া লয়। কিন্তু আল্লাহকে ভুলিয়া গেলে অন্তরকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

হযরত ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত আছে, শয়তান একদল লোকের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় তাহাদিগকে ফেতনা ফাসাদে লিপ্ত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা আল্লাহর যিকর করিতেছিল বলিয়া তাহার চেষ্টা কার্যকরী হইল না। কিন্তু একটি সমাবেশের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় দেখিল তাহারা দুনিয়া সম্বন্ধীয় কথাবার্তা বলিতেছে। শয়তান তাহাদিগকে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করিয়া খুন-খারাবী করাইয়া ছাড়িল। আল্লাহর যিকরকারী লোক সেখান হইতে উঠিয়া গেল। এই ভাবে তাহাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল।

সাবেত বনানী (রহঃ) বলেন—আমি এই হাদীস শুনিয়াছি যে ইবলীস হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)এর নিকট আগমন করিলে দেখিতে পাইলেন ইবলীসের দেহে অনেক প্রকারের লটকন (দুল)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এইসব কি?

ইবলীস বলিল—ইহা লোভ-লালসা, যাহাদ্বারা আদম সন্তানকে বশীভূত করি। হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলিলেন—আমার জন্যও তেমন কিছু আছে কি? শয়তান বলিল—যখন আপনি ভর পেট আহার করেন তখন নামায আদায় করা আপনার জন্য অসুবিধাজনক করিয়া দেই এবং আল্লাহর যিকর করা আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা ব্যতীত অন্য কিছু? শয়তান বলিল—না।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) বলিলেন—খোদার শপথ! আমি আর কখনও পেট ভরিয়া আহার করিব না।

শয়তান বলিল—খোদার কসম! আমি আর কখনও মানুষের উপকার করিব না।

একটি ঘটনা ঃ

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রাযিঃ) বলেন—বনী ইসরাঈলের একজন প্রখ্যাত দরবেশ ছিলেন। সেই সময় তিন ভাই এবং তাহাদের এক কুমারী বোনও ছিল। ঘটনাক্রমে তিন ভাইকেই যুদ্ধে যাইতে হইল। কিন্তু বোনকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইবে? তাহারা সেই দরবেশের নিকট গেল এবং বোনকে তাহার নিকট রাখিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিল। দরবেশ প্রথমে অস্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহাদের অনুরোধে বলিলেন—আচ্ছা

ইবাদতখানার সামনের কোন একটি ঘরে রাখিয়া যাও। তাহারা বোনকে দরবেশের নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

দরবেশ তাহার ইবাদতখানার দরজায় মেয়েটির আহার্য রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ডাক দিতেন। মেয়েটি আসিয়া তাহার খাবার নিয়া যাইত। এইভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর একদিন শয়তান আসিয়া দরবেশকে পুণ্যের কাজ করার পরামর্শ দেওয়ার ছলে বলিল---আপনি তাহার আহার্য তাহার গৃহদ্বারে দিয়া আসুন। কারণ, দিনের বেলায় যখন সে খাবার লইতে বাহিরে আসিবে তখন লোকে দেখিয়া ফেলিলে ইজ্জতহানীর ভয় আছে। তাহার খাব্যর দিয়া আসিলে আপনার বহু পুণ্য অর্জন হইবে।

ইহার পর হইতে দরবেশ মেয়েটির গৃহ দ্বারে খাবার দিয়া আসিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর শয়তান আসিয়া দরবেশকে পুণ্য অর্জন করার পরামর্শ দিয়া বলিল—মেয়েটি একা একা থাকে, কোন সাথী নাই সঙ্গী নাই, কাহারও সাথে কথাবার্তা বলিতে পারে না। আপনি তাহার সাথে এক-আধটু কথাবার্তা বলিলে খুবই ভাল হয়। দরবেশ তাহার উপাসনালয়ের দ্বারে বসিয়া মেয়েটির সাথে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করেন। মেয়েটি আসিয়া তাহার গৃহ দ্বারে বসিত।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান আবার আসিয়া বলিল—মেয়েটি তাহার গৃহ দ্বারে বসিয়া কথা বলার সময় কেহ দেখিয়া ফেলিলে লোকে উভয়কেই মন্দ বলিবে। সুতরাং দরবেশ এই পরামর্শ মত মেয়েটির গৃহে গমন করিয়া তাহার সাথে কথাবার্তা বলিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সুবর্ণ সুযোগে শয়তান মেয়েটিকে দরবেশের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিল। ফলে দরবেশ মেয়েটির সাথে ব্যভিচারী করিলেন এবং যথাসময়ে সেই মেয়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল।

শয়তান আসিয়া দরবেশকে বলিল—মেয়েটির ভাইয়েরা আসিয়া এই ছেলেকে দেখিলে কি বলিবে? অপমান হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে ছেলেটিকে হত্যা কর। মেয়েটিও আত্মসম্মান রক্ষার্থে কিছু বলিবে না। দরবেশ ছেলেটিকে হত্যা করিল। আবার শয়তান বলিল—তোমার কি বিশ্বাস হয় মেয়েটি তোমার অপকর্মের কথা তাহার ভাইদের নিকট বলিবে না? নিশ্চয়ই বলিবে। তুমি ইহাকেও হত্যা কর। দরবেশ তাহাই

করিল এবং মেয়েটি ও তাহার সন্তানকে কবর দিয়া রাখিয়া নিজে ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হইল।

কিছুদিন পর ভাইয়েরা ফিরিয়া আসিয়া বোনের সংবাদ লইতে গেল। দরবেশ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—তোমাদের বোন অত্যন্ত নেক ছিল, মারা গিয়াছে। এ দেখ তাহার কবর। ভাইয়েরা কান্নাকাটি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

শয়তান এক বৃদ্ধলোকের আকৃতিতে বড় ভাইকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিল—দরবেশ তোমার বোন সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে তোমার বোনের সাথে অপকর্ম করিয়াছে এবং তোমার বোনে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। দরবেশ তোমাদের ভয়ে উভয়কে হত্যা করিয়া দাফন করিয়া রাখিয়াছে। এইভাবে মেজ ভাই এবং ছোট ভাইকেও স্বপ্নে দেখাইল।

পরদিন সকালে তিন ভাই–ই নিজেদের স্বপ্নের কথা বলিল এবং দরবেশের আস্তানায় গিয়া কবর খুঁড়িয়া তাহাদের বোন এবং একটি নবজাতককে গলাকাটা অবস্থায় দেখিতে পাইল। দরবেশও নিজের অপরাধ স্বীকার করিলেন।

বাদশাহর দরবারে তাহারা নালিশ করিল। বিচারে দরবেশের ফাঁসির হুকুম হইল। এমন সময় শয়তান আসিয়া বলিল—দরবেশ! আমাকে চিনিতে পারিয়াছ? আমার পরামর্শ মতই তুমি এই সমস্ত কুকর্ম করিয়াছ। এখন যদি তুমি আল্লাহর সাথে কুফরী কর তবে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। দরবেশ প্রাণের ভয়ে আল্লাহর সাথে কুফরী করিল। শয়তান তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সম্বন্ধেই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন—

اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

শয়তান মানুষকে বলে কুফরী কর। সে কাফের হইয়া গেলে শয়তান বলে আমি তোমা হইতে পৃথক। আমি বিশ্ব প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

এই শয়তান এবং শয়তানের এই অনুসারী দল চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন—হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময় একজন দরবেশ নির্জনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিতেন। শয়তান নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিপথগামী করিতে পারিল না। অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)এর আকৃতিতে তাহার সহিত দেখা দিল। দরবেশ বলিলেন—তুমি যদি ঈসা হও তবে তোমাকে দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি কি আমাদিগকে ইবাদত-বন্দেগী করিতে বল নাই? তুমি কি আমাদিগকে কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি দাও নাই? চলিয়া যাও, তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই। শয়তান সুবিধা করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তাহার পিতার নিকট হইতে বলেন—হযরত নুহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করিয়া এক অপরিচিত বৃদ্ধকে দেখিয়া বলিলেন—তুমি কোথা হইতে আসিলে? সে উত্তর করিল—আমি তোমার সাথীদের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করিতে আসিয়াছি; যাহাতে তাহাদের অন্তর আমার সাথে এবং দেহ তোমার সাথে থাকে।

হযরত নূহ (আঃ) বলিলেন—হে খোদার দুশমন! তুই চলিয়া যা। শয়তান বলিল—পাঁচটি বস্তু দ্বারা আমি লোকদিগকে ধ্বংস করি। উহার তিনটি তোমাকে বলিব অন্য দুইটি বলিব না।

প্রত্যাদেশ হইল—হে নূহ! বল যে, তিনটির দরকার নাই, দুইটিই আমাকে বল।

ইবলীস বলিল—যে দুইটি বস্তু দ্বারা আমি লোকদিগকে ধ্বংস করি উহাকে কেহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। প্রথমটি হিংসা। যাহার জন্য আমি মালউন হইয়াছি এবং শয়তান মরদুদ নামে পরিচিত হইয়াছি। দ্বিতীয়টি লোভ। জান্নাতের যাবতীয় কিছু হযরত আদম (আঃ)এর জন্য নির্দোষ ছিল। কিন্তু একটি বস্তুর লোভে ফেলিয়া তাহাকে জান্নাত হইতে বহিস্কার করিয়াছি।

ইবলীস একবার হযরত মূসা (আঃ)কে বলিল—হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে নবুয়ত দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; আপনি আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেন। আমিও তো খোদার সৃষ্ট জীব। আমি একটি অন্যায় করিয়াছিলাম—আজ তওবাহ করিতে চাই। আপনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করুন যেন তিনি আমার তওবাহ কবুল করেন। হযরত

মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশমত শয়তানকে বলিলেন—তুমি হযরত আদম (আঃ)এর কবরকে সিজদাহ করিলে তোমার তওবাহ কবুল হইবে।

শয়তান অস্বীকার করিল এবং ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—যাহাকে জীবিতাবস্থায় সেজদাহ করি নাই, আজ তাহার কবরকে সিজদাহ করিব? হে মূসা! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিয়াছেন—তাই আমার উচিত আপনার কিছু উপকার করা। আপনি তিনটি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন—যাহাতে আমি আপনাকে ধ্বংস করিয়া না দেই।

প্রথম—ক্রোধের সময় আমাকে স্মরণ করিবেন ; কেননা, আমার ওয়াসওয়াসা আপনার অন্তরে আছে ; আপনার চোখে আমার চোখ নিবদ্ধ। আমি আপনার শিরায় উপশিরার রক্তের স্রোতের ন্যায় চলাফেরা করি।

দ্বিতীয়—ধর্মযুদ্ধের সময় আমাকে স্মরণ করিবেন। কেননা, যুদ্ধের সময় পরিবার পরিজনকে স্মরণ করাইয়া দিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে যোদ্ধাকে পলায়ন করিতে বাধ্য করি।

তৃতীয়—পর রমণীর নিকট একা বসিবেন না। কেননা, আমি আপনার নিকট তাহার সংবাদদাতা।

আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনআম হইতে বর্ণনা করেন—একবার শয়তান বহু রং-বেরংয়ের ঝালর বিশিষ্ট টুপি মাথায় দিয়া হযরত মূসার নিকট উপস্থিত হইল এবং টুপি খুলিয়া রাখিয়া সালাম করিল।

হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? বলিল—আমি শয়তান।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন—খোদা তোকে ধ্বংস করুন। তুই কেন আসিয়াছিস?

শয়তান বলিল—আপনি আল্লাহর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন নবী তাই আপনাকে সালাম করিতে আসিয়াছি।

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন—তোর মাথায় কি যেন দেখিয়াছিলাম।

শয়তান—উহা দ্বারা মানুষকে আমি আমার জালে আবদ্ধ করি।

হযরত মূসা (আঃ)—কি দ্বারা তুই মানুষকে পরাভূত করিস?

শয়তান—মানুষ যখন নিজেকে বড় মনে করে, নিজের কার্যাবলীকে ভাল জানে এবং পাপকে ভুলিয়া যায়। হে মূসা! আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। পর রমণীর সাথে কখনও একা বসিবেন না। এমন নির্জনতায় কাহাকে পাইলে আমি স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া কুকাজে লিপ্ত করি।

দ্বিতীয়—আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি পালন করুন। কারণ, কেহ এমন প্রতিশ্রুতি করিলে আমার সাথীদিগকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়া নিজে তাহার পিছনে লাগিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাই।

তৃতীয়—যাকাত আদায় করুন। যাকাত যাহাতে আদায় না হয় তজ্জন্য আমি নিজে যাকাত দানকারীর পিছনে লাগিয়া থাকি। অতঃপর শয়তান এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, হায় আফসোস! আমি মূসাকে এমন কথা বলিয়া দিলাম যাহা দ্বারা সে আদম সন্তানদিগকে ভয় দেখাইবে।

হাসান ইবনে সালেহ বলেন—শয়তান রমণীদিগকে বলে তোমরা আমার সেনাবাহিনীর অর্ধাংশ। তোমরা এমন তীর যাহা কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তোমরা আমার গোপন রহস্য ভাণ্ডার এবং আমার কাজের সংবাদদাত্রী স্বরূপ।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন—একজন দরবেশের নিকট শয়তান উপস্থিত হইল জিজ্ঞাসা করিলেন—আদম সন্তানের কোন্ কাজ তোমার পক্ষে অধিক সহায়ক?

শয়তান বলিল—ক্রোধ! মানুষ যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন আমি তাহাকে বালকের হাতের খেলার বলের ন্যায় উলট পালট করি।

সাবেত বলেন—হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর শয়তান তাহার চেলা-চামুণ্ডাদিগকে সাহাবা কেরামদের নিকট পাঠাইতে লাগিল। তাহারা তাহাদের দপ্তর সাদা আনিয়াই ইবলীসের নিকট হাযির করিল। ইবলীস বলিল—তোমরা কোন কাজই করিতে পারিলে না।

তাহারা বলিল—এমন কঠিন লোক আমরা আর দেখি নাই।

ইবলীস বলিল—একটু ধৈর্য ধারণ কর। কিছু দিনের মধ্যে তাহারা

অনেক দেশ জয় করিবে। তারপর নিজেদের ইচ্ছামত তোমরা তোমাদের কাজ আদায় করিতে পারিবে।

হযরত আবু মূসা আশআরী বলেন—সকাল বেলা শয়তান তাহার বাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া বলে—তোমাদের মধ্যে যে কেহ কোন মুসলমানকে গোমরাহ করিতে পারিবে—তাহাকে মুকুট পরিধান করাইব।

একটি শয়তান আসিয়া বলে—আমি অমুকের স্ত্রীকে তালাক দেওয়াইয়াছি। শয়তান বলে—সে যে আবার বিবাহ করিবে উহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

অন্য শয়তান বলে—আমি অমুকের দ্বারা পিতামাতার নাফরমানী করাইয়াছি। শয়তান বলে—সে যে আবার পিতামাতার খেদমত করিবে না উহার নিশ্চয়তা কোথায়?

আর এক শয়তান আসিয়া বলে—আমি অমুককে মদ্যপান করাইয়াছি।

শয়তান বলে—বেশ করিয়াছ। আর একটি শয়তান বলে—আমি অমুক মুসলমানকে দ্বারা ব্যাভিচারী করাইয়াছি। শয়তান বলে—তুমি বড় কাজ করিয়াছ। অন্য শয়তান বলে—আমি অমুক মুসলমান দ্বারা হত্যা করাইয়াছি। ইবলীস বলে—তুমি খুব বড় কাজ করিয়াছ।

হাসান বলেন—লোক একটি গাছের পূজা করিত। একজন লোক সেই গাছটির নিকট আসিয়া বলিল—লোক আল্লাহকে ছাড়িয়া গাছের পূজা করে, আমি অবশ্য ইহা কাটিয়া ফেলিব। মানুষের আকৃতিতে শয়তান আসিয়া বলিল—তুমি কি করিতে চাও? লোকটি বলিল—লোকে আল্লাহর উপাসনা না করিয়া এই গাছের পূজা করে আমি উহা কাটিয়া ফেলিব।

শয়তান বলিল—তুমি তো আর পূজা কর না, লোকে করে করুক তোমার ক্ষতি কি।

উক্ত ব্যক্তি বলিল—না আমি ইহা কাটিয়াই ফেলিব। শয়তান বলিল—তুমি গাছটি কাটিও না। উহার পরিবর্তে প্রত্যেক দিন সকালে তুমি তোমার বালিশের নিচে দুইটি করিয়া দেরহাম পাইবে।

লোকটি চলিয়া গেল এবং পরদিন সকালে সত্যই সে বালিসের নিচে

দুইটি দেরহাম পাইল। কিন্তু তার পরের দিন আর পাইল না। ফলে সে আবার গাছটি কাটিতে গেল।

শয়তান আবার মানুষের আকৃতিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি করিবে? লোকটি বলিল—মানুষ আল্লাহর ইবাদত না করিয়া এই গাছটির উপাসনা করে। তাই আমি ইহা কাটিয়া ফেলিব। ইহা বলিয়া যেই সে গাছটি কাটিতে অগ্রসর হইল অমনি শয়তান তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তারপর ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আমি কে জান? আমি শয়তান। প্রথমবার তুমি আল্লাহর ভয়ে গাছ কাটিতে আসিয়াছিলে কিন্তু এবার আল্লাহর জন্য নয় বরং দেরহাম না পাওয়ার ক্রোধে এই কাজ করিতে আসিয়াছ। তাই প্রথমবার আমি তোমাকে কোন কিছু করার সাহস না পাইয়া টোপ ফেলিয়াছিলাম। তুমি সেই টোপে পড়িয়াছ বলিয়াই তোমাকে এবার কাবু করিতে পারিয়াছি।

মুজাহিদ বলেন—ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে এমন পাঁচজন আছে যাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া কাজের দায়িত্ব দিয়া রাখা হইয়াছে। উহাদের নাম—সাবুর, আওয়ার, ম্যসুত, দাসেম এবং যাকনাবুয।

সাবুরের কাজ বিপদাপদে লোকদিগকে অধৈর্য করিয়া ঈমান নষ্ট করিয়া দেওয়া।

আওয়ার লোকদিগকে ব্যভিচারীতে লিপ্ত করে।

মাসুত—লোকদিগকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে। লোক সেই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া অশান্তির সৃষ্টি করে।

দাসেম—লোকের সাথে তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের অন্যান্য লোকের দোষ-ত্রুটি তাহার চোখে ধরিয়া দিয়া ঝগড়া-বিবাদ এবং অশান্তির সৃষ্টি করে।

যাকনাবুয—হাট-বাজারে ঘুরাফেরা করিয়া ব্যবসায়ীদিগকে অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে উৎসাহ দান করে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন—শয়তান মাটির সর্ব নিম্নস্তরে বাধা অবস্থায় আছে। যখন সে নড়াচড়া করে তখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়-বিবাদের সৃষ্টি হয়।

শয়তানের চক্রান্ত হইতে যাহারা আত্মরক্ষা করিয়া ঈমান সহকারে

মৃত্যুবরণ করে ফেরেশতাগণ তখন বিস্ময় প্রকাশ করেন।

আবদুল আযীয ইবনে রফী বলেন—যখন কোন মোমেন বান্দার আত্মা আসমানে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন ফেরেশতাগণ বলেন—সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা এই বান্দাকে নাজাত দিয়াছেন। আশ্চর্য! কিভাবে সে শয়তান হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিল।

প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করিয়া শয়তান আছে

উরওয়া ইবনে যোবায়ের হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন—এক রাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে উঠিয়া বাহিরে যান। ইহাতে আমার কিছুটা সন্দেহ হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে চিন্তান্বিতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে আয়েশা! তোমার কি হইল? তোমার কি হিংসা হইল? আমি আরয করিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অন্য মহিষীর নিকট যাইবেন আর আমার ঈর্ষা হইবে না?

ইরশাদ করিলেন—আয়েশা! তোমার শয়তান কি তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিল?

আমি বলিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে শয়তান আছে নাকি।

ইরশাদ করিলেন—হাঁ।

—প্রত্যেক লোকের সাথেই আছে?

—হাঁ।

—আপনার সাথেও আছে নাকি?

হাঁ। কিন্তু আমার প্রভু আমাকে আমার শয়তানের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন এবং সে মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন—আল্লাহ আমার শয়তানের উপর আমাকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন এবং সে আমাকে সত্য ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে না।

উম্মুল মোমেনীন হযরত সফিয়া বিনতে হোয়াই বলেন—একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতেকাফে ছিলেন। আমি রাতে তাহার সাথে সাক্ষাত করিতে যাই এবং কথাবার্তা বলিয়া ফিরিয়া আসি। তিনি আমাকে বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য আমার সাথে সাথে আসিলেন। হযরত সফিয়া বলেন—আমার ঘর উসামা ইবনে যায়েদের এলাকার মধ্যে ছিল।

ইত্যবসরে দুইজন আনসারকে দেখা গেল। তাহারা নবীজীকে দেখিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—দাঁড়াও ! দাঁড়াও ! ! আমার সাথে সফিয়া। তাহারা বলিল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ইরশাদ করিতেছেন।

ইরশাদ করিলেন—শয়তান মানবদেহে রক্তস্রোতের ন্যায় চলাচল করে। আমি ভয় করিতেছি যে, শয়তান না জানি তোমাদের অন্তরে কুধারণা সৃষ্টি করিয়া দেয় কিনা ?

আবু সোলায়মান খাত্তাবী বলেন—এই হাদীস দ্বারা এই ফকীহ মাসয়ালা অবগত হওয়া যায় যে, যে কাজে মানুষের কুধারণা হইতে পারে উহা করা হইতে বিরত থাকিবে। ইহাও উচিত যে, নিজেকে অন্যায় হইতে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া লোকের নিন্দাবাদ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভয় হইয়াছিল যে, হয়ত আনসারদ্বয়ের অন্তরে কোন প্রকার কুধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। যাহার ফলে তাহারা কাফের হইয়া যাইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলিয়াছিলেন।

শয়তান হইতে নিরাপদ থাকা

কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এবং যাদু করার সময় শয়তানের হাত হইতে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ রহিয়াছে। যখন এই দুই সময় আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন তখন অন্যান্য সময়ের তো কোন কথাই নাই।

আবুত্তিয়াহ বলেন—আমি আবদুর রহমান ইবনে হুনাইশকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন—হাঁ।

আমি বলিলাম—যে রাতে শয়তান বাহিনী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করিয়াছিল সেই রাত সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি বলিলেন—শয়তান বাহিনী বনজঙ্গল হইতে, পাহাড়ের ঘাঁটি হইতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করিল। উহাদের মধ্যে একটি শয়তান হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখমণ্ডল জ্বালাইয়া দেওয়ার জন্য আগুন লইয়া আগাইয়া আসিল। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোআ পাঠ করিতে বলিলেন—

"আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তামাতি মিন্ শাররি মা খালাকা ওয়া খারায়া ওয়া রায়ায়া ওয়া মিন শাররি মা ইউনযিলু মিনাস সামারি ওয়া মিন শাররি মা ইয়াবিজু ফীহা ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়া মিন শাররি কুল্লি তারেকিন ইল্লা তারেকান ইয়াতরিক বিখাইরিন ইয়া রাহমান।"

বর্ণনাকারী বলেন—নবীজী এই দোআ পাঠ করিতেই আগুন নিভিয়া গেল এবং শয়তান বাহিনী পরাজয় বরণ করিল।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমাদের মধ্যে কোন একজনের নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা কে? সে বলে—আল্লাহ্।

আবার জিজ্ঞাসা করে—তোমার আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা কে? তোমাদের কাহারও অন্তরে এই ধারণা হইলে বলিবে—'আমানতু বিল্লাহি ওয়া রাছুলিহি।' ইহা বলিলে শয়তান চলিয়া যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আদম সন্তানকে শয়তান এবং ফেরেশতা স্পর্শ করে। যখন শয়তান স্পর্শ করে তখন সে খারাপ কাজ করে এবং সত্যকে মিথ্যা জানে এবং যখন ফেরেশতা স্পর্শ

করে তখন সে সৎকাজ করে এবং সত্যকে মানিয়া লয়। যখন তোমার অন্তরে পুণ্যভাব উদয় হয় তখন মনে করিও যে, ইহা আল্লাহর দান এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। আবার যখন খারাপ ধারণা উদয় হয় তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করিলেন—

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ الخ –

শয়তান তোমাদিগকে অভাব অনাটনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং খারাপ কাজে নির্দেশ দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান হোসায়েন (রাযিঃ)এর জন্য এই দোআ পাঠ করিয়া আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন—

"উয়িযুকুমা বিকালি মাতিল্লাহ্ত্তাম্মাতি মিন কুল্লি শাইতানিও ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিল লাম্মাতি।

তারপর ইরশাদ করিতেন আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসহাক এবং ইসমাঈল (আঃ)এর জন্য দোআ পাঠ করিতেন।

সাবেত হইতে বর্ণিত আছে, মাতরাফ বলেন—আমি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, আল্লাহ এবং শয়তানের মধ্যে বান্দা পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিরাপদ রাখেন। আর যদি ছাড়িয়া দেন তবে শয়তান তাহাকে নিজ আয়ত্বে লইয়া যায়।

কোন একজন বুযুর্গ তাহার শাগরিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শয়তান যখন পাপকে তোমার দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া দেখাইবে তখন তুমি কি করিবে? শাগরিদ বলিল—শয়তানকে পরিশ্রমের কাজে লাগাইয়া দিব। এইভাবে তিনবার প্রশ্ন করিলেন শাগরিদ একই উত্তর দিলে বুযুর্গ বলিলেন—ইহা খুব খারাপ কথা! আচ্ছা বল তো তুমি যদি কোন ছাগ পালের নিকট দিয়া যাও তখন যদি ছাগ পালের পাহারাদার কুকুর তোমাকে আক্রমণ করে এবং তোমার গমনে বাধা দেয় তখন কি করিবে?

শাগরিদ বলিল—আমি উহাকে প্রহার করিব এবং সামর্থ অনুযায়ী বাধা দিব।

বুযুর্গ বলিলেন—ইহাও তোমার পক্ষে অন্যায়। বরং তোমার কর্তব্য ছাগ পালের মালিককে ডাকা যিনি তোমাকে কুকুরের হাত হইতে রক্ষা করিবেন।

গ্রন্থকার বলেন—ইবলীসের উদাহরণ মুত্তাকী এবং দুনিয়াদারের সঙ্গে এমন যে, একজন লোক বসা এবং তাহার সামনে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নাই। তাহার সম্মুখ দিয়া একটি কুকুর যাওয়ার সময় ধমক দিতেই চলিয়া গেল। অন্য ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় তাহার সামনে গোশ্‌ত রুটি দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

ধমক দেওয়া সত্ত্বেও কুকুর দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রথম ব্যক্তির উদাহরণ মুত্তাকীর। তাহার নিকট শয়তান আসিলে উহাকে দূর করার জন্য আল্লাহর যিকরই তাহার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় ব্যক্তির উদাহরণ দুনিয়াদারের। শয়তান তাহার নিকট হইতে কখনও দূর হয় না। কারণ, সে সব কিছুর সাথেই জড়িত।

তালবীস ও গুরূর

গ্রন্থকার বলেন—তালবসী শব্দের অর্থ অসত্যকে সত্যের পোশাকে প্রকাশ করা। গুরূর এক প্রকার নাদানী যাহার প্রভাবে অশুদ্ধ ধর্ম বিশ্বাস (আকীদা) বিশুদ্ধ মনে হয়। এবং অসুন্দর সুন্দর হইয়া প্রতিভাত হয়। এই নাদানীর কারণ শুধু কোন এমন সন্দেহের অস্তিত্ব যাহার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। শয়তান যথসাধ্য লোকের নিকট আগমন করে এবং তাহাকে পরাভূত করিতে চায়। লোকের জ্ঞান বুদ্ধি এবং অজ্ঞতার পরিমাণ অনুযায়ীই শয়তান তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষের অন্তকরণ প্রাচীরবেষ্টিত দূর্গস্বরূপ। উক্ত প্রাচীরে দরজা জানালা আছে। উক্ত দূর্গে ফেরেশতাগণ গমনাগমন করিয়া থাকেন। দূর্গের এক পাশে মাঠ, সেই মাঠে শয়তান এবং কাম-রিপু লোভ-লালসা বিনা বাধায় যাতায়াত করে। দূর্গবাসী এবং মাঠের অধিবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে থাকে।

শয়তান দূর্গের চারিপাশে ঘুরাফেরা করে এবং প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগ লইয়া দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। তাই প্রহরীদের উচিত

তাহাদের কর্তব্য কাজ সম্বন্ধে সদা সতর্ক থাকা যেন তাহাদের অসতর্ক মুহূর্তে শয়তান দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে।

কোন ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল—হযরত! শয়তান কি কখনও ঘুমায়?

তিনি বলিলেন—শয়তান ঘুম আসিলে আমরা অনেক আরামে থাকিতে পারিতাম।

এই দূর্গ আল্লাহর যিকর দ্বারা উজ্জ্বল এবং ঈমান দ্বারা আলোকিত থাকে। দূর্গে একখানি উজ্জ্বল আয়না আছে, উহাতে আকৃতি দেখা যায়। শয়তান মাঠে বসিয়া প্রথমে অধিক পরিমাণ ধুয়া নির্গম করে; যাহার ফলে দূর্গ প্রাচীর অন্ধকার হইয়া যায় এবং আয়নার রং ধরে। এই ধুয়া যিকরের বাতাসে দূর হয় এবং যিকরে আয়নার রং পরিস্কার হয়। বিভিন্ন পন্থায় শত্রুপক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে। কখন কখন দূর্গে প্রবেশ করিতে চাহিলে পাহারাদারগণ আক্রমণ করে। আবার কখনও দূর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকে। কখন কখন পাহারাদারদের অলসতার দরুন দূর্গ মধ্যেই বসবাস করে।

অধিকাংশ সময় ধুয়া দূরকারী বাতাস থামিয়া যায়। তখন দূর্গের প্রাচীর অন্ধকারময় হইয়া যায়—আয়নার রং ধরে। তখন শয়তান সকলের অগোচরে দূর্গে প্রবেশ করে। আবার কখনও যদি পাহারাদার বাহিরে চলিয়া যায় তখন শত্রুপক্ষ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে এবং তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লয়। সেও লোভের বশীভূত হইয়া শয়তানের দলেই থাকিয়া যায়।

একজন বুযুর্গ বলেন—শয়তান একবার আমাকে বলিল—এমন এক সময় ছিল যখন আমি মানুষের সাথে সাক্ষাত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতাম। আর বর্তমানে আমিই তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করি। অধিকাংশ সময় শয়তান জ্ঞানবানদের নিকট আসিয়া লোভ-লালসাকে নববধুর আকৃতিতে পেশ করে। উহা দেখিয়া তাহারা শয়তানের কাছে ধরা দেয়। মূর্খতা মানুষের পরম শত্রু। সামান্য পরিমাণ ঈমানের নূর মানুষের মধ্যে থাকিতেও শত্রুপক্ষ কৃতকার্য হইতে পারে না।

আমাশ বলেন—পাগলের ন্যায় আচরণকারী এক ব্যক্তি আমাকে

বলিল—শয়তানগণ পরস্পর বলাবলি করিতেছিল যে যাহারা সুন্নতের অনুসারী তাহারাই আমাদের কঠোর শত্রু। আর যাহারা লোভ–লালসায় নিমজ্জিত আমরা তো তাহাদের সাথে খেলা করি।

প্রতিমা পূজকদের সাথে শয়তানের শয়তানী

শয়তান আল্লাহর বহু সৃষ্টিকে দেব–দেবীর উপাসনা করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। তাহাদের কাহাকে কাহাকে এই বুদ্ধি দিয়াছে যে, এই সব দেব–দেবীই তোমাদের মাবুদ বা উপাস্য। আর এই অজ্ঞের দল উহাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে। আর যাহাদের একটু বুদ্ধি আছে তাহাদের সম্বন্ধে শয়তানের ধারণা—আমার এই কথা ইহারা বিশ্বাস করিবে না। তাই তাহাদের নিকট বলিয়াছে—তোমাদের এই উপাস্য দেব–দেবী আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে। কুরআন মজীদে তাহাদের কথাই উল্লেখ রহিয়াছে—"আমরা উহাদের উপাসনা করি না কিন্তু এইজন্য উপাসনা করি যে, উহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করিবে।"

মূর্তিপূজার প্রচলন সম্বন্ধে হিশাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সায়েব হালবী বলেন—হযরত আদম (আঃ)–এর ইন্তিকালের পর হযরত শীশ (আঃ)–এর সন্তানগণ বেহেশত হইতে হযরত আদম (আঃ) যেই পাহাড়ে অবতরণ করিয়াছিলেন সেই পাহাড়ে দাফন করেন। উহা ছিল ভারত উপমহাদেশের 'নূদা' নামক একটি পাহাড়। পৃথিবীতে অন্যান্য পাহাড় হইতে এই পাহাড়টি ছিল অধিক সবুজ শ্যামল।

হিশাম বলেন—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মোতাবেক আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন—হযরত শীশ (আঃ)–এর সন্তানগণ দাদার কবর দেখার জন্য যেই পাহাড়ে যাতায়াত করিত ; তাহারা সেই কবরকে সম্মান করিত ; ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইত। ইহা দেখিয়া কাবীলের সন্তানদের মধ্যে একজন বলিল—হে বনী কাবীল! বনী শীশের নিকট এমন একটি বস্তু আছে যাহার চারিদিকে তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া সম্মান দেখায় উহা তোমাদের নিকট নাই। অতঃপর সেই ব্যক্তি বনী কাবীলের জন্য একটি মূর্তি তৈয়ার করিল। এই ব্যক্তিই পৃথিবীর প্রথম মূর্তি তৈয়ারকারী।

হিশাম বলেন—আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন যে, অদ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং নসর এই পাঁচ ব্যক্তি অত্যন্ত নেক ছিলেন এবং তাহারা একই মাসে মারা যান। ফলে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন খুবই শোকাতুর হইয়া পড়ে। তখন কাবীলের সন্তানদের মধ্যে একজন তাহাদিগকে বলিল—আমি তোমাদের উক্ত পাঁচ ব্যক্তির প্রতিকৃতি বানাইয়া দিব। প্রাণ দেওয়া ব্যতীত আমি হুবাহুব তাহাদের মূর্তি তৈয়ার করিয়া দিতে পারিব। তাহারা সম্মতি দিল।

সেই ব্যক্তি পাঁচটি মূর্তি বানাইয়া দিল এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন মূর্তিগুলি চারিপাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া সম্মান দেখাইত। এইভাবে ইয়াখদ ইবনে মাহলায়েল ইবনে কীনান ইবনে আনূশ ইবনে শীশ ইবনে আদম (আঃ) পর্যন্ত প্রথম শতাব্দী তারপর দ্বিতীয় শতাব্দীও অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৃতীয় শতাব্দীর লোকেরা বলিল—আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অযথা এই সমস্ত মূর্তিদের সম্মান করে নাই। বরং এইজন্যই করিয়াছে যে, উহারা তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে। ইহার পর হইতেই তাহার মূর্তিগুলির উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। ফলে তাহারা কাফের হইয়া গেল।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা হযরত ইদরীস (আঃ)কে রাসূল করিয়া পাঠান। কিন্তু তাহারা হযরত ইদরীস (আঃ)এর উপদেশ গ্রহণ করিল না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত ইদরীস (আঃ)কে আসমানে উঠাইয়া লইয়া যান।

ইহার পর দেব-দেবীর উপাসনা আরও সুশৃঙ্খলভাবে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। এই সময় হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুয়তের যুগ আসিল। ৪৮০ বৎসর বয়সের সময় আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)কে নবুয়ত দান করেন। তিনি একশত বিশ বৎসর পর্যন্ত লোকদিগকে সৎপথে আহবান করেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেহই আল্লাহর উপর ঈমান আনিল না। বরং হযরত নূহ (আঃ)কে মিথ্যাবাদী বলিল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)কে নৌকা তৈয়ার করিতে বলিলেন। ছয়শত বৎসর বয়সের সময় তিনি নৌকায় আরোহণ করেন।

তারপর তুফানে সমস্ত পাপী মারা যায়। ইহার পর হযরত নূহ (আঃ) ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত নূহ (আঃ)এর সময় পর্যন্ত দুই হাজার দুই শত বৎসরের ব্যবধান ছিল।

এই তুফানে মূর্তিগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভাসাইয়া লইয়া গেল এবং পরিশেষে জেদ্দার তীরে আসিয়া ঠেকিল। পানি শুকাইয়া গেলে বালুর নিচে চাপা পড়িয়া গেল।

আমর ইবনে লুহাই নামক একজন কাহেন অর্থাৎ গণক ছিল। তাহার উপাধি ছিল আবু সামামা। একটি জিন তাহার মুয়াক্কেল ছিল। একদিন সেই জিন তাহাকে বলিল—জেদ্দার তীরে যাও, সেখানে কয়েকটি মূর্তি পাইবে। এগুলি সাথে করিয়া লইয়া আস। কাহাকেও ভয় না করিয়া আরববাসীকে উহাদের ইবাদত-বন্দেগী করিতে বল।

এই নির্দেশমত আমর জেদ্দা যায় এবং জিনের নির্দেশমত ঐগুলি তালাশ করিয়া তাহারা লইয়া আসে। ইহার পর সে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহার জিন তাহাকে বলিল—সিরিয়ার বালকা নামক স্থানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহার পানিতে গোসল করিলে তুমি সুস্থ হইবে। পাপিষ্ঠ সেখানে গিয়া উক্ত প্রস্রবণের পানি দ্বারা গোসল করিয়া রোগমুক্ত হইল। সে দেখিল তথাকার লোক মূর্তিপূজা করিতেছে।

সে তাহাদের নিকট হইতে একটি প্রতিমা লইয়া আসিয়া কাবার একপাশে স্থাপন করিল। সবচেয়ে বড় প্রতিমার নাম ছিল 'মানাত'। আরবের সব লোক উহার সম্মান করিত এবং উহার নামে জীবজন্তু কুরবানী করিত। সকলের সম্মানিত উপাস্য থাকা সত্ত্বেও আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় উহাকে অধিক সম্মান করিত।

হযরত ইবনে ইয়াসির বলেন—আউস ও খাযরাজ বংশীয় লোক হজ্জের যাবতীয় কাজ সমাধা করা সত্ত্বেও মাথা মুণ্ডাইত না বরং দেশে ফিরার পথে মানাতের সম্মুখে যাইয়া মাথা মুণ্ডন করিত। এ কাজ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তাহাদের হজ্জ সমাধা হইত না। মক্কাবিজয়ের বৎসর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে মানাত ধ্বংস করিবার জন্য পাঠান। হযরত আলী উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলেন।

লাতের মন্দির ছিল তায়েফে ; বনী সাকীক গোত্র উহার উপাসনা

করিত। কুরায়েশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রও উহার উপাসক ছিল। বর্তমানে যেখানে তায়েফের মসজিদ উহার বা-দিকে মিনারের স্থানেই ছিল লাতের মন্দির। বনী সাকীফ ইসলাম গ্রহণ করার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগীরা ইবনে শোবাকে পাঠান। হযরত মুগীরা মন্দিরে আগুন ধরাইয়া দিলে যালেম ইবনে আসআদ মুর্তিটি কাঁধে উঠাইয়া লইয়া গিয়া নাখলায় শামিরার মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে স্থাপন করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—উয্যা একটি শয়তান রমণী, সে বতনে নাখলার কিকর নামক তিনটি গাছের নিকট আসিত। মক্কা বিজয়ের পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ ইবনে ওয়ালীদ বলিলেন—তুমি বতনে নাখলায় যাও। সেখানে তুমি কিকরের তিনটি গাছ দেখিতে পাইবে। প্রথম গাছটি মূল সহ কাটিয়া ফেলিবে। হযরত খালেদ নির্দেশমত প্রথম গাছটি কাটিয়া ফিরিয়া আসিলে নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—কিছু দেখিয়াছ?

হযরত খালেদ আরয করিলেন—জ্বি না।

নবীজী বলিলেন—যাও দ্বিতীয় গাছটিও কাটিয়া আস। হযরত খালেদ দ্বিতীয় গাছটি কাটিয়া আসিলে নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—কিছু দেখিয়াছ?

হযরত খালেদ বলিলেন—জ্বি না।

আবার তৃতীয় গাছটি কাটিতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি গিয়া দেখেন—এলো চুলে দুই হাত কাঁধের উপর রাখিয়া এক রমণী দাঁত কড়মড় করিতেছে এবং তাহার পিছনে দাঁড়ানো দানিয়া সালমী। খালেদ সেই শয়তান রমণী এবং দানিয়া উভয়কেই হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসেন এবং সকল কথা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—এই রমণীই উযযা ছিল। ভবিষ্যতে আরবের জন্য আর কখনও উয্যার আবির্ভাব হইবে না।

হিশাম ইবনে কালবী বলেন—কাবা গৃহের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বহু দেব-দেবী ছিল। উহার মধ্যে হোবল ছিল শ্রেষ্ঠ। উহা ছিল লাল

ইয়াকুতের তৈরী। উহার পিঠে একজন মানুষ বসা ছিল। কোরায়েশগণ উহার ডান হাত ভাঙ্গা অবস্থায় পাইয়াছিল। পরে স্বর্ণের হাতু তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল। উহার প্রতিষ্ঠাতা ছিল খোযায়মা ইবনে মুখরাকা ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুযর। উহা কাবার মধ্যস্থলে ছিল। অহুদ যুদ্ধের সময় আবু সুফইয়ান এই মূর্তিটি সাথে করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিলেন—এবং 'আ'লা হোবল'—অর্থাৎ হে হোবল তোমার দ্বীনই সত্য ধ্বনি দিয়াছিলেন। প্রত্যোত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন—

الله اعلى واجل .

আল্লাহ শ্রেষ্ঠ এবং মহান।

মুশরিকদের দেব-দেবীর মধ্যে আসাফ এবং নায়েলাহও ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন—আসাফ ইবনে ইউলা এবং নায়েলা বিনতে যায়েদ জুরহাম গোত্রীয় যুগল প্রেমিক-প্রেমিকা। ইহারা উভয়েই ইয়ামন হইতে হজ্জ্ব করার জন্য মক্কা আসে। একরাতে উভয়েই কাবা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে কোন লোকজন নাই। এই নির্জনতার সুযোগ লইয়া ব্যভিচারী করে। পাপের ফলস্বরূপ তাহারা পাথরে পরিণত হয়।

প্রাতঃকালে উভয়কে বিকৃত অবস্থায় দেখিয়া লোকে বাহিরে লইয়া আসে এবং লোকের শিক্ষার জন্য কাবার এক পাশে রাখিয়া দেয়। বহুদিন পর অন্যান্য প্রতিমার সাথে আরববাসী ইহাদেরও পূজা করিতে থাকে।

অন্য আর একটি প্রতিমার নাম ছিল যুলখালছা। উহা ছিল দুধের ন্যায় সাদা পাথরের তৈরী। মক্কা হইতে সাত দিনের দূরবর্তী স্থান মক্কা ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নসর নামক আর একটি প্রতিমা ছিল সাবার মালখা নামক স্থানে। হুমিরা এবং অন্যান্য গোত্র উহার পূজারী ছিল। যুনাওয়াস নামক এক ব্যক্তি এই পূজারীদিগকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করার পরও উহাদের উপাসনা চলিতে থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই মূর্তিগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমার সম্মুখে জাহান্নাম পেশ করা হইলে আমর ইবনে লুহাইকে দেখিলাম। তাহার দেহ বেটে এবং রং লাল। পেটের আঁতুড়ি বাহির করা অবস্থায় দোযখে ঘুরাফেরা

করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এই ব্যক্তি কে? উত্তর পাইলাম—এই ব্যক্তি আমর ইবনে লুহাই। এই ব্যক্তিই প্রথমে মহিরা, অছীলা, সায়েবা, হাম ইত্যাদি দেব-দেবীর উপাসনার প্রবর্তন করিয়াছিল। এবং ইসমাঈলের ধর্মের বিকৃতি করিয়াছিল। এই ব্যক্তিই আরববাসীকে প্রতিমা পূজার প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়াছিল।

হেশাম ইবনে কালবী বলেন—হযরত ইসমাঈল (আঃ)এর বংশধর সংখ্যায় বাড়িয়া মক্কায় আধিপত্য বিস্তার করতঃ 'আমালিক' সম্প্রদায়কে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহার পর বনী ইসমাঈল যখন সংখ্যায় আরও বাড়িয়া গেল তখন মক্কায় তাহাদের সঙ্কুলান না হওয়ার ঝগড়া বিবাদ করিয়া জীবিকার ও বাসস্থানের সন্ধানে নানা স্থানে চলিয়া যায়। যাওয়ার সময় অবশ্য সাথে করিয়া হরম শরীফের একখানা পাথর লইয়া যাইত। এবং যেখানে বসতি স্থাপন করিত সেখানে পাথরখানা স্থাপন করিয়া কাবার ন্যায়ই উক্ত পাথরের চারিদিকে তাওয়াফ করিত এবং সম্মান প্রদর্শন করিত।

ইহা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তরে কাবার সম্মান পূর্ববৎ অক্ষুন্ন ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর শরীয়ত মত কাবায় হজ্জ করিত। তারপর নিজেদের পছন্দ মত দেব-দেবীর উপাসনা করিয়া পিতৃধর্ম ভুলিয়া যায়। এতদসত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর শরীয়তের কতিপয় কাজ যথারীতি সম্পাদন করিত। যেমন—কাবার তাওয়াফ করা, হজ্জ, ওমরা, আরাফাত ও মুযদালাফায় অবস্থান করা, কুরবানী করা, তালবিয়া পাঠ করা ইত্যাদি।

আমর ইবনে লুহাই যখন আরববাসীকে প্রতিমা পূজার প্রতি আহ্বান জানায় তখন আউফ ইবনে উমরা ইবনে যায়েদ আললাফ তাহার আহ্বানে সাড়া দেয়। আমর উক্ত আউফকে ওদ্দ নামক একটি প্রতিমা দেয়। আউফ প্রতিমাটি ওয়াদিউল কুরার দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। সে এই প্রতিমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া এক ছেলের নাম রাখে আবেদ ওদ্দ বা ওদ্দের বান্দা। তারপর হইতেই আউফের বংশধর ওদ্দের পূজা অর্চনা করিতে থাকে।

কালবী বলেন—আমি ওদ্দ প্রতিমা দেখিয়াছি। আমার পিতা আমাকে

দুধ লইয়া উক্ত প্রতিমার নিকট পাঠাইয়া দিত। আমি পথিমধ্যে সেই দুধ পান করিয়া ফেলিতাম। তাবুক যুদ্ধের পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত প্রতিমাটি ধ্বংস করার জন্য খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে প্রেরণ করেন। বনী ওদ্দ এবং বনী আমের হযরত খালেদকে বাধা দিলে হযরত খালেদ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মূর্তিটি নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন।

মযরত ইবনে নযর আমর ইবনে লুহাইর আহবানে সাড়া দিলে সে মযরকে সুয়া নামক একটি প্রতিমা দান করে। মযর উহা নাখলার রাহাত নামক স্থানে স্থাপন করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল লোকই উহার উপাসনা করিতে থাকে।

মাযহাজ গোত্রীয় আনআম ইবনে আমর মুরাদীকে দেওয়া হয় ইয়াগুস। এইভাবে আমর ইবনে লুহাই বিভিন্ন গোত্রে প্রতিমা বন্টন করিয়া আরবদেশে প্রতিমা পূজার প্রচলন করে।

অগ্নি, চাঁদ, সূর্য পূজকদের প্রতি শয়তানের ধোকা

শয়তান অগ্নি উপাসকদিগকে এই বলিয়া পরামর্শ দেয় যে, অগ্নি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহা ব্যতীত পৃথিবী অচল। সুতরাং এমন শক্তি উপাসনারই যোগ্য।

ইমাম আবু জাফর ইবনে জরীর তাবারী বলেন—কাবীল যখন হাবীলকে হত্যা করিয়া পিতা আদম (আঃ)এর নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ইয়ামন চলিয়া যায় তখন ইবলীস তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, হাবীল অগ্নিপূজা করিত তাই আগুন তাহার কুরবানী গ্রহণ করিয়াছিল। তুমিও অগ্নিপূজা করা তাহা হইলে অগ্নি তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রতি সদয় থাকিবে। অতঃপর কাবীল একটি আতশখানা তৈয়ার করিয়া অগ্নিপূজা করিতে থাকে।

জাহেয বলেন---অগ্নি উপাসকদের পয়গাম্বর যেরাদশত বলখের অধিবাসী। তাহার দাবী ছিল আমি সাইলান পাহাড়ে ছিলাম সেখানেই আমার উপর অহি অবতীর্ণ হয়। এই এলাকার সারা বৎসর প্রচণ্ড শীত থাকে। যরদশত আরও বলিত আমি শুধু মাত্র এই এলাকার জন্যই নবী

হওয়া আসিয়াছি। অন্য এলাকায় আমার কোন অধিকার নাই।

সে তাহার অনুসারীদের জন্য জঘন্য প্রকার শরীয়তের প্রবর্তন করিয়াছিল। যেমন পেশাব দ্বারা অযু করা ; মা, বোন এবং মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা।

যেরাদশত বলিত—যখন আল্লাহ একা ছিলেন তখন তিনি চিন্তা-ভাবনা করিয়া শয়তানকে সৃষ্টি করেন। শয়তান তাহার সম্মুখে আসিলে তিনি শয়তানকে নিহত করিতে মনস্থ করেন। শয়তান তাহাকে বাধা দিল। আল্লাহ অপারগ হইয়া শয়তানের সাথে সন্ধি স্থাপন করিলেন (নাউযুবিল্লাহ)।

অগ্নি উপাসকগণ উপাসনার জন্য বহু আতশখানা তৈয়ার করে। সর্বপ্রথম আফ্রিদীগণ তারসূসে আতশখানা নির্মাণ করে এবং দ্বিতীয়টি তৈয়ার করে বোখারায়। অতঃপর বাহমান, সীস্তান এবং কুবাদ বোখারার সীমান্ত এলাকায় অগ্নি উপাসনালয় স্থাপন করে। পর পর আরও অনেকগুলি উপাসনালয় স্থাপিত হয়।

মাজুসীদের সম্বন্ধে বশীর ইবনে নাহাওয়ান্দী (রহঃ) বলেন—মাজুসীদের প্রথম বাদশাহ ছিল কিউমরাস। এই ব্যক্তিই মাজুসী ধর্মের প্রবর্তক। তারপর তাহাদের মধ্যে একের পর এক একজন নবুয়তের দাবী করিতে থাকে। সর্বশেষ নবুয়তের দাবীদার ছিল যরদশত।

যেরাদশত বলিত, আল্লাহ একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি প্রকাশ লাভ করিয়াছেন। যরদশত অগ্নিপূজা এবং সূর্যপূজার প্রবর্তন করে। প্রমাণস্বরূপ বলে যে—সূর্য এই পৃথিবীর বাদশাহ। সূর্য দিনকে আনে রাতকে তিরোহিত করে ; উদ্ভিদকে সজীব করে ; জীবজন্তুকে বর্ধিত করে, জীবদেহে তাপ সঞ্চার করে। মাটির সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহারা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে না। তাহারা বলে, মাটি দ্বারা জীবজন্তুর সৃষ্টি—সুতরাং উহাকে আমরা অপবিত্র করিতে পারি না।

পানির সম্মানার্থে পানি দ্বারা গোসল করে না। তাহারা বলে, পানি সকল জীবেরই জীবন। অবশ্য গাভী ইত্যাদির প্রস্রাব ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন প্রকার জীবজন্তু যবেহ করা জায়েয নয়। বরকত লাভ করার জন্য গাভীর প্রস্রাব দ্বারা মুখ ধৌত করে। প্রস্রাব

যত পুরান হয় ততই নাকি বরকত বিশিষ্ট।

মায়ের সাথে ব্যভিচারী করা জায়েয। তাহারা বলে মায়ের মায়ের কাম বাসনা চরিতার্থ করা পুত্রেরই অধিক কর্তব্য। স্বামী মারা যাওয়ার পর পুত্র তাহার অধিক হকদার। পুত্র না থাকিলে মৃত স্বামীর সম্পত্তি দ্বারা কোন পুরুষকে ভাড়া করিয়া লইত।

মযদক বলে—রমণী যে কোন পুরুষের জন্যই বৈধ। মযদক স্বয়ং বাদশাহ কুব্বাদের স্ত্রীর সাথেও ব্যভিচারী করিয়াছিল যেন অন্যান্য লোক তাহার অনুসরণ করে। লোক ব্যাপকভাবে এই অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। নওশেরওয়ার মায়ের পালা আসিলে মযদক কুব্বাদকে বলিয়া পাঠাইল—নওশেরওয়ার মাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। যদি অস্বীকার কর এবং আমার কাম বাসনাকে চরিতার্থ করিতে না দাও তবে তোমার ঈমান দুরস্ত হইবে না। কুব্বাদ তাহাকে পাঠাইতে মনস্থ করিল। নওশেরওয়া এই সংবাদ পাইয়া মায়ের ইয্যত রক্ষা করিবার জন্য মযদকের হাত পা ধরিয়া অনুরোধ করায় মযদক নওশেরওয়ার অনুরোধ রক্ষা করে।

কুব্বাদ মারা যাওয়ার পর নওশেরওয়া শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া মযদকের অনুসারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। মাজুসীদের মতে নেক সৃষ্টিকারী কখনও বদ সৃষ্টি করে না। তাই তাহাদের মতে খোদা দুইজন। উহাদের একজন নূর ; সে হেকমত বিশিষ্ট ; সে শুধু মঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা। অন্যজন শয়তান। সে অন্ধকার, শুধু অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্তা।

শ্যয়খ নওবখতী বলেন—সৃষ্টিকর্তা কোন বিষয়ে সন্দেহ করেন ; সেই সন্দেহ হইতেই শয়তানের সৃষ্টি।

কোন কোন মাজুসীর মতে—প্রথমাবস্থায় আল্লাহ এই শয়তানের মধ্যে মতৈক্য ছিল। শয়তান চালাকি করিয়া তাহার সৈন্য সামন্ত লইয়া আল্লাহ এবং তাহার ফেরেশতাদিগকে অবরোধ করে এবং তিন হাজার বৎসর পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। তারপর আল্লাহ তাআলা এই শর্তে ইবলীসের সাথে সন্ধি করেন যে শয়তান সাত হাজার বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে হুকুমত করিবে। এই সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর লোক অশান্তিতে কাটাইবে।

আল্লাহ এবং শয়তানের মধ্যে সন্ধি হওয়ার পর তাহারা উভয়ে তাহাদের তরবারী দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিল। সালিশদ্বয় বলিল---তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে—তাহাকে আমরা দুই টুকরা করিয়া ফেলিব।

এই প্রকার অর্থহীন অনেক কথাই তাহারা শয়তানের প্ররোচনায় বলিয়া থাকে।

শয়তান চাঁদ সূর্যের পূজার প্রতিও লোকদিগকে প্রলুব্ধ করে। কোন কোন সম্প্রদায়ের ধারণা আকাশ, চাঁদ, সূর্য অন্যান্য বস্তুর চেয়ে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী। তাই উহারা উপাসনার যোগ্য। তাই তাহারা চাঁদ সূর্যের নামে প্রতিমা গড়িয়া উহার জন্য মন্দির তৈয়ার করে। ইস্পাহানের পাহাড় চূড়ায় এমন একটি মন্দির ছিল। ভারত এবং বলখ শহরেও এমনিতর সূর্য দেবের মন্দির আছে। যেহাক সানআ শহরে একটি মন্দির তৈয়ার করিয়াছিল। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) উহা ধ্বংস করিয়া দেন।

ফরগনা শহরে কাবুস এমনি একটি মন্দির নির্মাণ করে। আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ উহা ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইয়াহইয়া ইবনে বশীর ইবনে উমাইর নাহাওয়ানদী বলেন—ভারতে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ নামক এক ব্যক্তি। সে হিন্দুদের জন্য প্রতিমা তৈয়ার করে এবং মুলতানে ছিল উহার প্রধান মন্দির। এই মন্দিরেই হিন্দুদের প্রধান দেবতা স্থাপন করা হইয়াছিল।

হাজ্জাজ সাকাফীর শাসনামলে মুলতান শহর মুসলিম পদানত হয়। মুসলিম বাহিনী মন্দির ও প্রতিমা ভাঙ্গিতে চাহিলে পাণ্ডাগণ বলিল—তোমরা যদি এই মন্দির না ভাঙ্গ তবে উহার আমদানীর এক-তৃতীয়াংশ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। সেনাপতি হাজ্জাজকে, হাজ্জাজ খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে এই সম্বন্ধে জানাইলেন। মালেক নির্দেশ দিলেন—মন্দির ভাঙ্গিও না।

এই মন্দিরের দেব দর্শনের নজরানা ছিল একশন হইতে দশ হাজার টাকা। ইহার কমও নয় বেশীও নয়। এই পরিমাণ নজরানা দিতে অপারগ ব্যক্তির ভাগ্যে দেব দর্শন জুটিত না। দর্শক প্রথমে নজরানার টাকা একটি

সিন্দুকে রাখিয়া দেবী দর্শন করিত। দর্শকগণ চলিয়া গেলে সিন্দুকের টাকা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ মুসলমানদিগকে দ্বিতীয় ভাগ শহর প্রাচীর মেরামতের খাতে দিয়া তৃতীয়াংশ পাণ্ডারা বাটোয়ারা করিয়া লইত।

আরবের মুশরিকদের যাহাদের কোন নির্দিষ্ট দেবদেবী ছিল না তাহারা নিজেদের ইচ্ছামত কোন একটি পাথর উঠাইয়া লইত এবং কোন স্থানে রাখিয়া উহার চারিপাশে তাওয়াফ করিত। এই জাতীয় পাথরকে তাহারা 'আনসার' বলিত।

কোন মুশরিক বিদেশে গেলে চারিখানি পাথর উঠাইয়া লইত। তারপর যেই পাথরখানি ভাল মনে হইত উহার উপাসনা করিত এবং অবশিষ্ট তিনখানি দ্বারা চুলা বানাইত। যাওয়ার সময় সব কয়খানি পাথরই ফেলিয়া যাইত। আবার যেখান মনযিল করিত সেখানেও তদ্রূপ করিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন—এমন এক সময় আসিবে যখন প্রতিমা পূজারীদের সংখ্যা বাড়িবে এবং ইসলাম হইতে লোক ফিরিয়া যাইবে।

আবু রেজা আত্তারী বলেন—জাহেলিয়াত যুগে আমরা পাথর পূজা করিতাম। ঐ পূজিত পাথরের চেয়ে কোন ভাল পাথর পাইলে উহা ফেলিয়া দিয়া ভাল পাথরখানাই পূজা করিতাম। কোন পাথর না পাইলে বালু জমা করিয়া টিলার ন্যায় উচু করিতাম। অতঃপর উহার উপর ভেড়া উঠাইয়া দিয়া দোহন করিয়া সেই টিলারই উপাসনা করিতাম।

সুফইয়ান ইবনে উআইনিয়াকে লোক জিজ্ঞাসা করিল—প্রতিমা এবং পাথর পূজার প্রচলন কিভাবে হইল? তিনি বলিলেন—মুশরিকদের দলীল এই যে, তাহারা বলিত—বায়তুল্লাহ পাথরের তৈরী সুতরাং আমরা যেখানেই পাথর রাখিয়া পূজা করি না কেন উহা কাবার সমতুল্যই হইবে।

শায়খ আবু মুহম্মদ নওবখতী বলেন—হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি শাখার বিশ্বাস আল্লাহ আছেন, রাসূলের আবির্ভাব হইয়াছে। বেহেশত দোযখও সত্য। তাহারা বলে—মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আমাদের রাসূল হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিকট কোন আসমানী কিতাব ছিল না। তাহার চারিখানি হাত ও দশটি মাথা ছিল। একটি মাথা মানুষের ন্যায়। অন্যগুলি গরু মহিষ হাতী শূকর ইত্যাদির মাথার ন্যায় ছিল।

সেই রাসূল তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিল অগ্নিপূজা কর। অগ্নির জন্য উৎসর্গ করা ব্যতীত কোন প্রকার জীবজন্তু যবেহ বা নিহত করা যাইবে না। মিথ্যা কথা এবং মদ্য পান করা নিষিদ্ধ, পৈতা পরিধান করা বৈধ। গাভী পূজা জায়েয। কোন ব্যক্তি যদি তাহাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে তবে তাহার মাথা, দাড়ি, মোচ, ভ্রূ ইত্যাদি মুণ্ডাইয়া গাভীকে সেজদা করাইয়া পুনরায় সেই ধর্মে দীক্ষিত করিবে।

ভারতীয় ব্রাহ্মণদের একটি শাখার অভিমত এই যে, আত্মাহুতি দিয়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কেহ যদি আত্মাহুতি দিতে ইচ্ছুক হয় তবে তাহার জন্য একটি গর্ত খুদিত করা হয় এবং সেই গর্তে আগুন ভরা থাকে। সেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়। ঢোল ডগর পিটাইয়া উক্ত ব্যক্তিকে সুগন্ধি লাগাইয়া সেই গর্তের নিকট উপস্থিত করা হয়। লোক তাহাকে বাহবা দিয়া বলে এখনই তুমি বৈকুণ্ঠের উচ্চ মার্গে পৌঁছিয়া যাইবে।

তারপর সে আগুনে লাফাইয়া পড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হয়। আর যদি সে ভয় পায় বা পালাইয়া যায় তবে অন্যান্য সকলে তাহার সাথে সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। বেচারা বাধ্য হইয়া আবার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়।

ইহুদীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

শয়তান ইহুদীদিগকে এইভাবে ধোকায় নিপতিত করিয়াছে যে, তাহারা স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। কিন্তু তাহারা এই কথা বুঝে না যে, যদি আল্লাহর সাথে বান্দার তুলনা হইত তবে বান্দার জন্য যাহা জায়েয আল্লাহর জন্যও উহা জায়েয হইত।

আবদুল্লাহ ইবনে হামেম হাম্বলী বলেন—ইহুদীদের ধারণা আল্লাহ নূরের এক ব্যক্তি। তিনি নূরের টুপি মাথায় দিয়া নূরের কুরসীতে উপবিষ্ট। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় তাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।

ইহুদীদের দাবী উযাইর আল্লাহর পুত্র। কিন্তু এই নাদানের দল বুঝে না যে, পুত্রের জন্য বাপ থাকিতে হইবে। অথচ উযাইর পানাহার করা ব্যতীত জীবিত ছিলেন না। ইহারা যদি নাদানই না হইত তবে আল্লাহর শানে এমন জঘন্য কথা বলিত না।

শয়তান ইহুদীদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছে যে, তোমরা বল যে শরীয়ত কখনও মানসূখ (বাতিল) হইতে পারে না। অথচ তাহারা ভালভাবেই জানে যে, হযরত আদম (আঃ)এর সময় সহোদরা বোন বিবাহ করা জায়েয ছিল অথচ হযরত মূসা (আঃ)এর শরীয়তে উহা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ইহুদীগণ শয়তানের শিক্ষামত বলিয়া থাকে যে, আল্লাহর নির্দেশই হেকমত। অতএব আল্লাহর হেকমত কখনও মানসূখ হইতে পারে না। অর্থাৎ তাহাদের কথা হইল হযরত মূসা (আঃ)এর শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে।

উহার উত্তর এই যে, কোন কোন সময় কোন কোন বিষয়ের পরিবর্তন করাও হেকমত। যেমন অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তোমার পুত্রকে কুরবানী কর। অতঃপর ইহা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাওরাত গ্রন্থে আমাদের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সব গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা ইচ্ছাকৃতভাবে উহার পরিবর্তন করিয়া লইয়াছে। তাওরাতে কঠোরভাবে নির্দেশ রহিয়াছে শেষ যামানায় পয়গাম্বরের উপর তোমরা ঈমান আনিবে। তাহারা পরকালের আযাবকে মানিয়া লইয়াছে অথচ শেষ নবীর কথায় ঈমান আনে নাই। অধিকন্তু তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ইহারা তাহাদের নবী হযরত মূসা (আঃ)কেও দোষারূপ করিয়া বলিয়াছে যে, মূসার মৃগীরোগ ছিল এবং তিনি হযরত হারুনকে নিহত করিয়াছেন। হযরত দাউদ (আঃ) সম্বন্ধে বলিয়াছে যে, উরিয়ার স্ত্রীর সাথে তাহার ভালবাসা ছিল।

হযরত আবু হোরায়রা বলেন, একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের শিক্ষালয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম কে? তাহারা বলিল—আবদুল্লাহ ইবনে সুরিয়া। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি যে মেহেরবানী করিয়াছেন, তাহাদিগকে যে মান্না সালওয়া দিয়াছেন এবং মেঘ দ্বারা যে ছায়া প্রদান করিয়াছেন উহার শপথ করিয়া বল দেখি আমি আল্লাহর রাসূল কি না?

আবদুল্লাহ বলিল—খোদার শপথ! আমি যেমন জানি আমার সম্প্রদায়ও তেমনি জানে যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনার গুণাবলী পরিস্কারভাবে তাওরাতে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাকে হিংসা করে।

নবীজি বলিলেন—তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিতেছ না? সে বলিল—আমি আমার স্বজাতির বিরোধিতা করিতে চাই না। তবে তাহারা অতি শীঘ্রই ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং তখন আমিও করিব।

সালমা ইবনে সালামা ইবনে ওয়াকাশ হইতে বর্ণনা করেন—ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনী আবদে আশহাল মহল্লার একজন ইহুদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল। সে একদিন আমাদের নিকট আসিল। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত পান নাই। সে বনী আশহাল গোত্রের মজলিসে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মজলিসের সকলের চেয়ে আমি কনিষ্ঠ ছিলাম এবং একখানি চাদর জড়াইয়া ঘরের বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলাম।

ইহুদী মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়া, কেয়ামত, মিযান, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির কথা বলিল। বনী আশাহাল ছিল প্রতিমাপূজক, মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার বিশ্বাসী ছিল না। তাহারা বলিল—হে ইহুদী! তোমার কি বিশ্বাস মৃত্যুর পর আবার আমাদিগকে জীবিত করিবে; হিসাব কিতাবের পর বেহেশত বা দোযখে নেওয়া হইবে।

ইহুদী বলিল—হাঁ। সত্যই জাহান্নাম ভয়ঙ্কর স্থান। তোমরা তোমাদের খুশীমত একটি অগ্নিকুণ্ডের ধারণা কর এবং উহাতে আগুন রাখিয়া খুব সাহস করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দাও। যে কোন জাহান্নামী জাহান্নামের আগুন হইতে এই আগুনে থাকা অধিক পছন্দ করিবে। তাহারা বলিল—তোমার কথার প্রমাণ কি?

ইহুদী মক্কা ও ইয়ামনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—এই দিক হইতে একজন নবীর আবির্ভাব হইবে।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—কখন?

ইহুদী আমাকে সর্বকনিষ্ঠ দেখিয়া বলিল—এই বালক যদি জীবিত থাকে তবে তাহাকে দেখিয়া যাইতে পারিবে।

সালামা বলেন—ইহার কিছুদিন পরই আল্লাহর রাসূলের আবির্ভাব হইল। আমরা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিলাম। সেই ইহুদী তখনও জীবিত ছিল। সে ঈমান না আনায় আমরা বলিলাম—ওহে বদবখত ! তুই না নবীজির আবির্ভাবের কথা বলি ছিলি।

সে বলিল—বলিয়া তো ছিলাম কিন্তু এ সেই পয়গম্বর নয়।

ইহুদীদের ন্যায় খৃষ্টানদেরও শয়তান ধোকা দিয়া বিভ্রান্তিকর পথে পরিচালিত করিতেছে। তাহারা তিন খোদায় বিশ্বাসী। তাহারা আরও বলে—হযরত ঈসা (আঃ)কে শূলে চড়ানো হইয়াছিল। তিনি নিজকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইনজীল গ্রন্থে আমাদের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করে নাই। আবার কেহ কেহ বলে—তিনি নবী সত্যই। তবে শুধু আরবের জন্য ছিলেন। কিন্তু তাহারা যখন স্বীকারই করিল যে, তিনি নবী ছিলেন ;তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নবী কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমি বিশ্ববাসীর জন্য নবী হইয়া আসিয়াছি। ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, রোম, পারস্য এবং অন্যান্য নরপতিদের নামে ফরমান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকে যে, আমাদের বুযুর্গদের জন্যই আমাদিগকে আযাব করা হইবে না। কারণ, আমাদের বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বহু নবী এবং বুযুর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের দাবীর উল্লেখ করিয়াই আল্লাহ্ তাআলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেন—

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ -

আমরা আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয়পাত্র। অর্থাৎ উযাইর এবং ঈসা আল্লাহর পুত্র, তাহাদের জন্যই আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

শয়তান তাহাদিগকে কেমন ধোকায় রাখিয়াছে। অথচ আমাদের হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কেও ইরশাদ করিয়াছিলেন—আল্লাহর আযাব হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। অর্থাৎ তোমার সৎ কার্যাবলীই তোমাকে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

আকায়েদ সম্পর্কে শয়তানের ধোকা

শয়তান দুইটি উপায়ে এই উম্মতকে আকায়েদ বা ধর্ম বিশ্বাসে ধোকা দিয়া থাকে।

প্রথম তাকলীদ বা বাপ–দাদার অনুকরণ করা দ্বিতীয় এমন বিষয়ের সন্ধান করা যাহার গভীরতা পাওয়া দুঃসাধ্য অথবা সন্ধানকারী উহার গভীরতায় পৌছার ক্ষমতা রাখে না। শয়তান দ্বিতীয় প্রকার লোককে নানা প্রকারে বিপর্যস্ত করিয়া তোলে।

প্রথম প্রকারের লোককে শয়তান বলিয়া থাকে—প্রমাণ বা দলীল কখনও কখন সন্দেহজনক হয় এবং উহার সঠিকতা গোপন থাকে। তাই অনুকরণ করাই সবচেয়ে নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য। এই অনুকরণের দরুনই বহু লোক পথভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইহুদী, খৃষ্টানগণ বাপ–দাদার এবং পাদ্রী পুরোহিতদের অনুকরণ করিয়াছে এবং ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াত যুগের লোকও ছিল এই অনুকরণপ্রিয়।

যে দলীল দ্বারা তাহারা অনুকরণের কথা বলিতেছে উহা দ্বারাই উহার দোষ প্রমাণ করা যায়। দলীল যখন সন্দেহজনক এবং উহার সঠিকতা যখন গোপনীয় তখন উহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় যেন গোমরাহীতে নিপতিত হইতে না হয়। যাহারা বাপ–দাদার অনুকরণকারী তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া বলেন—'কাফেরগণ বলে—না বরং আমরা আমাদের বাপ–দাদাকে এক পথে (নীতিতে) পাইয়াছি। অর্থাৎ এই অবস্থায়ও কি তোমরা গোমরাহীকে অনুকরণ করিবে।

অনুকরণকারী যেই বিষয়ে অনুকরণ করে উহাতে তাহার ভরসা থাকে না এবং উহা জ্ঞানের পরিপন্থী। কারণ, চিন্তা–ভাবনা করার জন্য জ্ঞানের সৃষ্টি এবং যাহাকে আল্লাহ আলো দান করিয়াছেন—সে যদি আলো ছাড়িয়া অন্ধকারে চলে তবে উহা তাহার জন্য দোষণীয়। কোন ব্যক্তি কোন কথা বলিলে তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি নয় বরং তাহার কথার প্রতি খেয়াল করিতে হয়।

হারেস ইবনে হুত হযরত আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনি কি এই ধারণাই পোষণ করেন যে, আমাদের ধারণা তালহা এবং যোবায়ের অন্যায় পথে ছিলেন?

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছিলেন—হারেস! আসল ব্যাপারটি

তোমার নিকট সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যের পরিচয় ব্যক্তি দ্বারা হয় না। বরং সত্যকে জান। তবেই সত্যের অনুসারীকে জানিতে পারিবে।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সাধারণ লোক তো দলীল জানে না। সুতরাং অনুকরণ না করিয়া উপায় কি?

উহার উত্তর এই যে, এতেকাদের দলীল তো প্রকাশ্য ; ইহা সাধারণ লোকও বুঝিতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন প্রকার মাসয়ালা নিত্য নতুনভাবে দেখা দেয়। সাধারণ লোকের পক্ষে উহা বুঝা কষ্টকর ; তাই এইসব মাসয়ালায় সাধারণের পক্ষে অনুকরণ করিতে হইবে। এবং ইহাতে বিজ্ঞ আলেমেরই অনুকরণ করিবে।

দ্বিতীয় পন্থাটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা, ইবলীস যেভাবে আহমকদিগকে আয়ত্বে আনিয়া অনুকরণের জালে আবদ্ধ করিয়াছে এবং পশুর ন্যায় যেইভাবে তাহাদিগকে অনুজ্ঞের পিছনে ঘুরাইয়া মারে সত্যই উহা দেখার মত। তাছাড়া যাহারা একটু জ্ঞানী ; তাহাদের উপরও অবস্থাভেদে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং কাহাকে কাহাকে বুঝাইয়াছে যে, শুধু অনুকরণে জমিয়া থাকা দোষণীয়। তাই ইসলামের আকায়েদে চিন্তা–ভাবনা করিতে হইবে। তারপর এক একজনকে এক এক উপায়ে গোমরাহ করিয়াছে।

কাহাকে এই বলিয়া ধোকা দিয়াছে যে, যাহেরী শরীয়তের উপর নির্ভর করা দুর্বলতা ; সুতরাং দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। পরিশেষে ইহারা ইসলাম বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে।

আবার কাহাকে এই বলিয়া ধোকা দিয়াছে যে বাপ–দাদার অনুকরণ করা অজ্ঞতা। বরং এলমে কালাম শিখ এবং উহা দ্বারা সত্যাসত্য নিরূপণ কর। এই এলমে কালাম (তর্ক শাস্ত্র) অধ্যয়নে তাহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। পরিশেষে অনেকে ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুলহেদ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন আলেমগণ যে এলমে কালামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন উহা তাহাদের দুর্বলতা ছিল না। বরং তাহারা গভীর জ্ঞানের দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে, উহাতে রোগী সুস্থ না হইয়া বরং আরও অসুস্থ হইয়া পড়ে। তাই তাহারা যেমন এলমে কালাম অধ্যয়ন হইতে বিরত রহিয়াছেন তেমনি অন্যকেও বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহাদিগকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে মহল্লা মহল্লায় ঘুরাইবে এবং উচ্চস্বরে বলিবে—যেই ব্যক্তি কুরআন হাদীস পরিত্যাগ করিয়া এলমে কালাম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে ইহাই তাহার শাস্তি।

আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন—এলমে কালাম ওয়ালা কখনও মুক্তি পাইবে না। এলমে কালাম জ্ঞাত ব্যক্তি মুলহেদ ও যিন্দীক।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, অনুকরণ করাও দোষণীয় এবং অনুসন্ধান করাও দোষণীয় এই অবস্থায় ইবলীসের তালবীস (ধোকা) হইতে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে?

এই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল এবং তাহার সাহাবাদের নির্দেশিত পথে চলিবে। কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনিবে, কুরআনকে গায়র মাখলুক অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

আমর ইবনে দীনার বলেন—আমি নয়জন সাহাবার সাথে সাক্ষাত করিয়াছি। তাহারা সকলেই বলিয়াছেন, যাহারা কুরআনকে মাখলুক (নিত্য) বলে তাহারা কাফের।

ইমাম মালেক বলিয়াছেন—যে কুরআনকে মাখলুক বলে তাহাকে তওবাহ করাইবে। যদি তওবাহ করে ভাল, না করিলে তাহাকে হত্যা করিবে।

ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলিয়াছেন—যখন তোমরা দেখিবে যে, প্রকাশ্যে জনসাধারণকে বাদ দিয়া নির্দিষ্টভাবে কয়েকজনে ধর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছে তখন মনে করিবে যে, গোমরাহীর বুনিয়াদ মজবুত করিতেছে।

খারেজী সম্প্রদায়

ইসলামের প্রথম খারেজীর নাম ছিল যুলখোওয়াইচিরা। এই কমবখতের অনুসারীরাই হযরত আলী (রাযিঃ)এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

ঘটনা এই যে, হযরত আলী (রাযিঃ) এবং হযরত মুআবিয়ার মধ্যে যখন সিফফিন যুদ্ধ দীর্ঘ দিন চলার পরও অবসান হইল না তখন আমীর

মুআবিয়ার পক্ষের লোক যুদ্ধক্ষেত্রে কুরআন দেখাইয়া হযরত আলীর সৈন্যগণকে বলিল—এই কুরআন তোমাদের ও আমাদের মধ্যস্থিত সমস্যার সমাধান করিবে। হযরত আলী ইহাতে প্রথমে রাযী না হইলেও সেনাবাহিনীর চাপে পড়িয়া রাযী হইলেন।

আমীর মুআবিয়ার পক্ষ হইতে আমর ইবনে আসকে সালিশ মান্য হইল। ইরাকবাসী হযরত আলীকে বলিল—আপনি আবু মূসা আশআরীকে সালিশ করুন।

হযরত আলী বলিলেন—আবূ মূসা সরল লোক, আমর ইবনে আসের সাথে চালাকিতে পারিবে না। তোমরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এই কাজের দায়িত্ব দাও।

ইরাকবাসী বলিল—ইবনে আব্বাস আপনার আত্মীয়, তাহাকে আপনার পক্ষের সালিশ মানা হইতে পারে না। হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাদের কথামত আবু মূসাকেই সালিশ মানিলেন।

এই সময় আরওয়া ইবনে আবিয়া বলিল—তোমরা আল্লাহর হুকুমে মানুষকে হাকিম করিতেছ? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ -

আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আর কাহারও হুকুম কার্যকরী হইতে পারে না।

আরওয়া তাহার বাহিনী লইয়া খারেজ (দল বহির্ভূত) হইয়া গেল।

অতঃপর হযরত আলী (রাযিঃ) সিফফিন হইতে কুফা ফিরিয়া আসেন। কিন্তু খারেজীগণ তাহার সাথে না [illegible]সিয়া বার হাজারের একটি দল হুকরা নামক স্থানে থাকিয়া যায় এবং বলিতে থা[illegible]—আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও প্রচার করিল—আমাদের সেনাপতি শীশ ইবনে রবী নামাযের ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে কাওয়া ইয়াশকারী।

ইহারা অত্যন্ত ইবাদত বন্দেগী করিত। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে হযরত আলীর চেয়ে বড় আলেম এবং বিজ্ঞজন মনে করিত। এই রোগেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—ছয় হাজার খারেজী সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তাহারা হযরত আলীর

বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে। হযরত আলী লোক মারফত এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন—তাহাদের কথা বাদ দাও। তাহারা আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা পর্যন্ত আমি তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠাইব না। তবে অতি শীঘ্রই তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করিবে।

আমি একদিন যোহরের সময় বলিলাম—আমীরুল মোমেনীন। আজ যোহরের নামায একটু বিলম্ব করিয়া পড়ুন। আমি খারেজীদের নিকট গিয়া একটু আলাপ আলোচনা করিয়া আসি। হযরত আলী বলিলেন—আমার ভয় হয় তাহারা তোমার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে। আমি বলিলাম—আমীরুল মোমেনীন! আমার মনে হয় না তাহারা এমন কিছু করিবে।

আমি ভাল পোশাক পরিধান করিয়া তাহাদের নিকট যাই। বেলা দ্বিপ্রহর। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইল তাহাদের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী কোন সম্প্রদায় আমি আর কখনও দেখি নাই। কপালে সেজদার দাগ, গায়ে ছেড়া জামা, উঁচু করিয়া পরা পায়জামা, রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করায় মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। আমি তাহাদিগকে সালাম করায় তাহারা বলিল—মারহাবা। হে ইবনে আব্বাস! এই সময় আপনার আগমন হেতু?

বলিলাম—আমি আনসার মুহাজির এবং আল্লাহর রাসূলের জামাতার নিকট হইতে আসিয়াছি। ইহাদের উপরই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহারা তোমাদের চেয়ে কুরআনের অর্থ ভাল বুঝেন।

আমার কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল—এই ব্যক্তিও কুরায়েশ। কুরায়েশ সম্প্রদায় ঝগড়া প্রিয়। ইহার সাথে তর্ক-বিতর্ক করিও না। আল্লাহ তাআলা ইহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন—ইহারা ঝগড়া প্রিয় সম্প্রদায়।

তাহাদের মধ্য হইতে দুই তিনজন বলিল—না। আমরা ইহার সাথে একটা বোঝাপড়া করিব।

আমি বলিলাম—তোমরা কেন আল্লাহর রাসূলের জামাতাকে দোষারূপ করিতেছ?

তাহারা বলিল—তিনটি কারণে—

প্রথম—আল্লাহর কার্যাবলীতে আলী কেন মানুষকে সালিশ করিলেন।

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন—আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আর কাহারও হুকুম কার্যকরী নয়।

দ্বিতীয়—আলী জঙ্গে জামালে জয়লাভ করার পর কেন পরাজিতদিগকে দাস-দাসীতে পরিণত করিলেন না। আর কেনই বা তাহাদের ধনসম্পদ মালে গনীমত স্বরূপ বিজিতদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন না। যদি তাহারা মোমেন ছিল তবে তো তাহাদের সাথে যুদ্ধ করাই আমাদের পক্ষে বৈধ ছিল না।

তৃতীয়—সালিশ পত্রে দস্তখত করার সময় আলী কেন আমীরুল মোমেনীন শব্দ বাদ দিলেন। যদি তিনি আমীরুল মোমেনীন নহেন তবে আমীরুল কাফেরূন। অর্থাৎ তিনি কাফেরদের সর্দার।

আমি বলিলাম—আমি যদি কুরআনের আলোতে তোমাদের কথার উত্তর দিতে পারি তবে তোমরা তওবাহ করিবে তো?

তাহারা বলিল—নিশ্চয়ই।

আমি বলিলাম—এহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। যদি কেহ এইরূপ অন্যায় করে যেমন কেহ যদি একটি খরগোশ শিকার করে এই অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ—যেখানে খরগোশ হত্যা করা হয় তথাকার ন্যায়পরায়ণ দুই ব্যক্তি উহার মূল্য ধার্য করিয়া দিবে। উক্ত নির্ধারিত মূল্য সদকা করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হইলে উভয় পক্ষের দুইজন লোক সালিশী করিবে। এখন বল লোকের ফয়সলাই ভাল, না মারামারি রক্তারক্তি করা ভাল। বল তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব হইয়াছে কিনা? তাহারা বলিল—নির্ভুল এবং সঠিক উত্তর হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ তোমাদের দাবী হযরত আলীর যুদ্ধ জয়ের পর কয়েদী এবং মালে গনীমত কেন গ্রহণ করিলেন না? তোমরা কি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে তোমাদের দাসীতে পরিণত করিতে চাও বা যুদ্ধবন্দী অন্যান্য দাসীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাহা করিতে চাও? তবে খোদার শপথ! তোমরা মুসলমান নও। আল্লাহ তাআলা বলেন—'নবী মহিষীগণ তোমাদের মা। যদি বল তোমাদের মা নয় তবে তোমরা কুরআনের বিরুদ্ধাচারী কাফের। বল আমার উত্তর ঠিক হইয়াছে কিনা।

সকলে এক বাক্যে বলিল—হাঁ, ঠিক হইয়াছে।

এখন তোমাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর শোন। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় লেখা হইয়াছিল—'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। কোরায়েশ কাফেরগণ ইহা দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল—রাসূলুল্লাহ শব্দ লেখা চলিবে না। আমরা যদি মুহাম্মদকে আল্লাহর রাসূলই মানিয়া লইলাম—তবে আর এত খড়কুটো পোড়ানো কেন?

সাথের সাহাবাগণ এই ধৃষ্টতায় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মিতহাস্যে নিজের হাতে রাসূলুল্লাহ শব্দটি কাটিয়া দিলেন। শব্দটি কাটিয়া দেওয়ার পর তিনি কি আল্লাহর রাসূল ছিলেন না? আলী তাহার নামের পূর্বে আমীরুল মোমেনীন শব্দ বাদ দেওয়ার কি অপরাধ হইল?

ইবনে আব্বাস বলেন—ইহার পর দুই হাজার লোক তওবাহ করিয়া খারেজীদের দল ত্যাগ করে। অবশিষ্ট সকলে নিজেদের গোমরাহীর জন্য হতাহত হইল।

ইহার পর সালিশদের রায় পক্ষপাতিত্বহীন না হওয়ায় হযরত আলী খারেজীদের নিকট পত্র লিখিলেন—আমি আমার পূর্ব মতে ঠিক আছি তোমরা আস।

তাহারা উত্তরে লিখিল—এখন আর আপনার কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নয় বরং আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য। আপনি যদি এখন বলেন—আমি কাফের হইয়া গিয়াছি এবং তারপর যদি তওবাহ করেন তবে আমরা আপনার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিব। আমরা আপনাকে অবগত করাইতেছি যে, আপনার ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য।

আবদুল্লাহ ইবনে খাব্বাব (রাযিঃ) রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় খারেজীগণ তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি তোমার পিতার নিকট হইতে কোন হাদীস শুনিয়াছ—যাহা তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ বলিলেন—হাঁ, শুনিয়াছি। আমার বাবা বলিয়াছেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—এমন ঝগড়া বিবাদ হইবে যে, যাহাতে উপবেশনকারী দণ্ডায়মানকারীন হইতে; দণ্ডায়মানকারী চলমান ব্যক্তি হইতে এবং চলমান ব্যক্তি দৌড়ধাপকারীর

চেয়ে ভাল হইবে। এমন অবস্থায় সম্মুখীন হইলে তোমার কর্তব্য মোমেন বান্দায় পরিণত হওয়া।

খারেজীগণ বলিল—এই হাদীস শুনিয়াছ?

তিনি বলিলেন—হাঁ।

ইহার পর তাহারা আবদুল্লাহকে নদীর তীরে দাড় করাইয়া হত্যা করিল। তাহার দেহের রক্ত জুতার তলার ন্যায় জমাট বাধিয়া নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। তাহারা আবদুল্লাহর গর্ভবতী স্ত্রীকেও হত্যা করিল।

অতঃপর তাহারা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া এক যিম্মীর বাগানে গিয়া বসিল। গাছ হইতে মাটিতে একটি ফল পড়িলে একজন উহা উঠাইয়া মুখে দিল। অন্য একজন বলিল—মূল্য না দিয়াই ফল খাইলে? সে তাড়াতাড়ি মুখ হইতে ফল ফেলিয়া দিল।

তারপর এক ব্যক্তি এক খৃষ্টানের একটি শূকর হত্যা করিলে অন্য একজন বলিল—তুমি অন্যায় করিয়াছ। তখন সেই ব্যক্তি শূকরের মালিককে তালাশ করিয়া তাহাকে টাকা-পয়সা দিয়া রাযী করিল।

হায় ধর্মের নামে কত বড় ভণ্ডামী।

তারপর হযরত আলী (রাযিঃ) তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—যে আবদুল্লাহকে হত্যা করিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট পাঠাও। আমি তাহার নিকট হইতে রক্তঋণ আদায় করিব। তাহারা বলিল—আমরা সকলেই তাহাকে হত্যা করিয়াছি। হযরত আলী তিনবার সংবাদ পাঠাইলেন—তাহারা তিনবারই এই উত্তর দিল। অতঃপর হযরত আলী তাহার বাহিনীর উদ্দেশ্যে বলিলেন—এইবার তোমরা অস্ত্র ধারণ করিতে পার। কিছুক্ষণের মধ্যেই খারেজীগণ নিহত হইল।

ইহার পর আবদুর রহমান ইবনে মালজাম অবশিষ্ট খারেজীদিগকে বলিল—আমাদের নেকবখত ভাইগণ যেই পথে জান্নাতের অধিকারী হইয়াছে—আমরাও তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিব। কিন্তু আলী মুআবিয়া এবং আমর ইবনে আসকে এই পৃথিবীর আলো বাতাস হইতে অবশ্য সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে মালজাম হযরত আলীকে, বকর ইবনে আবদুল্লাহ আমীর মুআবিয়াকে এবং আমর ইবনে বকর তামীমী

আমর ইবনে আসকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করিল।

একদিন হযরত আলী (রাযিঃ) ফজরের নামায পড়াইবার জন্য মসজিদে প্রবেশকালীন নরাধম ইবনে মালজাম তরবারী দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। মাথায় আঘাত লাগিল। তিনি বলিলেন—অপরাধী যেন পলায়ন করিতে না পারে। সে ধরা পড়িল।

হযরত আলী (রাযিঃ)এর কন্যা উম্মে কুলসুম বলিলেন—হে খোদ 1 শত্রু! তুই আমীরুল মোমিনীনকে আঘাত করিলি।

ইবনে মালজাম বলিল—আমীরুল মোমেনীনকে নয় বরং তোমার বাবাকে আঘাত করিয়াছি।

উম্মে মালজাম বলিল—আমি আশা করি আমীরুল মোমেনীনের তেমন কোন ক্ষতি হইবে না।

পাপিষ্ঠ বলিল—এক মাস যাবত আমি তরবারীতে বিষ মাখাইয়াছি। ইহাতেও যদি কাজ না হয় তবে আমরা দুর্ভাগ্য।

হযরত আলী (রাযিঃ) শহীদ হওয়ার পর ইবনে মালজামকেও হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা হইল।

অতঃপর হযরত হাসান যখন আমীর মুআবিয়ার সাথে সন্ধি করেন তখন জারাহ ইবনে সেনান নামক একজন খারেজী তাহার উরুদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়া বলিয়াছিল—তুমিও তোমার পিতার ন্যায় শেরক করিলে?

মোটকথা, এই খারেজী সম্প্রদায় মুসলিম শাসকদের সাথে এমনিভাবে শত্রুতা করিতে থাকে। ইহারা বিভিন্ন মতের অনুসারী। নাফে ইবনে আরযাখের সম্প্রদায় বলে—যতদিন আমরা শিরকের দেশে আছি ততক্ষণ আমরা মুশরিক। সেখান হইতে চলিয়া গেলেই মোমেন। আমাদের বিরোধিতাকারী মুশরিক। আমাদের সাথে যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করিবে না সে কাফের। কবীরা গুনাহকারী মুশরিক। বালক-বালিকা এবং রমণীদিগকে হত্যা করা জায়েয।

এই দলেরই নাজদা ইবনে আমের সাকাফী উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করিয়া বলে—মুসলমানদের জানমাল গ্রহণ করা হারাম। তাহাদের মতাবলম্বী কেহ পাপের কাজ করিলে জাহান্নামের আগুন

ব্যতীত অন্য আগুন দিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। তাহাদের মযহাবের বিরোধিতাকারীই জাহান্নামে যাইবে।

কোন কোন খারেজীর বিশ্বাস—ইয়াতীমের সম্পত্তির দুইটি পয়সা খাইলেও জাহান্নামের আগুনে জ্বলিতে হইবে। কারণ, আল্লাহ তাআলাই এরূপ শাস্তির ঘোষণা করিয়াছেন। ইয়াতীমকে হত্যা করিলে বা তাহার হাত পা কাটিয়া ফেলিলে দোযখে যাইবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে যাহাদের নামাযের সামনে তোমাদের নামাযকে তোমরা অতি হীন মনে করিবে, তাহাদের রোযার সামনে তোমাদের রোযাকে হীন মনে করিবে, তাহাদের ইবাদত-বন্দেগীর সামনে তোমাদের ইবাদত-বন্দেগীকে তোমরা অতি হীন মনে করিবে। তাহারা কুরআন পাঠ করিবে অথচ উহা তাহাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামিবে না। তাহারা ধর্ম হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমনভাবে ধনুক হইতে তীর বাহির হইয়া যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—খারেজী সম্প্রদায় জাহান্নামের কুকুর।

রাফেযীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

ইবলীস যেমন খারেজীদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া হযরত আলীর বিরোধিতা করাইয়াছে, তেমনি অন্য আর একটি সম্প্রদায়কে হযরত আলীর অতি ভক্তে পরিণত করিয়াও পথভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহারা রাফেযী নামে পরিচিত।

ইহাদের মধ্যে কেহ ভক্তির আতিশয্যে হযরত আলীকে আল্লাহ বলে। কেহ আম্বিয়াদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে। আবার কেহ কেহ তাহাকে ভক্তি দেখাইতে গিয়া হযরত আবু বকর এবং ওমর (রাযিঃ)কে গালি দেয় ; আবার কেহ বুযুর্গ সাহাবাদ্বয়কে কাফের বলে। (নাউযুবিল্লাহ)

ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ নখয়ী বলিত—আলীই আল্লাহ! মাদায়েনের কিছু লোক তাহার অনুসারী। ইসহাক বলিত—তিনিই এক এক সময় এক

এক রূপে প্রকাশ লাভ করেন। একবার হাসানের আকৃতিতে অন্যবার হোসায়েনের আকৃতিতে যাহির হইয়াছিলেন। আলীই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পয়গাম্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন।

কোন কোন রাফেযী বলে—হযরত আবু বকর এবং ওমর কাফের ছিল। আবার কেহ বলে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন রাফেযী হযরত আলী (রাযিঃ) ব্যতীত আর সকল সাহাবাদের প্রতিই অসন্তুষ্ট ছিল।

শিয়া সম্প্রদায় হযরত যায়েদ ইবনে আলী (রাযিঃ)কে বলিল—যাহারা হযরত আলীর ইমামতীর বিরোধিতা করিয়াছিল আপনি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করুন। অন্যথায় আমরা আপনাকে রফয অর্থাৎ পরিত্যাগ করিব। তিনি অস্বীকার করায় তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাফেযীতে পরিণত হইয়াছিল।

রাফেযীদের একটি শাখার নাম জানাহিয়া। আবদুল্লাহ ইবনে মুআবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে যুল জানাহাইনের নামানুসারে তাহারা নিজেদের নাম রাখিয়াছে। তাহারা বলে আল্লাহর রূহ বা আত্মা নবীদের পিঠে পিঠে উক্ত আবদুল্লাহ পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। এই আবদুল্লাহ মরে নাই বরং মেহদীর আগমন অপেক্ষায় আছে। ইহাদেরই একটি শাখা আরাবিয়া যাহারা নবুওয়তের অংশের দাবী করে।

অন্য একটি শাখার নাম মুকাওওয়াজা। ইহারা বলে আল্লাহ তাআলা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করিয়া অন্যান্য যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করা তাহার দায়িত্বে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অন্য আর একটি শাখার নাম যিম্মিয়া। তাহারা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে দোষারোপ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহার প্রতি নির্দেশ ছিল হযরত আলীকে অহী দেওয়া। তাহা না করিয়া তিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অহী অবতীর্ণ করেন। ইহাদেরই অন্য আর একটি শাখা হযরত আবু বকর (রাযিঃ)কে দোষারোপ করিয়া বলে যে, তিনি হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে তাহার পিতার সম্পত্তি দান করেন নাই।

বর্ণিত আছে, একদিন আব্বাসী সম্রাট স্যাফফাহ বক্তৃতা দিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি যে তাহাকে আলী বংশের লোক বলিয়া দাবী করিত—বলিল—হে আমীরুল মোমেনীন! যেই বিষয় লইয়া আমার উপর যুলম করা হইয়াছে উহা আমাকে ফিরাইয়া দিন। সাফফাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—কে তোমার উপর যুলম করিয়াছে?

সে বলিল—আমি আলী পরিবারের লোক। খলীফা আবু বকর হযরত ফাতেমাকে ফদকের সম্পত্তি দেন নাই।

—তারপর কে খলীফা হইয়াছেন?

—ওমর (রাযিঃ)।

—তিনিও কি তোমার প্রতি যুলম করিয়াছেন?

—জ্বি হাঁ।

—তারপর কে খলীফা হইয়াছেন?

—ওসমান।

—তিনিও বুঝি যুলম করিয়াছেন?

—জ্বি হাঁ।

—তারপর কে খলীফা হইলেন?

কিন্তু এইবার উক্ত ব্যক্তির টনক নড়িয়া উঠিল। সে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল কিভাবে এইখান হইতে যাওয়া যায়।

সাফফাহ বলিলেন—আমি যদি বক্তৃতারত অবস্থায় না থাকিতাম তবে তোমার মস্তকাচ্ছেদ করিয়াই ক্ষান্ত হইতাম।

ইবনে আকীল বলেন—যে ব্যক্তি রাফেযী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক তাহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের ক্ষতি করা এবং নবুয়তের দোষারূপ করিয়া উহাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। কারণ, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য আনিয়াছিলেন—উহা আমাদের পক্ষে ছিল অদৃশ্য। এমনকি আমরা তাহার পবিত্র মুখ হইতেও কিছু শুনি নাই। বরং আমরা উহা সাহাবা কেরাম, তাবে এবং তাবেঈনের নিকট হইতেই পাইয়াছি। আর তাহারা স্বচক্ষে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত বুযুর্গদের প্রতিও আমাদের পূর্ণ ভরসা আছে। রাফেযীর প্রবর্তক আমাদের মনে এই সন্দেহের উদ্রেক করিতে চায় যে, যাহাদের প্রতি তোমাদের ভরসা (যেমন হযরত আবু বকর, ওমর,

ওসমান) তাহারাই তো নবীবরের মৃত্যুর পর তাহার বংশধরের সাথে শত্রুতা করিয়াছে; তাঁহার মেয়েকে তাঁহার সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই।

তাই প্রমাণিত হয় যে, যাহার জীবিত অবস্থায় তাহার নবুয়তের উপর বিশ্বাস ছিল তিনি তাহাদের দৃষ্টিতে আস্থাবান ব্যক্তি ছিলেন না। কারণ যাহার উপর প্রকৃত আস্থা থাকে, বিশেষ করিয়া আম্বিয়াদের প্রতি তো ওয়াজিব এই যে—উহাদের মৃত্যুর পর তাহার আইন কানুন—যথাযথ প্রতিপালন করা। বিশেষতঃ তাহার পরিবার পরিজনকে অবশ্য সম্মান করিতে হইবে। কই তাহা তো তাহারা করে নাই? সুতরাং এই সমস্ত সাহাবাদের বর্ণনা কোন মতেই পালনযোগ্য নয়। আল্লাহ ইহাদের ধোকা হইতে ইসলামকে রক্ষা করুন।

এই রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আলীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে গিয়া এমন সব অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছে যে, উহা ইসলাম ও জ্ঞানবিরোধী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

যেমন তাহারা বলিয়া থাকে—একদিন হযরত আলীর আসরের নামায কাযা হওয়ার উপক্রম হইলে আবার সূর্য উদিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা বর্ণনার দিক হইতেও দুর্বল; কেননা ইহা কোন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনা নয়। দ্বিতীয়ত প্রথম সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার পর সেদিনকার আসরের নামাযও শেষ হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় সূর্য উদিত হওয়ার পর নতুন আসরের সময় হইয়াছিল।

তাহারা আরও বলিয়া থাকে মৃত্যুর পূর্বে হযরত ফাতেমা যোহরা (রাযিঃ) নিজে গোসল করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে—আমার মৃত্যুর পর আর আমাকে গোসল দিও না! আমি যে গোসল করিয়াছি উহাই যথেষ্ট।

বর্ণনার দিক হইতে একেবারেই মিথ্যা। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর গোসল দেওয়া ফরয। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে গোসল করিলে সেই গোসল কিভাবে যথার্থ হইতে পারে।

তাহাদের মাসয়ালা মাসায়েলও ইসলাম বিরোধী। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে—মাটি এবং গাছগাছড়া জাতীয় ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উপর সেজদা করা, ভেড়া বা উটের চামড়ার উপর সেজদা করা জায়েয নয়। মলত্যাগের পরই ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা জায়েয, প্রস্রাবের পর নয়। স্বামী বর্তমান থাকিতে যদি কেহ সেই রমণীর সাথে ব্যভিচার করে

তবে উক্ত রমণী চিরদিনের জন্য সেই জিনাকারীর জন্য হারাম হইয়া যায়। এমনকি স্বামী তালাক দিলেও সে বিবাহ করিতে পারিবে না।

কোন ব্যক্তি যদি এশার নামায আদায় না করিয়া মধ্য রাত পর্যন্ত ঘুমায় তবে জাগিয়া কাযা আদায় করিবে এবং কিছু না খাইয়া ঘুমাইয়া থাকিবে এবং সকাল বেলা উঠিয়া ইফতার করিবে। তাহা হইলে এই সময়টুকুর রোযা কাফফারা স্বরূপ হইবে।

চোরের হাতের আঙ্গুল কাটিয়া দিবে পাঞ্জা কাটিবে না। দ্বিতীয় বার চুরি করিলে বাম পা কাটিয়া দিবে। তৃতীয়বার চুরি করিলে আমরণ বন্দী করিয়া রাখিবে। তাহাদের মতে আহলে কিতাবের যবহে খাওয়া হারাম ; কেবলামুখী হইয়া যবহে করা শর্ত।

শয়তান এইভাবে তাহাদিগকে চারিদিক হইতে প্রবঞ্চনা করতঃ ধর্ম ভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা সীমাহীন অন্যায়কারী।

তাহারা নামাযের পুণ্য হইতে বঞ্চিত। কারণ, তাহারা অযুর সময় পা ধৌত করে না। জামাআতের পুণ্য হইতে বঞ্চিত। কারণ, ইমামতী করার জন্য নিষ্পাপ ব্যক্তি পাওয়া যায় না তাই তাহারা কাহারও পিছনে একতেদা করে না। সর্বদা সাহাবা কেরামদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে।

মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা আমার সাহাবাদিগকে মন্দ বলিও না। কেননা, তোমাদের মধ্যে কেহ যদি অহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও দান কর তথাপি তাহাদের এক 'মুদ' বরং অর্ধ মুদ দান করার সমপরিমাণও হইবে না।

তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন—আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার জন্য আমার সাহাবাদিগকেও সম্মানিত করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার পরামর্শদাতা, সাহায্যকারী এবং শ্বশুর করিয়াছেন। অতএব যাহারা তাহাদিগকে মন্দ বলে তাহাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত লোকের লানত। পরকালে তাহাদের নফল ফরয কোন কিছুই আল্লাহ কবুল করিবেন না।

সোওয়াঈদ ইবনে গাফলা (রাযিঃ) বলেন—আমি কুফার কোন এক পথে যাওয়ার সময় শুনিলাম কিছুসংখ্যক লোক হযরত আবু বকর এবং ওমর (রাযিঃ) সম্বন্ধে বিরূপ আলাপ আলোচনা করিতেছে। আমি ইহা

হযরত আলী (রাযিঃ)এর নিকট বলিলাম—আমীরুল মোমেনীন! আপনার সেনাবাহিনীর কিছুলোক বুযুর্গ সাহাবাদের সম্পর্কে এমন সব কথা বলিতেছে যাহা তাহাদের বলা উচিত নয়। আমরা মনে হয় আপনিও তাহাদের সম্বন্ধে এখন ধারণা পোষণ করেন। তাহা না হইলে তাহারা এমন কথা বলার সাহস কোথায় পাইল?

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন—নাউযু বিল্লাহ! নাউযু বিল্লাহ!! তাহাদের প্রতি আমার মনে কোন প্রকার কুধারণা পোষণ করা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তাহাদের ভালবাসায় তো আমার অন্তর পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি ভাল ব্যতীত মন্দ ভাব পোষণ করে তাহাদের উপর আল্লাহর লানত। তাহারা রাসূলুল্লাহর সাহাবা, বন্ধু এবং পরামর্শদাতা ছিলেন।

তারপর তিনি অঝোর নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে মসজিদের মিম্বরে গিয়া বসিলেন এবং সাদা দাড়ি নাড়া চাড়া করিতে করিতে উহার দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। লোক আসিয়া সমবেত হইলে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রশংসা করিয়া বলিলেন—

কোন কোন লোকের এ কেমন ব্যবহার যে তাহারা কুরাইশ মুহাজিরদের নেতা আবু বকর এবং ওমর সম্বন্ধে এখন সব উক্তি করে যাহা আমার মতে খুবই অপছন্দনীয়। তাহাদের এই উক্তির জন্য আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব। খবরদার খোদার শপথ! আবু বকর এবং ওমরকে ঐ ব্যক্তিই ভালবাসিবে যে মুত্তাকী—খোদাভীরু আর যাহারা ফাসেক ফাজের তাহারাই উক্ত সাহাবাদ্বয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করিবে।

তাহারা পূর্ণ সততা এবং আনুগত্যের সাথে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের হক আদায় করিয়াছেন। তাহারা কখনও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ নিষেধের বিরোধিতা করেন নাই। তাহারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহারা ক্রোধ হইতেন শাস্তি দিতেন—কিন্তু নবীজীর রায়ের সীমালঙ্ঘন করিতেন না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদের রায়ের উপর অন্য কাহারও রায়কে স্থান দিতেন না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সকলের চেয়ে তাহাদিগকে বেশী স্নেহ করিতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিয়াই ইন্তিকাল করেন। তাহারাও সকল মুসলমানের সন্তুষ্টির উপর এই পৃথিবী ত্যাগ করেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া হযরত আবু বকরকে ইমামতী করার আদেশ দেন। নবীজীর জীবদ্দশায় আবু বকর নয় দিন নামাযে ইমামতী করেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের পর মোমেনগণ আবু বকরকে নিজেদের মুতাওয়াল্লী এবং আল্লাহর রাসূলের খলীফা নিযুক্ত করেন। বনী আবদুল মুত্তালিব পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে আবু বকরের আনুগত্য স্বীকার করে।

ইহা সত্ত্বেও আবু বকর খেলাফতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, তাহার ইচ্ছা ছিল আমাদের মধ্যে যেন কেহ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যাহারা জীবিত ছিলেন আবু বকর ছিলেন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের চেয়ে দয়ালু ছিলেন, সকলের চেয়ে নিষ্ঠাবান ও খোদাভীরু ছিলেন। করুণার দিক হইতে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হযরত মিকাঈলের সাথে তুলনা করিয়াছেন। পবিত্রতা এবং মর্যাদার দিক হইতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর সাথে তাহাকে তুলনা করিয়াছেন। তিনি সকল কাজে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন।

তারপর ওমর মোতাওয়াল্লী এবং খলীফা হইলেন। প্রথমে যাহারা তাহার খেলাফতে রাযী ছিলেন আমিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। উটনীর পিছনে যেমন তাহার সন্তান চলে তেমনি ওমর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ওমর মোমেন এবং দুর্বলদের প্রতি মেহেরবান, উৎপীড়িতের জন্য বন্ধু এবং অত্যাচারীর প্রতি কঠোর হস্ত ছিলেন। আল্লাহর কোন কাজে কাহাকেও তিনি ভয় পাইতেন না। আল্লাহ তাআলা সত্যকে তাহার জিহবায় স্থান দিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি কাজেই সততা প্রকাশ লাভ করিত। খোদার শপথ আমাদের ধারণা হইত আল্লাহ যেন তাহার কোন ফেরেশতার মারফত ওমরের জিহবা দ্বারা সব কিছু বলিতেছেন।

তাহার ইসলাম গ্রহণে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি

করিয়াছেন, তাহার হিজরতে ধর্মের স্তম্ভ এমনই মযবুত হইয়াছে, মদীনার মুশরিক সম্প্রদায় সদা সন্ত্রস্ত থাকিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিবরাঈলের সাথে তুলনা করিয়াছেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের শত্রুর উপর তিনি ছিলেন খড়গহস্ত। আল্লাহ তাআলা এই সাহাবাদ্বয়ের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদের অনুসরণ করার তওফীক আমাদিগকে দান করুন।

মনে রাখিও, যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহারা তাহাদিগকেও ভালবাসিবে। যাহারা তাহাদিগকে ভাল না বাসে তাহারা আমার শত্রু, আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি যদি প্রথমেই তোমাদিগকে এই বিষয় বলিয়া দিতাম তবে আজ যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করে আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিতাম। ইহার পর যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার খারাপ কথা বলিবে এবং তাহা যদি প্রমাণিত হয় তবে আমি তাহাদিগকে আশিটি করিয়া চাবুক মারিব। মনে রাখিও, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই উম্মতের মধ্যে আবু বকর এবং ওমরই ছিলেন শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। ইহার পর—কোথাকার পানি কোথায় গড়ায় আল্লাহই তাহা ভাল জানেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন—শেষ জামানায় একদল লোক আমার পক্ষীয় এবং বন্ধু বলিয়া দাবী করিবে, খারাপ কাজ করিবে এবং রাফেযী বলিয়া পরিচয় দিবে। উহারা কখনও আমার দলীয় নহে। তাহাদের পরিচয় হইল তাহারা আবু বকর এবং ওমরকে মন্দ বলিবে। তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে। কারণ, ইহারা মুশরিক।

বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি শয়তানের ধোকা

বাতেনিয়া এমন একটি সম্প্রদায় যাহারা ইসলামের পর্দায় থাকিয়া ইসলামেরই ক্ষতিসাধন করে। তাহারা অনেকটা রাফেযী ভাবাপন্ন। তাহারা বলে—সৃষ্টিকর্তা অনর্থক, নবুয়ত বাতেল, ইবাদত বন্দেগী অযথা, পরকাল বলিতে কিছু নাই, পুনরুত্থান হইবে না।

প্রথমতঃ তাহারা এই সব কথা প্রকাশ করে না। বরং বলে আল্লাহ সত্য, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, ইসলাম সত্য ধর্ম। অথচ গোপনে

গোপনে সবই অস্বীকার করে। শয়তান তাহাদিগকে নানাভাবে স্বীয় অনুচর করিয়া লইয়াছে। ইহারা আটটি নামে পরিচিত—

(১ম) বাতেনিয়া—বাতেনিয়া নামে এইজন্য পরিচিত হইয়াছে যে, তাহারা বলে কুরআন ও হাদীসের বাতেনী অর্থ আছে। উহাই আসল, প্রকাশ্য অর্থ আবরণ মাত্র। কুরআন তাহার প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা অজ্ঞদিগকে বশে রাখিয়াছে ; জ্ঞানবানরাই উহার বাতেনী অর্থ এবং রহস্য বুঝিতে সমর্থ। যাহার জ্ঞান ঐ পর্যন্ত পৌছিতে অক্ষম সেই শরীয়তের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। আর যে রহস্য বোঝে সে শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন করা হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছে।

তাহাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ্য হুকুম যখন কার্যকরী না থাকিবে তখন শরীয়তকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইবে।

(২য়) ইসমাঈলিয়া—তাহাদের মতে তাহারা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে জাফরের অনুসারী। তাহারা বলে ইসমাঈল পর্যন্তই ইমামতী শেষ হওয়া গিয়াছে। তিনি সপ্তম ব্যক্তি। আর সাতেই সবকিছু শেষ হইয়া থাকে। যেমন সাত আসমান, সপ্ত স্তর যমীন, সপ্তাহে সাত দিন। তাই ইমামতী সাতে আসিয়া শেষ হইবে।

তারীখে তাবারীতে লিখিত আছে, আলী ইবনে মুহাম্মদ তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন—রাবেন্দীয়া হইতে এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলে—যেই রুহ হযরত ঈসার সাথে সম্পর্কযুক্ত আপনিই সেই রুহ। তাহার দেহের সর্বত্র কুণ্ঠের দাগ ছিল বলিয়া তাহাকে আবলক বলা হইত। অতঃপর এই ব্যক্তি রাবেন্দীয়া ফিরিয়া গিয়া লোকদিগকে গোমরাহীর পথে আহ্বান করে। সে প্রচার করে যে, যে আত্মা হযরত ঈসার মধ্যে ছিল উহা হযরত আলীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। তারপর একের পর এক ইমাম আসিয়া ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ শেষ হয়।

ইহারা মোহরেম রমণীকেও হালাল মনে করে। ইহারা লোকদিগকে দাওয়াত করিয়া আনিয়া মদ্যপান করানোর পর নিজেদের স্ত্রীদের নিকট পাঠাইয়া দেয়। আসাদ ইবনে আবদুল্লাহ এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করতঃ শূলে চড়াইয়া রাখেন।

ইহারা আবু জাফর মানসুরের ইবাদত করে এবং উচু স্থানে উঠিয়া

পাখির ডানা ঝটপট করার ন্যায় হাত পা ঝটপট করিয়া নিচের দিকে লম্ফ দেয়। মাটি পর্যন্ত পৌছিতে না পৌছিতেই মারা যায়।

(৩য়) সাবঈয়া—ইহারা সাত ইমামের দাবীদার।

(৪র্থ) বাবেকিয়া—ইহারা বাবেক নামক এক অগ্নি উপাসকের অনুসারী। বাবেক ছিল অবৈধ বা জারজ সন্তান। আযার বাইজানের এক পাহাড়ী এলাকায় সে তাহার মতবাদ প্রকাশ করিতে থাকে। বহু লোক তাহার অনুসারী হওয়ায় সে অল্পদিনের মধ্যেই শক্তিশালী হইয়া উঠে। ফলে যত হারামকে সে হালাল বলিয়া প্রচার করিল।

কাহারও ঘরে সুন্দরী মেয়ের সংবাদ পাইলে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিত। না পাঠাইলে গৃহ স্বামীকে ধরিয়া আনিয়া হত্যা করিত এবং মেয়েটিকে নিজের ভোগের জন্য লইয়া আসিত। এইভাবে বিশ বৎসর পর্যন্ত সে পাহাড়ী এলাকায় ক্ষমতাশীল থাকে এবং দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার লোক হত্যা করে। শাহী সৈন্য তাহার নিকট পরাজয়বরণ করিয়া পালাইয়া যায়।

অবশেষে মুতাসিম সেনাপতি আফশীনকে এই যুদ্ধে পাঠান। আফশীন—বাবেক ও তাহার ভাইকে বন্দী করিয়া বাগদাদ রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ভাই বলিল—বাবেক! তুমি এমন কাজ করিয়াছ যাহা অন্য কেহ পারে নাই। আর এখন তুমি এমন ধৈর্যধারণ করিবে—যাহা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

বাবেক বলিল—তুমি তাহাই দেখিতে পাইবে।

মুতাসিম তাহার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। কাটা হাতের রক্ত বাবেক তাহার মুখমণ্ডলে লাগাইয়া দিল। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল—লোকে যেন না বলে মৃত্যু ভয়ে বাবেকের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর তাহার হাত পা কাটিয়া শিরচ্ছেদ করা হইল। তাহার ভাইকেও এরূপ শাস্তি দিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মুখেও উহ শব্দ পর্যন্ত ছিল না।

বাবেকিয়ার অবশিষ্ট লোক বৎসরে নির্দিষ্ট একরাতে উৎসব পালন করে। সেই রাতে স্ত্রী-পুরুষ একস্থানে সমবেত হইয়া আলো নিভাইয়া দেয়। তারপর এক একজন পুরুষ এক একজন রমণীকে দৌড়াইয়া গিয়া

ধরিয়া কুকর্ম করে। তাহারা বলে—ইহা আমাদের শিকার। শরীয়তমতে শিকার হালাল।

(৫ম) মুহাম্মিরা—বাবেকিয়া সম্প্রদায়েরই একটি শাখা। ইহারা লাল কাপড় পরিধান করিত।

(৬ষ্ঠ) কেরামাতাহ—এই নাম হওয়ার দুইটি কারণ বর্ণিত আছে। প্রথমতঃ খোরাসানের কোন এক ব্যক্তি কুফার শহরতলীতে গিয়া আবেদে পরিণত হইয়াছিল এবং আহলে বায়তের প্রতি লোকদিগকে আহবান করিতেছিল। তাহার নাম ছিল কারামিয়া। তথাকার সর্দার কারামিয়াকে গ্রেফতার করিয়া বন্দীশালায় তালা লাগাইয়া চাবি বালিশের নিচে রাখিয়া দেয়।

এক দাসী দয়াপরাবশ হইয়া মালিকের বালিশের নিচ হইতে চাবি লইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয় এবং পুনরায় তালাবদ্ধ করিয়া চাবি যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। পরদিন সকালে এই কথা প্রচার হইলে লোক তাহার প্রতি আরও অনুরক্ত হইয়া উঠে। কারামিয়া সিরিয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহার ভক্তের দলের সংখ্যা আবার বাড়িতে থাকে।

দ্বিতীয় বর্ণনা মতে হামদান কারমাত নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এই দলের নাম কেরামাতাহ হইয়াছে। হামদান প্রথমে বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের একজন প্রচারক ছিল। এই ব্যক্তি প্রথম জীবনে একজন কুফার নিরক্ষর দরবেশ ছিল। একদিন সে কুফা হইতে কোন এক গ্রামে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এক বাতেনীয়ার সাথে সাক্ষাত হয়। সেই বাতেনীয়াও উক্ত গ্রামে যাইতেছিল। আলাপ হওয়ার পর হামদান তাহাকে বলিল—তুমি আমার সাথের একটি গাভীর উপর উঠিয়া বস তাহা হইলে পথ চলার কষ্ট হইতে রেহাই পাইবে।

বাতেনীয়া বলিল—এ কাজ করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয় নাই।

হামাদান—তুমি বুঝি নির্দেশ পাওয়া ব্যতীত কোন কাজ কর না? কে তোমাকে আদেশ করে?

বাতেনীয়া—তোমার, আমার এবং ইহ-পরকালের মালিক আদেশ করেন।

হামাদান—তিনি তো আল্লাহ, রাব্বুল আলামীন।

বাতেনীয়া—তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

হামাদান—তুমি উক্ত গ্রামে কেন যাইতেছ?

বাতেনীয়া—উক্ত গ্রামবাসীকে হেদায়াত করার জন্য। পাপ হইতে পুণ্যের দিকে, অন্ধকার হইতে আলোর দিকে, অজ্ঞতা হইতে জ্ঞানের দিকে আহবান করার জন্য।

হামাদান—মেহেরবানী করিয়া আমাকেও তুমি উপদেশ দান কর।

বাতেনীয়া—কোন ব্যক্তির প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে গোপন রহস্য প্রকাশ করার নির্দেশ আমার প্রতি নাই।

হামাদান—বল! তোমার আস্থা অর্জন করিতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে? আমি সর্বান্তকরণে উহা পালন করিব।

বাতেনীয়া—তাহা হইলে আমার এবং বর্তমান যুগের ইমামের জন্য প্রতিজ্ঞা কর যে ইমামের যে রহস্য তোমার নিকট বলিব—উহা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

হামাদান প্রতিজ্ঞা করার পর ঐ ব্যক্তি তাহাকে কুপথে গমনের সবক দান করিল। কালক্রমে এই হামদান-ই দলের নেতা হইল এবং তাহার অনুসারীগণ কারমাতিয়া অথবা কারামাতাহ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে হামদানের বংশধর তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে থাকে।

ইহাদের মধ্যে প্রতাপশালী যুদ্ধবাজ আবু সাঈদ ২৮৬ হিজরীতে গদ্দিনশীন হয়। সে লাখ লাখ লোক হত্যা করে, হাজার হাজার মসজিদ ধ্বংস করে এবং অসংখ্য কুরআন মজিদ জ্বালাইয়া দেয়। বহুসংখ্যক হাজীর কাফেলা লুট করে। সে তাহার ভক্তদের জন্য নিত্য নতুন রীতিনীতির প্রবর্তন করিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সে বলিত, আমাকে জয়লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে।

তাহার সমাধি সৌধের উপর একটি পাখী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। উহারা বলিত, এই পাখী যেদিন উড়িবে সেদিন আবু সাঈদ জীবিত হইয়া বাহিরে আসিবে। কখন পাখী উড়িয়া যায় কখন সে জীবিত হইয়া বাহিরে আসিবে তজ্জন্য সমাধির পাশে সজ্জিত ঘোড়া এবং অস্ত্র-শস্ত্র রাখা হইয়াছে।

শয়তান তাহাদিগকে এই বলিয়া ধোকায় নিপতিত করিয়াছে যে—মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিবে। ঘোড়াটিকে খাইতে না দিয়া মারিয়া ফেলিবে। মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়ার সাথে সাথে

ঘোড়াটিও জীবিত হইবে। তখন উক্ত ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবে। অন্যথায় পায়ে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

উক্ত আবু সাঈদের নাম শুনিলে তাহার ভক্তেরা দরূদ পাঠ করে। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনার পর দরূদ পাঠ করে না! তাহারা বলে—আমরা আবু সাঈদের দেওয়া জীবিকা খাই, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ কেন পড়িব?

আবু সাঈদের পর তাহার পুত্র আবু তাহের পিতার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং পিতার উপযুক্ত পুত্রের পরিচয় দেয়। হঠাৎ একবার কাবাগৃহ আক্রমণ করিয়া হিজরে আসওয়াদ তাহার নিজস্ব শহরে লইয়া যায়। তাহার ভক্তদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেয় যে, সে-ই আল্লাহ।

(৭ম) খুররামিয়া—খুররম অনারব শব্দ। উহার অর্থ সুস্বাদু বস্তু, যাহার প্রতি মানুষের আকাঙ্খা সর্বদাই লালায়িত থাকে এবং যাহা লাভ করার পথে শরীয়তের কোন প্রকার বাধা বিপত্তি বা প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আসলে এই নীতি ছিল মাজুসী মাযদাকিয়া সম্প্রদায়ের। তাহারা যে কোন প্রকার অন্যায়কে ন্যায় মনে করিত। ইহারা সম্রাট কুববাদের সমসাময়িক লোক। এই সময় যে কোন রমণীকে যে কোন পুরুষ উপভোগ করিতে পারিত।

(৮ম) তালিমিয়া—ইহারা বলে জ্ঞানের কষ্টিপাথরে পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়কে যাচাই করা যায় না। বরং ইমাম যাহা বলে উহাই পালন করিতে হইবে। এই তালিম বা শিক্ষাই এই সম্প্রদায়ের কাজ।

এখন প্রশ্ন হইল—বাতেনিয়া সম্প্রদায় এই বেদআত কেন প্রবর্তন করিল?

উত্তর এই যে, এই সম্প্রদায় শরীয়ত বহির্ভূত হওয়ার জন্য মাজুসী মাযদাকিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ করিল যে, কিভাবে আমরা আমাদের কাজে সফল হ.তে পারি? কারণ, ইসলামের আলেমগণ এমন সব প্রমাণ দেন যে, যাহাতে আল্লাহ, রাসূল এবং হাশর-নশরকে অস্বীকার করা যায় না।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিল—মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় অনুসন্ধান কর যাহারা জ্ঞানের দিক হইতে দুর্ভাগা। কোন

প্রকার সনদ ব্যতীতই কোন কথাকে অতি শীঘ্র গ্রহণ করে। সন্ধানের পর রাফেযী সম্প্রদায় তাহাদের মনমত হইল। প্রকাশ্যে তাহারা রাফেযী মতবাদকে মানিয়া চলিত যেন পাইকারী হত্যার শিকার না হয়। তাহারা রাফেযীদের সাথে বন্ধুত্ব করিয়া অতি সাবধানে ও সতর্কতার সাথে নিজেদের মতবাদ প্রচার করিতে থাকে।

অতঃপর তাহারা এমন ব্যক্তিত্ব সন্ধান করিতে লাগিল যে নিজকে নবী পরিবারের লোক বলিয়া দাবী করে এবং রাফেযী মতবাদে বিশ্বাসী। ইহাও প্রচার করিতে থাকে যে সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য তাহার নির্দেশ পালন করা। কারণ, সে রাসূলুল্লাহর খলীফা, এবং যাবতীয় দোষাবলী হইতে মাসুম। অর্থাৎ কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহাও লক্ষ্য রাখিল যে, রাসূলুল্লাহর এই খলীফার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহার মতবাদ প্রচার করা হইবে না। কারণ, এই ইমামের আশে পাশে এই সব প্রচার করিলে জনসাধারণ ইমামের হাল হাকীকত জানার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। অন্ততপক্ষে দূরদেশে প্রচার করিলে কষ্ট করিয়া লোক ইমামের যথার্থতা অবগত হইতে আসিবে না বরং প্রচারকের কথায়ই বিশ্বাস করিবে।

জনসাধারণকে চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করার পূর্বে তাহাদের অবস্থা বিশেষ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে। যদি সে দেখে যে কোন ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত তখন তাহাকে সত্য কথা বলিতে ; আমানতের খেয়ানত না করিতে এবং পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত হইতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়। আর যদি দেখে কোন ব্যক্তি লোভ-লালসার প্রতি আসক্ত তখন বলে ইবাদত-বন্দেগী করা অযথা, নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নাই।

আবার কোন রাজ্যহারা ইরানী বা মাজুসীর সন্তান যাহাদের বাপ-দাদা ইসলামের নিকট রাজ্য হারাইয়াছে অথবা এমন ব্যক্তি যাহার ইচ্ছা কোন দুর্গ বা শহর অধিকার করা তাহাদিগকে পাইলে সৈন্য সামন্ত দিয়া সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়া বশে আনিত। অথবা কোন রাফেযীকে বশ করিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে মহান বুযুর্গ সাহাবাদিগকে গালাগালি করিত। কারণ, রাফেযীগণ সাহাব্যদিগকে গালি দেওয়া পুণ্যের কাজ মনে করিত।

বিগত ৪৯৪ হিজরীতে এই বাতেনিয়া সম্প্রদায় চরমে পৌছিলে

সুলতান বরকিয়া রক তাহাদের তিন শতের অধিক লোক হত্যা করেন এবং তাহাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এই সম্পদের মধ্যে কয়েকশত বাক্স মূল্যবান মোতিও ছিল। সুলতান নির্দেশ দিলেন—যাহাকে বাতেনিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সন্দেহ হইবে তাহাকেও বন্দী কর। ফলে বহু লোক বন্দী হইল। কেহ কাহারও সম্বন্ধে সুপারিশ করার সাহস পাইত না। কি জানি হয়ত সুপারিশ করিতে গেলেই সন্দেহবশত বন্দী হইতে পারে। কাহারও সাথে ব্যক্তিগত শত্রুতা থাকিলেও বাতেনিয়া বলিয়া ধরাইয়া দিত। এইভাবেও বহু লোক নিহত হইল এবং তাহাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হইল।

ইহার পর সুলতান শাহ জালালুদ্দাওলা এর সময় আবার তাহারা প্রকাশ্যভাবে দেখা দিল। সংবাদ পাওয়া গেল তাহারা সাওয়া নামক স্থানে সমবেতভাবে ঈদের নামায আদায় করিতেছে। শহর কোতয়াল সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিল এবং পরে মুক্তও করিয়া দেওয়া হইল।

তাহারা সাওয়ার মুয়াজ্জেনকে বাতেনিয়া মতাবলম্বী করার আপ্রাণ চেষ্টা করিল। তিনি অস্বীকার করায় তাহাদের ভয় হইল হয়ত মুয়াজ্জেন আমাদের কথা বলিয়া দিবে। এই ভয়েই তাহারা মুয়াজ্জেনকে হত্যা করিল। মন্ত্রী নিযামুল মুলক এই সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন। এই সময় তাহাদের দলের প্রধান মারা যায়। পরে তাহারা নিযামুল মুলককে ধোকা দিয়া হত্যা করে। এবং বলে যে, মন্ত্রীকে হত্যা করিয়া আমাদের প্রধানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম।

মালীক শাহর মৃত্যুর পর আবার ইহারা ইস্পাহানে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। লোকদিগকে গুপ্তহত্যা করিয়া মাঠে-ময়দানে ফেলিয়া রাখিত। অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, আসরের সময় পর্যন্ত কেহ বাড়ী না ফিরিলে তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিত এবং যে সমস্ত এলাকায় এই সব কাজ হইত সেখানে সন্ধান করিত।

একবার কোন এক ব্যক্তির সন্ধান করিতে করিতে লোক একটি বাড়ীর পাশে গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর নিকট একটি নির্দিষ্ট স্থানে এক বুড়ী সর্বদা একটি পাথরের উপর বসা থাকিত। বুড়ীকে সরাইয়া পাথরখানি উঠাইয়া দেখা গেল সেখানে চল্লিশটি লাশ পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রোধান্বিত জনতা বুড়ীকে হত্যা করিয়া সেই মহল্লা জ্বালাইয়া দিল।

অন্য এক মহল্লার প্রবেশ পথে এক অন্ধ বসিয়া ভিক্ষা করিত। কোন মুসলমান তাহার নিকট গেলে সে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিত—বাবা! দয়া করিয়া আমার হাত ধরিয়া এই গলির মধ্যে একটু আগাইয়া দিয়া আস।

উক্ত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ অন্ধকে লইয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিতেই অন্যান্য সকলে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিত।

পরিশেষে অনেক অনুসন্ধান করার পর মুসলমানগণ তাহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে এবং ইস্পাহানে এক হত্যাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। ওয়াইলামের সীমান্ত এলাকায় রুদবারের একটি দূর্গ বাতেনিয়াদের প্রথম দুর্গ ছিল। কামাজ নামক মালিক শাহর এক পারিষদের সম্পত্তি ছিল এই দূর্গটি। ৪৮২ হিজরীতে বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের নেতা হাসান ইবনে সাবাহ এক হাজার দুইশত আশরাফী দ্বারা দূর্গটি ক্রয় করে।

হাসান ইবনে সাবাহ মারদের অধিবাসী। প্রথমে সে রঈস আবদুর রাজ্জাক ইবনে বাহরামের মুনশী বা কেরানী ছিল। অতঃপর সে মিশর চলিয়া যায়। সেখান হইতে ইসমাঈলিয়া মতবাদে দীক্ষা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং উক্ত রুদবারের দূর্গ করায়ত্ব করে।

তাহার নিয়ম ছিল দুনিয়ার প্রতি বেকার অজ্ঞ লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বাদাম, মধু এবং কালুনজী নামক এক প্রকার মাদক জাতীয় ফল খাওয়াইয়া মাথা গরম করিয়া ফেলিত। তার পর তাহাকে বলিত—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরের প্রতি এমন অন্যায় এবং অত্যাচার করা হইয়াছে। প্রত্যহ এই সব কথা বলিয়া এই বিষয়ে তাহাকে আস্থাবান করিয়া তুলিত। তার পর বলিত—আযারকাহ এবং খারেজীগণ বনী উম্মিয়াদের যুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, আর তোমার কি হইল যে, তুমি নবী পরিবারের জন্য, সত্যের জন্য জীবন দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছ? কেন তুমি তোমার ইমামের কাজে সহায়তা করিতেছ না? এইভাবে নিরীহ লোকদিগকে চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করিয়া ফেলিত।

মালিক শাহ সালজুকী এই বলিয়া হাসান ইবনে সাবাহর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন যে—তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার কর; তোমার কাজের পরিণতি সম্বন্ধে খেয়াল রাখ এবং অযথা আলেম ওলামাদিগকে হত্যা

করা হইতে তোমার লোকদিগকে নিবৃত রাখ।

দূত হাসান ইবনে সাবাহকে এই সংবাদ পৌছাইলে সে বলিল—চল! তোমার বাদশাহর সংবাদের উত্তর স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবে। তাহার সম্মুখে যে সমস্ত লোক ছিল—তাহাদের উদ্দেশ্যে হাসান বলিল—আমি তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট পাঠাইয়া দিতে চাই। বল কে এই জন্য প্রস্তুত আছ? ইমামের কথায় সকলেই তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল। দূত মনে করিলেন—হয়ত ইহাদের দ্বারা রাজ দরবারে সংবাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

হাসান একজনকে বলিল—তুমি আত্মহত্যা কর। সাথে সাথে এক যুবক একখানি ছোরা বুকে বিদ্ধ করিয়া দিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। অন্য একজনকে বলিল—তুমি দূর্গ চূড়া হইতে লাফাইয়া পড়। আদেশের সাথে সাথে সে দূর্গ চূড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবন দান করিল।

অতঃপর দূতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—এমন বিশ হাজার লোক ইঙ্গিত মাত্র আমার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত। আর ইহাই হইল পয়গামের উত্তর।

দূত ফিরিয়া আসিয়া সুলতানকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। সুলতান ইহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহাদিগকে আর ঘাটাইলেন না। আস্তে আস্তে বহু দূর্গ বাতেনিয়াদের হস্তগত হইল এবং বহু আমীর উমারা, উযির নাযীর তাহাদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিল।

ইসলাম বিরোধী বহু যিন্দিক আসিয়া এই দলে ভিড় করিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বহু লোককে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত করিল। এই যিন্দিকদের মধ্যে বাবেক জারমীও একজন ছিল। সে তাহার লোভ লালসা চরিতার্থ করিল এবং বহু লোককে হত্যা করিল।

আবুল কাসেম আলী ইবনে হাসান তানুখী তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন—ইবনে রাবেন্দী প্রথমে রাফেযী এবং মুলহেদদের কর্মচারী ছিল। লোকে তাহার কাজের নিন্দা করিলে সে বলিত—আমার উদ্দেশ্য তাহাদের মতামত গভীরভাবে অবগত হওয়া। তারপর সে খোলাখুলিভাবে তর্ক করিত।

গভীরভাবে ইবনে রাবেন্দী সম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সে ভয়ানক মুলহেদ ছিল। সে একখানি গ্রন্থ লিখিতে গিয়া

বলিয়াছিল—আমার ইচ্ছা ইসলামকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। আল্লাহর শোকর যে—সে যৌবনেই বন্দী হইয়াছিল। আর এই শয়তানই বলিয়াছিল—কুরআনের ভাষা শুদ্ধ নয়। অথচ আরবের বড় বড় কবি সাহিত্যিকগণ কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতার এবং ছন্দের মাধুর্যে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কোথায় এই অনারব রাবেন্দী ; যে শুদ্ধ করিয়া কথা বলিতে পারিত না।

ঐ সময় আলেম ও অধিকাংশ জনসাধারণ ব্যতীত রাজা বাদশাহ এবং নেতৃস্থানীয়গণ শরাবের নেশায় বুদ হইয়া থাকিত এবং যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। তখন সিরিয়ার খৃষ্টানগণও প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

এই সময় আল্লাহ তাআলা দুর্ধর্ষ তাতারিদিগকে বাতেনিয়াদের উপর চাপাইয়া দিলেন। হালাকু খান রুদবার এবং অন্যান্য দুর্গ ও বাতেনিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সকলকে ধ্বংস করিয়া পরিশেষে আব্বাসী খেলাফতের নাম নিশানকেও মিটাইয়া দিল। ইহার এক শতাব্দী পর তাতারিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

আলেমদের প্রতি শয়তানের ধোকা

শয়তান নানাভাবে আলেমদিগকেও ধোকা দিয়া থাকে। কিন্তু যে সমস্ত আলেম রিপুর বশীভূত, শয়তান তাহাদের উপর অতিসত্বর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। আলেম হওয়া সত্ত্বেও তখন সে প্রতি পদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার শয়তান এমন কতগুলি উপায়ে ধোকা দেয় যাহা তাহাদের নিকট গোপনই থাকিয়া যায়। এখানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা শুধু কতগুলি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া যাইব মাত্র।

কারীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

কোন কোন কারী কেরাত শিক্ষার ব্যাপারে এতটা বাড়াবাড়ি করে যে, 'শায' (বিরল) কেরাতও শিক্ষা করে। এই কেরাত শিক্ষা করিতে গিয়া জীবনের দিনগুলি এমনভাবে নষ্ট করে যে ফরয, ওয়াজিব চিনিবার সময় পর্যন্ত পায় না। তাই দেখা যায়, কোন এক ব্যক্তি মসজিদের ইমাম। বহু

দূর দূরান্ত হইতে কেরাত শিক্ষার জন্য লোক তাহার নিকট আগমন করে। কিন্তু কি কি কাজে নামায নষ্ট হইয়া যায়---এ সম্বন্ধেও সে অবগত থাকে না। যখন সে লোক সমাজে পরিচিত হইয়া যায় তখন তাহার মাথা গরম হইয়া যায় এবং আলেমের ন্যায় ফতওয়া দান করে। যদিও মযহাব অর্থাৎ ধর্ম মতে ফতওয়া দেওয়ার কোন অধিকার তাহার নাই। অজ্ঞতার দরুন সে বুঝিতে পারে না সে কাহার কর্তব্য কাজ নিজে করিতেছে।

যদি তাহারা একটু চিন্তা করিত তবে বুঝিতে পারিত যে, কেরাতের উদ্দেশ্য—কুরআন শরীফ মাখরাজ আদায় করিয়া তেলওয়াত করা এবং তদানুযায়ী আমল করা এবং কুরআনের আদেশ মত আত্মসংশোধন হওয়া এবং সচ্চরিত্র অর্জন করা। অতঃপর শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা করা।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন--কুরআনের উপর আমল করার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু লোকে এখন উহাকে তেলওয়াত সর্বস্ব করিয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তেলাওয়াতই করে আমল করে না।

আর একটি অন্যায় এই যে, প্রসিদ্ধ কেরাত পরিত্যাগ করতঃ নামাযে 'শায' কেরাত পাঠ করেন। অথচ আলেমদের মতে 'শায' কেরাতে নামায ছহীহ হয় না। কারীর উদ্দেশ্য এই থাকে যে, সে এমন কেরাত পাঠ করিবে যাহা শুনিয়া লোক তাহার প্রশংসা করিবে এবং তাহার অনুরক্ত হইবে।

খতমের রাত্রে কারীগণ বহু আলোর ব্যবস্থা করে। ইহাতে বহু পয়সা খরচ হয় এবং মাজুসীদের অনুকরণ ব্যতীতও পুরুষ ও রমণীদের ভীড় জমাইয়া বিপদের সূত্রপাত করে।

আমি বহু হাফেযকে দেখিয়াছি তাহারা কুরআন খতম করার জন্য বহু লোক সমবেত করেন। একজন মেধাবী ছাত্র দ্বারা দিনে তিন খতম দেওয়ায়। যদি তিন খতম দিতে পারে তবে লোকে তাহার প্রশংসা করে। আর যদি না পারে তবে লোক তাহাকে নিন্দা করে। শয়তান তাহাদিগকে ধোকা দেয় যে যত বেশী খতম দেওয়া যায় ততই সওয়াব বেশী হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাহার রাসূলকে নির্দেশ দিয়াছেন—'হে মুহাম্মদ! আপনি লোকের নিকট কুরআন ধীরে ধীরে পাঠ করুন।'

আরও ইরশাদ করিয়াছেন—'তারতীবের সাথে কুরআন তেলওয়াত করুন।'

আবার কোন কোন কারী রাগ-রাগিনীর সুর দিয়া কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। এইভাবে কুরআন পাঠ করা মাকরুহ।

কোন কোন হাফেয পাপের কাজ যেমন গীবত করা অন্যের প্রতি ভ্রূকুটি করিতে দ্বিধাবোধ করে না। কারণ তাহাদের ধারণা—কোরআনের হাফেযের নিকট কোন পাপ ঘেঁষিতে পারে না। ইহা শয়তানের ধোকা। কারণ, জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা যেমন বেশী পাপ করিলে শাস্তিও তেমন বেশী হইবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—'যে ব্যক্তি অবগত আছে যে—যাহা আপনার উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—উহা সত্য—সে কি অন্ধ।'

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম। অস্বীকার করিলে কঠিন শাস্তি পাইবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহীয়ষীদের সম্বন্ধে ইরশাদ করিয়াছেন—'তোমাদের মধ্যে যে কেহ পাপ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে।'

মারুফ কারখী বলেন—বিকির ইবনে হুবাইশ বলেন—জাহান্নামে একটি ময়দান আছে ; দোযখ প্রত্যহ সাতবার সেই ময়দান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই ময়দানে একটি গর্ত আছে। জাহান্নাম এবং ময়দান সেই গর্ত হইতে প্রত্যহ সাতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। সেই গর্তে একটি সাপ আছে। জাহান্নাম, ময়দান এবং গর্ত প্রত্যহ সেই সাপ হইতে সাতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই সাপ সর্বপ্রথম ফাসেক হাফেযদিগকে আক্রমণ করিবে। তখন তাহারা বলিবে—হে আল্লাহ ! মূর্তিপূজকদের আগেই তুমি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিলে?

ওয়াযকারীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

পূর্ব যুগে আলেম এবং ফকীহগণ ওয়ায করিতেন। উবাইদ ইবনে উমায়ের তাবেয়ীর ওয়াযের মজলিশে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) উপস্থিত হইতেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযও ওয়াযের মজলিশে উপস্থিত হইতেন। তারপর এই পেশা এমন জঘন্য রূপ ধারণ করিল যে—জাহেল লোকেরা ওয়ায করা আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে জ্ঞানবান লোক ঐ সমস্ত ওয়াযের মজলিশ হইতে সরিয়া পড়িলেন। জনসাধারণ (স্ত্রী পুরুষ) ভীড় করিতে লাগিল। তাই ওয়াযকারীগণ জ্ঞানার্জন পরিত্যাগ করিয়া এমন সব কেচ্ছা কাহিনী শিখিতে আরম্ভ

করিল—যাহা অজ্ঞ জনসাধারণ পছন্দ করে। ফলে এই পেশার মধ্যে নিত্য নতুন বেদআতের সমাবেশ হইতে লাগিল।

এই জাহেল সম্প্রদায়ের জন্যই এই দেশে বিরাট ফেতনা ফাসাদের প্রসার হইয়াছে।

এই জাহেল সম্প্রদায় লোকের মনোরঞ্জন এবং ভয় প্রদর্শন করার জন্য নিজেরাই হাদীস তৈয়ার করে। ইবলীস এই বলিয়া তাহাদিগকে ধোকা দেয় যে—লোকদিগকে পুণ্যের প্রতি উৎসাহ করায় এবং পাপ হইতে বিরত রাখার মানসেই হাদীস তৈরী করিতেছ। শরীয়ত অসম্পূর্ণ ; উহাকে পূর্ণতা দান করার জন্য এরূপ হাদীস তৈরী করার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—'যেই ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে দোযখে তাহার ঠিকানা করিয়া লয়।'

মিথ্যা হাদীস বলা কবীরা গুনাহ। যেই ব্যক্তি এইরূপ হাদীস বর্ণনা করে বা লিখে দোযখ ব্যতীত তাহার অন্য কোথাও ঠিকানা নাই। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত এই মিথ্যা থাকিয়া যাইবে।

কোন কোন ওয়াযকারী খুব অঙ্গভঙ্গি করিয়া রস লাগাইয়া প্রেমের কবিতা এবং গান পাঠ করে। শয়তান তাহাদিগকে বলে—এই কবিতা এবং গযল দ্বারা তো তুমি খোদাপ্রেমের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছ। কিন্তু মজলিশে এমন লোকও থাকে যাহারা এই সমস্ত কবিতা এবং গান শুনিয়া বিপথগামী হয়। ফলে ওয়াযকারী এবং শ্রবণকারী সকলেই গোমরাহ হয়।

কোন কোন ওয়াযকারী কুরআন শরীফ এক নতুন সুরে নতুন রাগে পাঠ করে। ইহা গানের সমতুল্য। ইহা শুধু মাকরূহই নয় বরং হারাম।

আবার কেহ ওয়ায মজলিশে শোক গাঁথা শোকের কবিতা পাঠ করে। যেমন কারবালার কাহিনীতে ইমাম হাসান হোসেন (রাযিঃ)এর ঘটনাকে সত্য মিথ্যার এমন করুণ সুরে বর্ণনা করে যে, সভাস্থল শোকের মসলিশে পরিণত হয়। কেউ দুঃখে হায় হায় করে, কেউ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠে। আবার কেউবা বুকে করাঘাত করিয়া অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। ইহার কোনটাই জায়েয নহে।

অথচ পরকালে বিশ্বাসীদের এতটাই কর্তব্য যে, মহান বুযুর্গদের

শাহাদাত এবং মৃত্যুতে অন্যকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দেওয়া। এমন কোন কিছু বলা উচিত নয় যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ওয়াযকারীদের অবস্থা এই যে, তাহারা বেশ সুভাষী হয়। অথচ তাহাদের কথার কোন অর্থই হয় না। আজকাল তো ইহারা মূসা (আঃ) আর তুর পর্বত, ইউসুফ (আঃ) আর যোলায়খার কেচ্ছাকে রং রস দিয়া বর্ণনা করে। না কোন ফরয ওয়াজিব শিক্ষা দেয়, না কোন পাপ হইতে বাঁচার পথ দেখায়। তাই অবুঝ লোকজন কিভাবে অন্যায় করা হইতে, রিয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। স্ত্রী কিভাবে স্বামীর হক আদায় করিবে? নামাযী কিভাবে তাহার নামায আদায় করিবে? এই সমস্ত ওয়াযকারীদের জন্য আফসোস যে শরীয়তকে পিছনে রাখিয়া পৃথিবীর ধনসম্পদ পাওয়ার পথ খোঁজে। আশ্চর্য যে তাহারাই এই পৃথিবী গরম করিয়া রাখিয়াছে।

আবার কেহ কেহ সূফী সাজিয়া লোকদিগকে ইবাদত বন্দেগী এবং সংসার বিরাগী হওয়ার সবক দান করে। মানুষের প্রকৃত করণীয় সম্বন্ধে কিছুই বলে না। কোন কোন লোক তাহাদের শিক্ষা মত স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া সংসার বিরাগী হয়। আর তাহার সন্তান-সন্ততিগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবিকার সংস্থান করে।

কখনও ওয়াযকারী নেক নিয়তেই নসীহত করার মনস্থ করে। এই অবস্থায়ও কাহারও কাহারও মনে সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা প্রবল থাকে যে জনসাধারণ তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করুক। ইহার প্রমাণ এই যে—যদি কোন ব্যক্তি তাহার এই কাজের জন্য তাহাকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে তবে সে উহা পছন্দ করে না। কারণ, সে চায় না যে তাহার প্রাপ্য সম্মানে অন্য কেহ অংশীদার হউক। যদি সে তাহার কাজে সঠিক থাকিত তবে তাহার সাহায্যকারীকে সে অপছন্দ করিত না।

কোন কোন ওয়াযকারীর মজলিশে স্ত্রী পুরুষের সমাবেশ হয়। মেয়েরা ভবোন্মাদনায় উচ্চস্বরে কাঁদিতে থাকে। সকলের মনের উপরই তাহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করুক এই আশায় সে কাঁদিতে নিষেধ করে না।

আমাদের যুগে এমন সব ওয়াযকারী আছে যাহাদের প্রতি শয়তানের কোন অনুরাগ নাই। অর্থাৎ তাহারা ওয়াযকে ধর্মীয় ব্যাপার মনে না করিয়া টাকা পয়সা উপার্জনের অবলম্বন করিয়া লইয়াছে। ধনী, অত্যাচারীদের নিকট গিয়া ওয়ায করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ, তাহারা পয়সা বেশী দিবে। ইহারা গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরিয়া ফিরিয়া ওয়ায করে।

কোন কোন পরহেযগার আলেমকে শয়তান এই বলিয়া ধোকা দেয় যে—তোমার মত লোক ওয়ায করার উপযুক্ত নয়। কারণ, ইহা সতর্ক এবং হুঁশিয়ার আলেমের কাজ। ফলে এই আলেম ওয়ায নসীহত করা হইতে বিরত থাকে। এইভাবে তাহাকে পুণ্যের কাজ করা হইতে বিরত রাখে। আবার কখনও এই কথাও বলে যে—তুমি যাহা বল উহা তোমার নিকটই ভাল মনে হয়। ফলে ইহা রিয়ায় পরিণত হইতে পারে। সুতরাং তোমার পক্ষে ওয়ায না করাই ভাল। এইভাবেও তাহাকে পুণ্য অর্জন করা হইতে বঞ্চিত রাখে।

আবেদদের প্রতি শয়তানের ধোকা

যে সমস্ত পথে ইবলীস মানুষের নিকট আগমন করে উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত পথ অজ্ঞতা বা মূর্খতা। সুতরাং কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন না হইয়াই শয়তান মূর্খের নিকট আগমন করে। কিন্তু আলেমদের নিকট চোরা গলিপথ ছাড়া আসিতে পারে না। শরীয়ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান কম থাকায় শয়তান বহু আবেদকে (দরবেশ) অতি সহজেই ধোকা দিতে সক্ষম হইয়াছে। কারণ, জ্ঞানার্জন করা ব্যতীত এলমে শরীয়ত আয়ত্ব না করিয়াই তাহারা ইবাদত বন্দেগী করার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছেন।

রবী ইবনে খোছাঈম (রাযিঃ) বলেন—প্রথমে হাসিল কর ; তারপর নির্জনতা অবলম্বন কর।

শয়তান এই সমস্ত আবেদকে পরামর্শ দিয়াছে যে, এলমের চেয়ে ইবাদত শ্রেষ্ঠ। অথচ নফল ইবাদতের চেয়ে এলম শিক্ষা শ্রেয়তর। শয়তান তাহাদের অন্তরে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে যে—এলমের উদ্দেশ্য

আমল এবং অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দ্বারা যাহা কিছু করা হয় উহাই আমল। কিন্তু তাহারা ইহা অবগত নহে যে এলমও অন্তরের আমল। অন্তরের আমল অঙ্গ–প্রত্যাঙ্গের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং অন্তরের নিয়ত ব্যতীত বাহ্যিক কোন আমলই দুরস্ত হয় না।

মাতেরাফ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—অধিক জ্ঞানার্জন করা অধিক ইবাদত করার চেয়ে ভাল।

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন—জ্ঞানের একটি অধ্যায় আয়ত্ব করা সত্তরটি ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ভাল।

মাআফী ইবনে ইমরান বলেন—একখানি হাদীস লিপিবদ্ধ করাকে আমি সারারাত ইবাদত করার চেয়ে প্রিয় মনে করি।

ইবলীসের এই চক্রান্ত যখন লোকের উপর কার্যকরী হইল তখন তাহারা জ্ঞানার্জন ত্যাগ করিয়া ইবাদত করার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল। এই সুযোগে শয়তান তাহাদের ইবাদত বন্দেগীর প্রত্যেকটি শাখা–প্রশাখায় ধোকা দিতে আরম্ভ করিল। যেমন—

পায়খানা প্রস্রাবে ধোকা

শয়তান তাহাদিগকে বহুক্ষণ পায়খানায় বসাইয়া রাখে। অথচ ইহাতে হৃদয় দুর্বল হইয়া যায়। সুতরাং পরিমিত সময় পর্যন্তই পায়খানায় থাকিবে।

কেহ কেহ পেশাব করিয়া হাটে ; কৃত্রিমভাবে কাশি দেয়। আবার কেহ ডন বৈঠক আরম্ভ করে আবার কেহ বা এক পায়ে দাঁড়াইয়া অন্য পা ঝাড়া মারে। মনে করে এইভাবে প্রস্রাবের শেষ ফোটা বাহির হইয়া যাইবে। অথচ এইভাবে যত বাড়াবাড়ি করিবে ততই পেশাবের ফোটা—বাহির হইতে থাকিবে। কারণ খাদ্যের সঙ্গে পানি পান করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা মূত্রাশয়ে গিয়া জমা হয়। যখন প্রস্রাব করার ইচ্ছা হয় তখন যতটা প্রস্রাব জমা হয় ঠিক ততটাই মূত্রাশয় হইতে মূত্রনালী দিয়া বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু প্রস্রাব হওয়ার পর দাঁড়াইয়া যখন পা ঝাড়া দেয় বা এই জাতীয় কিছু করে এবং কিছুটা বাহির হউক এই আশা করে তখন মূত্রাশয় হইতে কিছুটা প্রস্রাব নিশ্চয়ই বাহির হইয়া আ[illegible]। যেহেতু প্রস্রাব করার ইচ্ছা

না থাকায় প্রবলবেগে বাহির না হইয়া ফোটায় ফোটায় বাহির হইবে। সুতরাং উচিত মূত্রযন্ত্রকে দুই আঙ্গুল দ্বারা নিচের দিকে কয়েকবার চাপিয়া পরে পানি দ্বারা ধৌত করা।

(এইখানে আমরা গ্রন্থকারের সাথে একমত হইতে পারিলাম না। কারণ, তাহার বর্ণিত মতে ধৌত করার পরও দেখা গিয়াছে যে, সামান্য একটু চলাফেরা করিলেই কিছুটা প্রস্রাব বাহির হইয়া আসে। সেমতে কাপড় অপবিত্র হইয়া নামায শুদ্ধ না হওয়ার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রস্রাবের পর ঢিলা ব্যবহার করা কর্তব্য। তবে ঢিলা লইয়া ডন কুস্তি করাও ভাল নয়।)

আবার কাহাকেও দেখা যায় পায়খানা করার পর বদনার পর বদনা পানি দ্বারা কয়েকবার ধৌত করে। অতি কট্টর মযহাব মতেও পবিত্রতা লাভ করার জন্য সাত বারের বেশী ধৌত করিতে হয় না। পায়খানা করার পর যদি কুলুখ ব্যবহার করা হয় এবং মলদ্বার ব্যতীত যদি অন্য স্থানে মল না লাগে তবে তিনটি কুলুখ ব্যবহার করাই যথেষ্ট। তারপর পানি দ্বারা ধৌত করা ভাল।

অযূতে ধোকা

এই অজ্ঞ আবেদদিগকে শয়তান অযুর নিয়ত করার মধ্যে ধোকা দিয়া থাকে। এই জাতীয় দরবেশদিগকে অযু করার সময় দেখা যায় একবার বলেন—পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করিতেছি, আবার বলেন নামায ছহীহ হওয়ার জন্য অযু করিতেছি। আবার বলেন—না! না! পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করিতেছি। দুদোল্যমান অবস্থায় এইভাবে তাহাদের জিহ্বা নড়াচড়া করিতে থাকে। শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য শয়তান তাহাকে এইভাবে অপকর্মে ব্যস্ত রাখে।

অথচ তিনি জানেন না যে, অন্তরের ইচ্ছাই নিয়ত ; মুখে উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নাই। আর উচ্চারণ করাকে কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও একবার বলাই তো যথেষ্ট। এতবার বলার কি প্রয়োজন।

শয়তান কাহারও মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তুমি যেই পানি দ্বারা অযু করিতেছ—উহা পবিত্র তো? তোমার অযু সন্দেহদুষ্ট হইবে না তো? এমনিতর আরও সুদৃঢ় পরাহত সন্দেহে তাহাকে নিপতিত করে।

অথচ এই সন্দেহ প্রবণদের জন্য শরীয়তের এই ফতওয়াই যথেষ্ট যে, পানি আসলেই পবিত্র ; কোন প্রকার সন্দেহ প্রবণতার জন্য উহা অপবিত্র হইতে পারে না। কোন কোন দরবেশকে দেখা গিয়াছে তাহারা মুখ খোলা কূপের পানি দ্বারা অযু করেন না। তাহাদের সন্দেহ হয়ত উহাতে কোন পাখির বিষ্টা পড়িয়াছে। এই সন্দেহে তাহারা নদী বা বড় পুকুরের সন্ধান করেন।

আবার অনেকে অযুতে বেশী পানি খরচ করে। এরূপ করা চারি প্রকারে দোষণীয়। (১ম) পানির অযথা খরচ (২য়) সময়ের অপব্যয় (৩য়) শরীয়তের বিরোধিতা করা। কারণ শরীয়তের নির্দেশ পানি অল্প খরচ করা এবং (৪র্থ) শরীয়ত অযুর অঙ্গ তিনবারের বেশী ধৌত করিতে নিষেধ করিয়াছে। এই অসঙ্গত কাজ করার ফলে কাহারও নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হইয়া যায় আবার কেহ বা জমাআতে যথারীতি শরীক হইতে পারে না। শয়তান তাহাকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে, অযু করার সময় সতর্কতা অবলম্বন কর। যদি অযু না হয় তবে তো তোমার নামাযই বৃথা যাইবে।

যাহারা শয়তানের এই প্রকার ধোকায় আবদ্ধ তাহাদের অনেককে দেখা গিয়াছে তাহারা পানাহারের বেলায় হালাল হারামের পার্থক্য দেখে না ; স্বীয় জিহ্বাকে পরনিন্দা করা হইতে নিবৃত্ত রাখে না। আফসোস তাহারা যদি ইহার উল্টা কাজ করিত অর্থাৎ হালাল হারাম বাছিয়া খাইত এবং পরনিন্দা হইতে স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখিত ; শয়তানের এই প্রকার ধোকায় না পড়িত তবে তাহাদের ইহ এবং পরকাল কতই না সুখময় হইত।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাআদ (রাযিঃ) অযু করার সময় নবীজী তাহার নিকট দিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। বলিলেন—হে সাআদ! পানি কেন অযথা খরচ করিতেছ? সাআদ (রাযিঃ) বলিলেন—অযুর সময় বেশী পানি খরচ করিলেও অযথা হয় নাকি? ইরশাদ বলিলেন—হাঁ। প্রবাহিত নদীর তীরে অযু করিলেও।

উবাই ইবনে কাব বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—অযুর সময় যে শয়তান ধোকা দেয় তাহার নাম

ওয়ালহান। তোমরা উহা হইতে সতর্ক থাক।

হযরত হাসান বসরী বলেন—ওয়ালহান নামক শয়তান অযু করার সময় লোকের সাথে ঠাট্টা করে।

আবু নায়ামা বলেন—আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিঃ) নামাযের পর তাহার ছেলেকে লম্বা চওড়া দোআ করিতে শুনিলেন যে, আল্লাহ আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দিও—ইহা দিও, উহা দিও। তিনি বলিলেন—বৎস! তুমি আল্লাহর নিকট বেহেশত পাওয়ার এবং জাহান্নাম হইতে মুক্তির দোআ কর। কেননা আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন—আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি দল হইবে যাহারা দোআ এবং পবিত্রতা অর্জনে অতিরঞ্জিত করিবে।

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল (রাযিঃ) বলেন—জ্ঞানবান আলেমদের সৌন্দর্য—সময়ের হেফাযত করা এবং ইবাদতের জন্য পানি কম খরচ করা। যেই গ্রাম্য আরব মসজিদে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে নবীজী অবশ্য ইরশাদ করিয়াছিলেন—তাহার প্রস্রাবের উপর এক.বালতি পানি ঢালিয়া দাও। মনি লাগিয়া গেলে আয়খার ঘাস দ্বারা মুছিয়া ফেল। মোজা এবং জুতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—মাটিতে ঘষিয়া লইলেই পবিত্র হইবে। যে মেয়েদের কাপড় মাটির সাথে ঘেঁষিয়া যায় এবং উহাতে ঘোড়া ইত্যাদির মল লাগে উহার পরবর্তী মাটির সাথে ঘেঁষিয়া গেলেই পবিত্র হইয়া যায়।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—দুগ্ধপোষ্য বালিকা প্রস্রাব করিয়া দিলে ধুইয়া ফেলিবে এবং বালক প্রস্রাব করিলে পানি ছিটাইয়া দিবে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাতনী এমামাহকে নামাযের সময় কাঁধের উপর তুলিয়া লইতেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরের সাথীদের মধ্যে কেহ রাখালকে যদি জিজ্ঞাসা করিতেন—তোমাদের এই তালাবে জীবজন্তুতে পানি পান করে কিনা? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখালকে বলিতেন—প্রশ্নকারীকে কিছু বলিও না। তারপর ইরশাদ করিতেন—জীবজন্তুতে পানি পান করার পর যাহা বাকী আছে উহা আমাদের জন্য পবিত্র।

আসওয়াদ ইবনে সালেম একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। প্রথমে তিনি খুব বেশী পরিমাণ পানি খরচ করিতেন, পরে অল্প পানি খরচ করিতেন।

কোন এক ব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—এক রাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময় কেহ আমাকে ডাকিয়া বলিল—হে আসওয়াদ! এই অযথা খরচ কেন?

নামাযে ধোকা

যে কাপড় পরিধান করিয়া নামায আদায় করা হয় উহা পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও বার বার ধৌত করে। এমন কি কোন মুসলমান উক্ত কাপড় স্পর্শ করিলেও ধৌত করে।

আবার এমন লোকও ছিল—যাহারা নদীতে কাপড় ধুইত বাড়ীতে ধোয়া পছন্দ করিত না। আবার কেহ কেহ কাপড় বাধিয়া কুয়ার মধ্যে ভিজাইয়া রাখিত। যেমন ইহুদীরা করিয়া থাকে। অথচ সাহাবাদের মধ্যে কেহই এমন করিতেন না। বরং পারস্য বিজয় করার পর তাহারা রেশমী ব্যতীত যে সমস্ত কাপড় পাইয়াছিলেন—উহা দ্বারা নামায পড়িতেন, চাদর স্বরূপ বিছানায় বিছাইতেন।

নামাযের নিয়তেও শয়তান ধোকা দিয়া থাকে। যেমন কেহ বলে আমি অমুক নামাযের নিয়ত করিতেছি। পুনরায় বলে। বার বার এমনিভাবে নিয়ত করে। এই ধারণা করে যে, আমি নিয়ত ছাড়িয়া দিয়াছি। অথচ শব্দের তারতম্য হইলেও নিয়ত ভাঙ্গা হয় না।

আবার কেহ বার বার তাকবীর তাহরীমা বলিতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতেই ইমাম রুকুতে চলিয়া যায়। নাচার হইয়া তাকবীর বলিয়া রুকুতে যায়। আমরা বুঝিতে পারি না তখন তাহার নিয়ত কিভাবে ঠিক হইয়া যায় এবং পূর্বে কেন হয় নাই?

আমার তো ইহাই মনে হয় তাহাকে তাকবীরে উলার এবং কেরাত শুনার পুণ্য হইতে বঞ্চিত রাখার জন্য শয়তান এমনভাবে ধোকা দিয়াছে।

বর্ণিত আছে, আবু হাযেম (রাযিঃ) মসজিদে প্রবেশ করিলে শয়তান তাহাকে বলিল—তুমি অযু ছাড়াই নামায পড়ার নিয়ত করিতেছ? হাযেম বলিলেন—ওহে দুশমন! তোমার নসীহত আমার নিকট কার্যকরী হইবে না।

এই প্রকার ধোকার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ ব্যক্তিকে বলা যাইতে পারে যে যদি তুমি যুহরের নিয়তের মনস্থ করিয়া থাক তবে উহা তো হাযির। কারণ, তুমি তো ফরয আদায় করার জন্যই দণ্ডায়মান হইয়াছ। আর ইহাই নিয়ত। নিয়তের স্থান অন্তর জিহ্বা নয়, শব্দ বলাও ওয়াজিব নয়। তারপরও তুমি ছহীহ শব্দ বলিয়াছ। সুতরাং পুনরাবৃত্তির কি প্রয়োজন? তোমার কি এই ধারণাই যে তুমি ইহা বল নাই? অথচ তুমি বলিয়াছ। ইহা তোমার মস্তিষ্কের অসুস্থতা।

হযরত ইবনে আকীলের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল—আমি অযু করি। তারপর বলি অযু করি নাই। আমি তাকবীর বলি। তারপর বলি—তাকবীর বলি নাই।

ইবনে আকীল বলিলেন—তোমার প্রতি নামায ওয়াজিব নয়। তুমি নামায পড়িও না।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল—হযরত! আপনি কেমন ফতওয়া দিলেন? তিনি বলিলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—

رفع القلم عن المجنون -

পাগল হইতে কলম উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রতি নামায আদায় করা ওয়াজিব নহে। কারণ, তাহার কথায় প্রমাণিত হয় সে পাগল। পাগলের উপর নামায ওয়াজিব নহে।

কোন কোন মুসল্লীদের অবস্থা এই যে, একবার যখন সে নিয়ত ছহীহ করিয়া তাকবীর বলে তারপর অবশিষ্ট নামাযের প্রতি একবারেই উদাসীন হইয়া যায়; মনে নামাযের উদ্দেশ্যই এই তাকবীর বলা। এখন যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাকবীর তো নামাযে প্রবেশ করার জন্যই বলা হয়, তবে কেন নামাযে উদাসীন থাক। ইহা কি সম্ভবপর যে ইবাদত যাহা ঘরের ন্যায় যাহার রক্ষণাবেক্ষণে উদাসীন থাকিয়া তাকবীর যাহা দরজা স্বরূপ শুধু উহারই হেফাযত করিতে হইবে?

কোন কোন মুসল্লীকে দেখা গিয়াছে যে, ইমামের রুকূতে যাওয়ার সামান্য পূর্বে তাকবীর ছহীহ করিয়া ছানা ও তায়াউয পড়িতে আরম্ভ করে। ইত্যবসরে ইমাম রুকূতে চলিয়া যায় এবং সাথে সাথে মুছল্লীও রুকূ করে। ইহাও শয়তানের ধোকা। বরং শরীয়তের দিক হইতে অজ্ঞতার

Contents

শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। কারণ, সানা ও তায়াউয পাঠ করা সুন্নত। আর ইমামের সাথে সূরা ফাতেহা পাঠ করা (কোন কোন ইমামের মতে) ওয়াজিব। সে শয়তানের ধোকায় পড়িয়া সুন্নত আদায় করিতে গিয়া ওয়াজিব ত্যাগ করে।

গ্রন্থকার বলেন—আমি ছোট সময় আমার ওস্তাদ শায়খ আবু বকর দাইনুরীর পিছনে উপরোক্ত নিয়মে নামায পড়িতাম। একদিন তিনি আমার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—'বৎস! ইমামের পিছনে নামায পড়িলে মুক্তাদির সূরা ফাতেহা পাঠ করা সম্বন্ধে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সানা ও ওয়াউয পাঠ করা যে সুন্নত ইহাতে সকলেই একমত। সুতরাং তোমার কর্তব্য সুন্নত পরিত্যাগ করিয়া ওয়াজিব আদায় করা।'

শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কেহ কেহ নামাযে সুন্নত আদায় করা পরিত্যাগ করিয়াছে। যেমন কেহ নামাযে হাতের উপর হাত না বাঁধিয়া বলে—আমার অন্তরে যে একাগ্রতা ও বিনয়তা নাই হাত বাধিয়া উহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

জামাআতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানো সম্বন্ধে বলে যে, উহার অর্থ অন্তরের নিকটবর্তী হওয়া।

ইহার পিছনে রহিয়াছে—জ্ঞানের অপ্রতুলতা। সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—লোক যদি জানিত যে, আযান দেওয়ার এবং জামাআতের প্রথম কাতারে দাঁড়াইলে কি সওয়াব হয় তবে পুণ্যলাভের ব্যগ্রতায় লটারী করিয়া এই কাজ করিত।

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে—পুরুষদের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রথম কাতার, অধিক খারাপ পিছনের কাতার। মেয়েদের জন্য ভাল পিছনের কাতার এবং খারাপ প্রথম কাতার। (মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) নামাযের সময় ডান হাতের উপর বাম রাখিতেন। একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা দেখিয়া বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া দিলেন।

হযরত ইবনে যোবায়ের (রাযিঃ) বলেন—হাতের উপর হাত রাখা সুন্নত।

আবার কেহ কেহ মাখরায আদায়ের ব্যাপারে শয়তানের ধোকায় পড়িয়াছে। 'আল হামদু' কয়েকবারে উচ্চারণ করে। ইহাতে নামাযের আদব নষ্ট হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ মাগদুবের দোয়াদ উচ্চারণ করিতে গিয়া মুখের থুথু বাহির করিয়া ফেলে।

সাআদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন—সহল ইবনে আবু ইমামা বলেন—আমি এবং আমার পিতা হযরত আনাসা ইবনে মালেক (রাযিঃ)এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি হয়ত কছর নামায আদায় করিতেছিলেন। তাহার নামায শেষ হইলে আমার পিতা বলিলেন—আপনার প্রতি আল্লাহ মেহেরবান হউন। ইহা কি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ফরয আদায় করিলেন না নফল।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন—ইহাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায। আমি কিছু ভুলিয়া যাওয়া ব্যতীত যথাযথভাবে আদায় করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করি নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা তোমাদের নফসের সাথে কঠোর ব্যবহার করিও না। কেননা, একটি সম্প্রদায় নিজেদের উপর কঠোর ব্যবহার করায় আল্লাহও তাহাদের উপর কঠোরতা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তারপর ইহাদের অবশিষ্ট লোক গির্জা এবং সাধনালয়ে দেখা গিয়াছে। তাহাদের বৈরাগ্য নিজেদের আবিস্কার। আমি তোমাদের জন্য বৈরাগ্য ফরয করি নাই।

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস আরয করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! শয়তান আমার নামায, কেরাত এবং আমার মধ্যে আসিয়া প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—এই শয়তানের নাম খানযাব। যখন তুমি এইরূপ কিছু অনুভব কর তখন আউযুবিল্লাহ পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর। ওসমান বলেন—আমি এইরূপ আমল করায় আল্লাহ সেই শয়তান আমার নিকট হইতে দূর করিয়া দিলেন।

আমি কোন কোন আবেদকে দেখিয়াছি দিনের বেলায় নফল নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করে। আমি বলিলাম—দিনের বেলায় জোরে কেরাত পড়া তো মাকরূহ। তাহারা বলিলেন—নিদ্রা দূর করার জন্য আমরা ইহা করি। আমি বলিলাম—ঘুম তাড়ানোর জন্য সুন্নত পরিত্যাগ করা যায় না। ঘুম যদি আসেই তবে শুইয়া থাক। কারণ নফসেরও হক আছে।

বুরাইদা বলেন—যে ব্যক্তি দিনের বেলায় নামাযে উচ্চস্বরে কেরাত পড়ে তাহার উপর উটের মল নিক্ষেপ করে।

শয়তান আবেদদিগকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে, অধিক রাত এমন কি সারারাত জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী কর। ফরয নামায আদায় করার চেয়ে রাতের নামাযকে অধিক ভালবাসে। রাত জাগ্রত থাকিয়া ফজরের পূর্বে শয়ন করে। এমন সময় উঠে যখন আর ফজরের সময় থাকে না অথবা প্রয়োজনীয় কাজ সমাধান করিতে করিতে জমাআত পায় না। অথবা সকালে উঠিয়া এমন অলসতা অনুভব করে যে, সন্তান সন্ততিদের জীবিকা অর্জন করার ক্ষমতা থাকে না।

হাসান কাযবিনী নামক এক ব্যক্তি মসজিদে জামে মানসূরে পায়চারী করিতেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—নিদ্রা দূর করিতেছি। আমি বলিলাম—ইহা তো শরীয়ত এবং জ্ঞান উভয় দিক হইতেই নাজায়েয। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমার উপর তোমার নফসেরও হক আছে। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। আরও ইরশাদ করিয়াছেন—মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই উচিত। ধর্মের উপর বাড়াবাড়ি করিলে ধর্মও তোমার উপর বাড়াবাড়ি করিবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন—একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া বর্গার সাথে একটি রশি ঝুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি?

কেহ আরয করিলেন—ইহা যয়নব (রাযিঃ)এর রশি। নামায পড়িতে পড়িতে যখন তাহার নিদ্রা আসে তখন এই রশি দ্বারা নিজকে বাধিয়া রাখেন।

ইরশাদ করিলেন—রশি খুলিয়া ফেল। যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্যমশীল থাক

ততক্ষণ নামায পড়। দুর্বলতা বোধ করিলে শয়ন কর।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন—তন্দ্রা আসিলে তন্দ্রার ঘোর না যাওয়া পর্যন্ত শয়ন করিয়া থাক। কারণ, তন্দ্রাভিভূত অবস্থায় নামায পড়িলে ক্ষমা প্রার্থনার ইচ্ছা করিলেও নফসের প্রতি গালি দেওয়া হয়।

জ্ঞানের দিক হইতেও বুঝা যায় যে, পরিশ্রমজনিত অবসাদ নিদ্রায় দূর হয়। টালবাহানা করিয়া ঘুম তাড়াইয়া দিলে শরীর ও মস্তিষ্কের দোষ দেখা দেয়।

এখন যদি কেহ বলে যে, এমন বহু বুযুর্গের কথা শুনা গিয়াছে যাহারা সারারাত অনিদ্র থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী করিতেন।

—হাঁ। এই কথা ঠিক। তাহারা ক্রমবর্ধমান অবস্থায় সারারাত জাগ্রত থাকার অভ্যাস করিয়াছেন। তাহাদের আস্থা ছিল যে, আমরা ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করিতে পারিব। সামান্য সময় বিছানায় গড়াগড়ি অবসাদ দূর করিয়া ফজরের নামায যথারীতি আদায় করিতেন। তাছাড়া তাহারা স্বল্পাহারী ছিলেন। এই সমস্ত রীতিনীতির অভ্যাস করিয়াই সারারাত জাগার সামর্থ অর্জন করিয়াছিলেন।

তাছাড়া আমরা কোথাও দেখিতে পাই নাই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাতেও নিদ্রা যান নাই। তাঁহার তরীকা অবলম্বন করাই তো আমাদের কর্তব্য।

আর একটি দলকে শয়তান তাহাদের রাত্রি জাগ্রত থাকার বিষয় লোককে জানানোর উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করিয়া থাকে। যেমন কেহ বলে—অমুক মসজিদের মুয়াজ্জেন ঠিক সময়মত ফজরের আযান দিয়াছে। ইহাতে লোকে মনে করিবে সে রাত্রি জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িয়াছে। ইহা অতি সূক্ষ্ম রিয়া।

রিয়া হইতে এমন ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিলেও গোপন দপ্তর হইতে প্রকাশ্য দপ্তরে তাহার নাম লিখিত হয়। যাহার ফলে তাহার পুণ্যের মাত্রা কমিয়া যায়।

আবার কেহ কোন নির্দিষ্ট মসজিদে ইবাদত বন্দেগী করে এবং সে সেই মসজিদের নামানুসারে লোক সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রসিদ্ধি লাভ করার পর বহু লোক তাহার সাথী হয়। ইহাতে তাহার নফস সন্তুষ্ট হয় এবং সে ইবাদত বন্দেগীর মাত্রা আরও বাড়াইয়া দেয়। কারণ সে

জ্ঞানে এইভাবে তাহার নেক নাম আরও বাড়িয়া যাইবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—পুরুষদের জন্য ফরয ব্যতীত অন্যান্য নামায ঘরে বসিয়া আদায় করাই ভাল।

আমের ইবনে আবদে কায়েস কখনওভাল মনে করিতেন না যে, তাহাকে কেহ নামায পড়িতে দেখুক। তিনি কখনও মসজিদে নফল পড়িতেন না। অথচ প্রত্যেক দিন তিনি হাজার রাকআত নফল নামায আদায় করিতেন।

ইবনে আবী লায়লা নামায পড়ার সময় কাহাকেও আসিতে দেখিলে শুইয়া পড়িতেন।

এমন লোকও দেখা যায় যে, সে লোক সমাবেশে অথবা জামাআতে নামায পড়ার সময় কাঁদিয়া ফেলে। যদিও ইহা তাহার হৃদয়ের কোমলতার দরুন হইয়া থাকে তথাপি দমন করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথায় ইহা রিয়ার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(রিয়া অর্থ নিজের ইবাদত বন্দেগী লোকের নিকট প্রকাশ করা। রিয়া মানুষের সমস্ত ইবাদত বন্দেগী নষ্ট করিয়া ফেলে।)

আসেম (রহঃ) বলেন—আবু ওয়ায়েল যখন গৃহে কোণে বসিয়া নামায পড়িতেন তখন তাহার কান্নার করুণ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। কাহারও সামনে এরূপ করিতে বলিলে তিনি কখনও করিতেন না। যদিও তাহাকে উহার পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইত।

আবার কেহ কেহ শয়তানের ধোকায় পড়িয়া সারা দিনরাত ইবাদত বন্দেগী করে। কিন্তু গোপনীয় অন্যায়গুলি সংশোধন করার দিকে মোটেও খেয়াল করে না এবং পানাহারের ব্যাপারে হালাল হারামের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে না।

আবেদদের মধ্যে কেহ কেহ খুব বেশী পরিমাণ এবং তাড়াতাড়ি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। অথচ উহাতে না মাখরাজ আদায় হয় আর না তারতিব রক্ষা করা হয়। আবার কেহ কেহ একদিন বা এক রাকআতে কুরআন শরীফ খতম করে। ইহা জায়েয হইলেও ভাল নয়। কেননা, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে সে এই খতমে কোন জ্ঞানই অর্জন করিল না।

শয়তান কাহাকে এইভাবে ধোকা দিয়া থাকে যে, তাহারা রাতে মসজিদের মিনারে উঠিয়া কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে। ইহা রিয়াকারী এবং লোকদিগকে অযথা কষ্ট দেওয়া। কারণ, কুরআন শরীফ শুনা ফরয। তাই তাহারা সমস্ত কাজ বাদ দিয়া কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা শোনে এবং নিদ্রা যাইতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন—সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কাজ আমি দেখিয়াছি যে, একজন কারী প্রত্যেক শুক্রবার ফজরের নামাযের সালাম ফিরাইয়া সূরা এখলাস, নাস, ফালাক এবং কুরআন খতমের দো'আ পাঠ করে। ইহাতে মুসল্লীগণ মনে করে যে—হযরত আজ কুরআন খতম করিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নিয়ম ছিল না। তাহারা তাহাদের ইবাদত বন্দেগী যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখিতেন।

রবী ইবনে খোছাইম (রহঃ) তাহার সমস্ত ইবাদত বন্দেগী অতি গোপনে সমাধা করিতেন। বহুবার দেখা গিয়াছে তিনি কুরআন শরীফ খুলিয়াছেন। এমন সময় কোন লোক আসিয়া পড়িয়াছে। অমনি তিনি কুরআন শরীফ কাপড়ের নিচে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বহুসংখ্যক বার কুরআন খতম করিয়াছেন। অথচ কেহ জানিত না কখন তিনি কুরআন খতম করিতেন।

রোযায় ধোকা দেওয়া

কিছু লোক বৎসরে পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বৎসরই রোযা রাখে। সাধারণের ইহাতে দুইটি বিপদ দেখা দেয়। প্রথম—সারা বৎসর রোযা রাখিলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে পরিবারের জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয় এবং স্ত্রীর মনোরঞ্জন করার সামর্থও হারাইয়া ফেলে। মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—'তোমার উপরও তোমার স্ত্রীর হক আছে।' এই নফল ইবাদত করিতে গিয়া অনেক সময় অনেক ফরযও ছুটিয়া যায়।

দ্বিতীয়—ফযীলত নষ্ট হইয়া যায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—সবচেয়ে ভাল রোযা হযরত দাউদ (আঃ)এর রোযা। তিনি একদিন রোযা রাখিতেন আর একদিন পানাহার করিতেন। কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি পলায়ন করিতেন

না। অর্থাৎ তাহার শক্তি সামর্থ অবশিষ্ট ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন—তোমার কথাই কি আমার নিকট বলা হইয়াছে যে, তুমি সারারাত নামায পড়। অথবা তোমার কথাই কি আমার কর্ণগোচর হইয়াছে যে, তুমি বল আমি সারারাত নামায পড়িব এবং সারা বৎসর রোযা রাখিব।

আমি বলিলাম—জ্বি হাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ।

ইরশাদ করিলেন—না। বরং রাতে ইবাদতও কর ; নিদ্রাও যাও। দিনে রোযাও রাখ আবার পানাহারও কর। প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখ। ইহা সর্বদা রোযা রাখার ন্যায়। (অর্থাৎ এক রোযায় দশ রোযার সওয়াব হইয়া তিন রোযায় পূর্ণ মাসের সওয়াব হয়।)

আমি বলিল্যম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার চেয়েও বেশী রোযা রাখার সামর্থ আমার আছে।

ইরশাদ করিলেন—তবে একদিন রোযা রাখ আর একদিন পানাহার কর।

আমি বলিলাম—ইহার চেয়েও বেশী রোযা রাখার সামর্থ আমার আছে।

ইরশাদ করিলেন—তবুও একদিন রোযা রাখ আর একদিন পানাহার কর। ইহাই সবচেয়ে ভাল রোযা। ইহা হযরত দাউদ (আঃ)এর রোযা।

আমি বলিলাম—ইহার চেয়েও ভাল রোযা রাখার ক্ষমতা রাখি।

ইরশাদ করিলেন—ইহার চেয়ে ভাল আর কিছু নাই।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে—পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মধ্যে কেহ কেহ সারা বৎসরই তো রোযা রাখিতেন।

হাঁ। কিন্তু তাহাদের এমনই শক্তি সামর্থ ছিল যে, তাহাদের নিজেদের এবং পরিবার পরিজনদের জীবিকার কোন অসুবিধা ছিল না। আবার অনেকে এমনই ছিলেন যে, না তাহাদের পরিবার ছিল আর না নিজেদের কোন চিন্তা ছিল। তারপর তাহাদের অনেকেই শেষ বয়সে এমন করিয়াছেন। তদুপরি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী—'ইহার চেয়ে ভাল কিছু নাই'—তোমাদের সমস্ত প্রমাণকে বাতিল করিয়া দেয়।

প্রাচীন বুযুর্গদের একটি দল এমন অবস্থায় সদা সর্বদা রোযা রাখিতেন যে, তাহাদের আহার্য ছিল মোটামুটি ধরনের। তাও আবার সবসময় জুটাইতে পারিতেন না। ফলে তাহাদের কাহারও দৃষ্টিশক্তি ছিল না কাহারও মস্তিষ্ক শুকাইয়া গিয়াছিল। ইহা নফসের প্রতি অন্যায় যে উহার হক আদায় করা হয় নাই। উহা এমনই কঠোর ছিল যে, নফস উহা বরদাশত করিতে পারে নাই।

কোন কোন আবেদ সম্বন্ধে রটিয়া যায় যে, তিনি সারা বৎসরই রোযা রাখেন। তিনি এই কথা অবগত হওয়া সত্ত্বেও রোযা পরিত্যাগ করেন না। রোযা না থাকিলে লোকের সম্মুখে এই ভয়ে পানাহার করে না যে, হয়ত তাহার প্রসিদ্ধি কমিয়া যাইবে।

ইহা অতি সূক্ষ্ম রিয়া। যদি তাহার ইবাদতে এখলাস থাকিত বা গোপন রাখার ইচ্ছা থাকিত তবে সে এমন সব লোকের সম্মুখে পানাহার করিত যাহারা তাহার নামের সুখ্যাতি করিয়াছে। তারপর আবার অতি সংগোপনে রোযা রাখা আরম্ভ করিত।

আবার কেহ কেহ লোকের নিকট বলে—আজ বিশ বৎসর যাবত আমি একাদিক্রমে রোযা রাখিয়া আসিতেছি। ইবলীস তাহাকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে—তুমি তো এইজন্য ইহা লোকের নিকট প্রকাশ করিতেছ যে, লোক তোমার অনুকরণে রোযা রাখিবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা সকলের নিয়ত সম্বন্ধেই পরিজ্ঞাত।

সুফইয়ান সাওরী বলেন—কোন ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত অতি গোপনে ইবাদত বন্দেগী করে। তারপর শয়তানের বার বার প্ররোচনায় লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। তখন গোপনীয় দপ্তর হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিয়া প্রকাশ্য দপ্তরে লিখিত হয়। ফলে তাহার পুণ্য কমিয়া যায়।

কোন কোন দরবেশের নিয়ম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা। ঐদিন যদি তাহাকে কেহ পানাহারের আহবান জানায় তবে সে বলে—'ভাই! আজ তো সোমবার! অথবা আজ তো বৃহস্পতিবার। তখন তাহারা বুঝিতে পারে সে হয়ত আজ রোযা রাখিয়াছে। আবার কেহ কেহ অন্য লোককে বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া বলেন যে, তিনি রোযা আর তাহারা রোযাদার নয়। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক দরবেশও আছেন যে রোযা রাখেন, কিন্তু যাহা পাওয়া যায় হালাল হারামের তারতম্য না করিয়াই

ইফতার করেন। সারাদিন পরনিন্দা করিয়া বেড়ান। পরস্ত্রীর দিকে তাকানো অন্যায় মনে করেন না। শয়তান তাহাদিগকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে—রোযা এমনই সৎ কাজ যে সমস্ত পাপ সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়।

মুজাহিদদের প্রতি ধোকা

বহু লোক শয়তানের ধোকায় পড়িয়া এই জন্য জিহাদ বা ধর্ম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যে—লোক সমাজে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, লোকে তাহাকে গাযী বলিবে, তাহার শৌর্য বীর্য দেখিয়া লোক চমৎকৃত হইবে অথবা মালে গনীমত লাভ করিবে। নিয়তের উপরই সব কাজের ফলাফল নির্ভর করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া আরয করিল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ কখনও বাহাদুরীর জন্য, কখনও স্বগোত্রের সাহায্যের জন্য আবার কেহবা লোকের বাহবা পাওয়ার জন্য জিহাদ করে। উহাদের মধ্যে কাহার জিহাদ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইবে?

ইরশাদ করিলেন—আল্লাহর বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য যাহার যুদ্ধ তাহার জিহাদই আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিবেচিত হইবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন—তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে বলিও না যে, অমুকে শহীদ হইয়াছে। কেননা, কেহ মালে গনীমতের জন্য, কেহ তাহার নাম অমর রাখার জন্য, আবার কেহ বা বাহাদুরী দেখানোর জন্য জিহাদ করিয়া থাকে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—হাশরের দিন তিন প্রকার লোকের বিচার প্রথম হইবে।

প্রথম শহীদদের। শহীদকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—তোমাকে যেই সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হইয়াছিল—তুমি উহার পরিবর্তে কি করিয়াছ? সেই ব্যক্তি উত্তর করিবে—তোমার নামে জিহাদ করিতে করিতে মারা গিয়াছি।

আল্লাহ তাআলা বলিবেন—মিথ্যা কথা। তুমি এই জন্য জিহাদ

করিয়াছ যে, লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে এবং তাহাই হইয়াছে। তারপর আল্লাহর নির্দেশমত তাহাকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার লোক যাহারা আলেম এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়াছে অথবা কুরআন শিক্ষা দিয়াছে। আল্লাহ তাআলা তাহাকে যেই সমস্ত নেয়ামত দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া বলিবেন—উহা দ্বারা তুমি কি করিয়াছ?

সেই ব্যক্তি বলিবে—আমি তোমার সন্তুষ্টি বিধানার্থেই জ্ঞানার্জন করিয়াছি, অন্যকে শিক্ষা দিয়াছি। আল্লাহ তাআলা বলিবেন—মিথ্যা কথা। লোকে তোমাকে আলেম বলিব—সেই জন্যই ইহা শিক্ষা করিয়াছিলে। লোকে তাহাই বলিয়াছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশমত তাহাকে উপুড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তৃতীয় প্রকার লোক সম্পদশালী। আল্লাহ তাআলা বলিবেন—তোমাকে যে সম্পদ দান করা হইয়াছিল উহা দ্বারা কি করিয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিবে—যেই পথে দান করিলে তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে আমি সেই সমস্ত পথেই দান করিয়াছি।

আল্লাহ তাআলা বলিবেন—মিথ্যা কথা। লোকে তোমাকে দানশীল বলিবে—এইজন্য দান করিয়াছিলে এবং তাহাই হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশমত তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

আবদুহ ইবনে সালমান মাযুরী বলেন—আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাথে রোম যুদ্ধে যাই। উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইলে শত্রুপক্ষের একজন আসিয়া আমাদের পক্ষের একজনকে আহবান করিল। আমাদের পক্ষীয় একজন গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুসেনাকে নিহত করিলেন। এইরূপ একে একে চারজন শত্রুসেনাকে হত্যা করায় আমাদের পক্ষীয় লোকজন দৌড়াইয়া দেখিতে গেল—কে এই বাহাদুর।

আবদুহ ইবনে সালমান বলেন—আমিও তাহাদের সাথে গেলাম। গিয়া দেখিলাম—তিনি তাহার বড় পাগড়ী দ্বারা মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। আমি জোর করিয়া পাগড়ী খুলিয়া দেখিলাম—তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক।

তিনি আমাকে বলিলেন—হে আবদুহ! তুমিও কি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে একজন যাহারা আমাকে অপদস্ত করিতে চায়।

অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক কখনও ইহা পছন্দ করিতেন না যে, কেহ তাহার শৌর্য বীর্য দেখিয়া প্রশংসা করুক এবং উহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। যাহার ফলে তিনি জিহাদের পুণ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হন।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) জিহাদে অংশগ্রহণ করিতেন কিন্তু মালে গনীমতের কিছু গ্রহণ করিতেন না। ফলে তিনি বেশী পুণ্য লাভ করিতেন।

কোন কোন মুজাহিদ শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া মালে গনীমতের এমন কিছু রাখিয়া দেয় যাহাতে উহার কোন অধিকার নাই। শরীয়ত সম্বন্ধে তাহার তেমন কোন জ্ঞান না থাকায় মনে করে যে, কাফেরের সম্পদ মোবাহ, গ্রহণকারীর জন্য হালাল। কিন্তু ইহা জানে না গনীমতের মালে খেয়ানত করা পাপ। কারণ, সকল মুজাহিদের উহাতে সমান সমান অধিকার।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন—আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খয়বর যুদ্ধে গমন করি। আল্লাহ আমাদিগকে জয়ী করেন। সেখানে আমরা স্বর্ণ রৌপ্য কিছুই পাই নাই। কিছু তরবারী এবং কাপড়-চোপড় পাই। আমরা একটি উপত্যকার দিকে রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌছিয়া মনযিল করিলাম।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন দাস দাঁড়াইয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের হাওদা খুলিতেছিল। ইত্যবসরে একটি তীর আসিয়া তাহার দেহে বিদ্ধ হইল এবং সে মারা গেল। আমরা সকলে বলিলাম—তাহার শাহাদত মোবারক হউক। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—কখনও নয়। যেই আল্লাহর আয়ত্বে মুহাম্মদের জীবন তাহার শপথ! সে খয়বর যুদ্ধের সময় বন্টন হওয়ার পূর্বে মালে গনীমতের একটি বুটিদার মস্তকাবরণ লইয়াছিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই ভয় পাইয়া গেলাম। এক ব্যক্তি একটি অথবা দুইটি চামড়ার বড় টুকরা লইয়া আসিয়া বলিল—আমি উহা খয়বরের দিন পাইয়াছিলাম। নবীজী

ইরশাদ করিলেন—ইহা আগুনের চামড়ার টুকরা।

কোন কোন ধর্মযোদ্ধা জানেন বন্টনের পূর্বে কোন কিছু লওয়া হারাম। কিন্তু এমন মূল্যবান বস্তু তাহার হস্তগত হয় যে, উহার লোভ সামলাইতে পারে না। মনে করে যে, আমার জিহাদের পুণ্যই এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারিবে। অথচ এই সময়ই হইল ঈমান ও জ্ঞানের পরীক্ষার সময়।

আবু উবাইদা আসরী বলেন—পারস্য রাজধানী মাদায়েন জয় করার পর সকলে মালে গনীমত জমা করিতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি মোতির একটি বাক্স আনিয়া মালে গনিমতের হিসাব রক্ষকের নিকট জমা দিলেন। উহা দেখিয়া সকলেই বলিলেন—খোদার কসম! আমরা এত মূল্যবান বস্তু আর কখনও দেখি নাই। সমস্ত মালে গনীমতও ইহার সমমূল্যের হইবে না।

এক ব্যক্তি বলিলেন—তুমি কি উহা হইতে কিছু লইয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিলেন—খোদার শপথ! আমি যদি আল্লাহকে ভয় না করিতাম তবে উহার একটিও জমা দিতাম না।

সকলেই বুঝিলেন—এই ব্যক্তির ঈমান অতি উচ্চ পর্যায়ের। লোকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমি আমার পরিচয় তোমাদিগকে দিব না। কারণ তোমরা আমার প্রশংসা করিবে অথবা আমার সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু বলিবে। আমি আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভ করা ব্যতীত আর কিছুই চাই না। অতঃপর গোপনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে—তিনি আমের ইবনে আবদে কায়েস (রাযিঃ)।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিরোধ

যাহারা সৎ কাজে আদেশ এবং অন্যায় কাজে বাধা দান করে তাহারা দুই প্রকার—আলেম এবং জাহেল। শয়তান আলেমের নিকট দুইটি পথে আগমন করে।

প্রথম তাহার কাজ তাহার নিকট সৌন্দর্যমণ্ডিত, আত্মপছন্দীয় করিয়া তোলে।

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেন—সোলায়মান দারানী দেখিলেন—আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মানসূর জুমআর খোতবাহ

দেওয়ার সময় কাঁদিতেছেন। দারানী মনে করিলেন—খলীফা মিম্বর হইতে অবতরণ করিলে আমি তাহাকে নসীহত করিব। কিন্তু তখনই আমার মনে হইল—আমার এই কাজের জন্য উপস্থিত সকলেই আমার প্রশংসা করিবে। যাহার ফলে আমার অন্তর খুশী হইবে। আমার নফসও আমাকে এই কাজ করার জন্য উৎসাহ দিবে। কিন্তু যখন দেখিলাম—আমার নিয়ত ঠিক নাই। তখন আর আমি উঠিলাম না।

দ্বিতীয়—ক্রোধ দ্বারা। এই ক্রোধ কখন কখন প্রথম হইতেই থাকে। আবার কখনও বা নসীহত করার সময় উদ্রেক হইয়া থাকে। কারণ, কাহাকে নসীহত করিলে সে যদি না শুনে তখন নিজের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। এই অবস্থায় ঝগড়া বিবাদ করিলে উহা নিজের জন্য হয়।

একবার হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কোন এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন—আমি যদি ক্রোধান্বিত না হইতাম তবে তোমাকে অবশ্য শাস্তি দিতাম। অর্থাৎ তোমার কথা দ্বারা আমার ক্রোধ উৎপত্তি করিয়া দিয়াছ। এখন আমার ভয় হইতেছে যে কাজ খোদার জন্য করিতেছিলাম—উহা এখন আমার নিজস্ব বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

যখন কোন জাহেল লোক সৎ কাজের আদেশ করার মনস্থ করে তখন শয়তান তো তাহার সাথে খেলা আরম্ভ করে। প্রায়ই দেখা যায় এমন ব্যক্তি ভাল করার চেয়ে মন্দই করে বেশী। অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় সে এমন সব কাজের বিরোধিতা করে যাহা শরীয়তমত করা জায়েয।

কখনও কখন তাহারা এমন সব কাজের প্রকাশ করিয়া দেয় যাহা রুদ্ধদ্বার কক্ষে অন্য লোকে করিয়া থাকে, অথবা দরজা ভাঙ্গিয়া এই প্রকার কর্মীদের উপর আক্রমণ করিয়া গালি দেয়। প্রতি উত্তরে সাধারণ একটি কথা বলিলেও তাহার নিকট অন্যায় মনে হয়। তখন সমস্ত ক্রোধ আল্লাহর জন্য না হইয়া নিজের জন্য হয়। সময়ে তাহারা এমন সব বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয় শরীয়ত যাহাকে গোপন রাখার নির্দেশ দিয়াছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল—কিছুসংখ্যক লোক তাম্বুরা এবং মদ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। ইমাম সাহেব বলিলেন—গোপন করিয়া রাখিয়া থাকিলে কিছু বলিওনা।

অন্য বর্ণনা মতে ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

মনে হয় কিছুটা প্রকাশ আর কিছুটা গোপন থাকা অবস্থায় ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ দিয়াছিলেন। যখন সম্পূর্ণরূপে গোপনাবস্থায় ছিল—তখন গোপনাবস্থায় রাখার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)এর নিকট বলিল—আমি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনিয়াছি। কিন্তু কোথায় বাজিতেছিল তাহা জানি না। ইমাম সাহেব বলিলেন—যাহা তোমার চোখের অন্তরালে সংঘটিত হয় ঐ জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত জাহেল লোক অন্যায়কারীদিগকে এমন ব্যক্তির নিকট লইয়া যায়, যাহারা অন্যায়কারীকে খুব উৎপীড়ন ও অত্যাচার করে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন—যখন তোমরা জানিবে যে, বিচারক শরীয়ত মতেই বিচার করেন তখন তোমরা অন্যায়কারীকে তাহার নিকট লইয়া যাইও।

এই সমস্ত অজ্ঞদের উপর শয়তান এইভাবে ধোকা দিয়া থাকে যে—তাহারা কোন অন্যায়কারীকে অন্যায় করা হইতে বিরত রাখার পর লোক সমাজে উহা প্রচার করিয়া আত্মপ্রশংসা কুড়ায় এবং অন্যায়কারীদের উপর ক্রোধ হইয়া গালাগালি করে। অথচ এই অন্যায়কারী তওবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু এই তাওবাহকারীগণ লজ্জিত হইয়া ঐ সমস্ত লোকদের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। আর এই জাহেল মুসলমানদের দোষ প্রকাশ করিয়া দেয়। অথচ মুসলমানের দোষ গোপন করা ওয়াজিব।

কোন কোন জাহেল লোক কোন বিষয়ে সুষ্ঠু প্রমাণ না পাইয়া শুধু ধারণার বশীভূত হইয়াই লোকের উপর অত্যাচার করে। এমন কি প্রহার করিয়া তাহাদের দেহ ক্ষত–বিক্ষত করিয়া দেয়। ইহা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কোন লোককে অন্যায় করিতে দেখিলে খুবই নম্রতার সাথে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন। সালাহ ইবনে উকাইম (রাযিঃ) কোন এক ব্যক্তিকে কোন একজন মহিলার সাথে নির্জনে কথা

বলিতে দেখিয়া বলিলেন—আল্লাহ তোমাদের উভয়কেই দেখিতেছেন। আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে পর্দা করিয়া দিন।

অন্য আর একবার তিনি খেলায় রত কিছু লোকের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন—ভাইসব! তোমরা এমন মুসাফির সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ কর—যে রাতভর ঘুমায় আর দিনভর খেলা করে। কখন সে তাহার সফর শেষ করিবে?

এক যুবক চমকিয়া উঠিয়া সাথীদিগকে বলিল—বন্ধুগণ! এই বুযুর্গ আমাদিগকে নসীহত করিতেছেন। অতঃপর তওবাহ করিয়া সেই যুবক বুযুর্গের সাথে চলিয়া গেল।

শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কোন কোন আবেদ অন্যায় কাজ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকেন এবং বলেন—প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার নাই। যে উপযুক্ত সে-ই নিষেধ করিবে। ইহা ভুল। কারণ, সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় করা হইতে প্রতিরোধ করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব। যদিও নিজে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে—তথাপিও। কিন্তু নিজে অন্যায় কাজ করা হইতে বিরত থাকিয়া অন্যকে নিষেধ করিলে উহা কার্যকরী বেশী হয়। নিজে অন্যায় করিলে অন্যকে উপদেশ দিলে কোন কাজই হয় না। তাই নিজে যাবতীয় অন্যায় করা হইতে অবশ্য বিরত থাকিবে।

জাহেদদের প্রতি ধোকা

কোন কোন সময় দেখা যায় জাহেল ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় দুনিয়ার নিন্দাবাদ শুনিয়া মনে করে বৈরাগ্য অবলম্বনেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে জানে না যে, দুনিয়া কি বস্তু। এই অবস্থায়ই শয়তান তাহাকে ধোকা দেয় যে—দুনিয়া ত্যাগ কর; মুক্তি পাইবে। তখন সে ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়া পাহাড়, পর্বত, বন-জঙ্গলে চলিয়া যায়; জুমআ, জমাআত, জ্ঞানার্জন ত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় হইয়া যায়। শয়তান তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দেয় যে, ইহাই প্রকৃত যোহদ বা দরবেশী। আর কেনই-বা সে বুঝিবে না? সে তো শুনিয়াছে যে, অমুক ব্যক্তি ঘর-সংসার ত্যাগ করতঃ নির্জন বন-জঙ্গলে সাধন-ভজন করিয়াই দরবেশ হইয়াছেন।

অধিকাংশ সময় এই জাহেলের স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ; মা থাকিলে পুত্রের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হয়। অথচ এই জাহেল নামাযের আরকান আহকামও জানে না। অনেক সময় ঋণের বোঝাও মাথায় চাপা থাকে। এলম কম তাই শয়তান তাহাকে আয়ত্বে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। যদি সে কোন বিজ্ঞ আলেমের সাহচর্য লাভ করিত তবে সে জানিতে পারিত যে, কি কি হক তাহার যিম্মায় রহিয়াছে এবং ইহাও জানিতে পারিত যে, দুনিয়া স্বয়ং দোষণীয় নয়। কারণ, যাহার প্রতি আল্লাহ মেহেরবান উহা কিভাবে নিন্দনীয় হইতে পারে? যে স্থানে মানুষকে অবশ্য বসবাস করিতে হইবে, যে পথে থাকিয়া মানুষ জ্ঞানার্জন ও ইবাদত-বন্দেগী করিবে, যে স্থানে আল্লাহর মসজিদ—উহা কিভাবে নিন্দনীয় হইতে পারে?

নিন্দনীয় শুধু ইহাই যে, প্রয়োজনের বাহিরে কোন কিছু গ্রহণ করা, অযথা ব্যয় করা ; শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করা। ইহাও তাহার জানা আবশ্যক যে—একা পাহাড় পর্বত বা বনে জঙ্গলে যাওয়া নিষেধ। কারণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা একা রাত কাটাইতে নিষেধ করিয়াছেন। জুমআ, জামাআত পরিত্যাগ করায় ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। এলম ও আলেমের সাহচর্য পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞতা বাড়িয়া যায়। পিতামাতাকে কষ্ট দিয়া কবীরা গুনাহর ভাগী হয়।

এখন রহিল অমুক অমুক ব্যক্তি সংসার বিরাগী হইয়া ইবাদত বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হয়ত তাহাদের পরিবার পরিজন এবং পিতামাতা ছিল না। অথবা কোন অনিবার্য কারণবশতঃ কোন স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। এমন কোন কারণ ব্যতীত গৃহত্যাগী হওয়া অন্যায়।

কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন—আমরা ইবাদত বন্দেগী করার জন্য পাহাড়ে চলিয়া গেলে সুফইয়ান সাওরী আমাদের নিকট গিয়া আমাদিগকে শহরে ফিরাইয়া লইয়া আসেন। শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যাহারা এলম শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া মন্দকে গ্রহণ করে। কারণ, দরবেশের কাজ তাহার দ্বার পর্যন্তই সীমিত থাকে। আর আলেমের কাজে লোক উপকৃত হয়।

দরবেশদিগকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে, মোবাহ অর্থাৎ নির্দোষ বস্তু পরিত্যাগ করাও দরবেশী। তাই কোন দরবেশের সঙ্গতি থাকা সত্বেও শুধু আটার রুটি অথবা ফলমূল খাইয়া দিন কাটায়। কেহ এত কম খায় যে, শরীর শুকাইয়া যায়। পশমী কম্বল পরিধান করিয়া দেহকে কষ্ট দেয়। ঠাণ্ডা পানি পর্যন্ত পান করে না। অথচ না ইহা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা, না সাহাবা কেরাম এবং তাবে তাবেঈন তরীকা। এই সমস্ত মহান বুযুর্গগণ আহার্যের সংস্থান করিতে না পারিলেই ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাংস খাইতেন এবং পছন্দও করিতেন। মোরগের মাংস খাইতেন, হালুয়া বা মিষ্টি জাতীয় খাদ্য খুব পছন্দ করিতেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করিতেন। কারণ, গরম পানি পাকস্থলীর পক্ষে ক্ষতিকারক এবং তৃষ্ণা মিটাইতে অক্ষম।

কোন কোন দরবেশ বলে—আমি হালুয়া খাই না। কারণ, উহার শুকরিয়া আদায় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন—এমন দরবেশ তো জাহেল। সে কি ঠাণ্ডা পানির শুকরিয়া আদায় করিতে পারে? হযরত সুফইয়ান সাওরী যখন সফরে থাকিতেন তখন তাহার দস্তরখানে ভুনা গোশত, মুরগীর গোশত এবং ফালুদা থাকিত।

অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নফস মানুষের যানবাহন, উহার সাথে কোমল ব্যবহার করিতে হইবে, যাতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছা যায়। উহার সংশোধনের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা দিতে হইবে এবং যাহা ক্ষতিকর উহা হইতে দূরে রাখিতে হইবে। যেমন পেট ভরিয়া খাওয়া, লোভ-লালসার বস্তু দেওয়া উহার পক্ষে ক্ষতিকর এবং ধর্মের পক্ষেও অনিষ্টকারক।

তাছাড়া মানুষ প্রকৃতিগত দিক হইতেও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। তাই আরববাসী যদি পশমী কাপড় পরিধান করিয়া এবং উটের দুধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে একজন বাঙ্গালী কি তাহা পারিবে? পক্ষান্তরে একজন আরবও ভাত মাছ খাইয়া এবং পাতলা কাপড় পরিধান করিয়া কখনও সুস্থ থাকিতে পারিবে না। আল্লাহ তাআলাই এই প্রকৃতিগত পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন। উহার বিরোধিতা

করিয়া মানুষ কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না।

যাহাদের শরীর দুর্বল অথবা যাহারা আরাম আয়েশে জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে আমরা নিষেধ করিব যে, তাহারা যেন ক্ষিপ্রতার সাথে এমন আহার্য গ্রহণ না করে। কারণ, ইহাতে তাহাদের শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সে অতি সাবধানতার সাথে পানাহারের পরিমাণ অল্প করার দিকে অগ্রসর হইবে। কোন্ বস্তু শরীরের হিতকর এবং কি ক্ষতিকর সেই সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকিতে হইবে।

কাহারও কাহারও ধারণা জীবন ধারনের জন্য শুকনা রুটিই তো যথেষ্ট। মনে করিলাম যথেষ্ট। কিন্তু অন্যদিক হইতে প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিকারকও বটে। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন উপাদানে মানবদেহ তৈয়ার করিয়াছেন এবং উহা রক্ষার্থে বিভিন্ন বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন শ্লেষ্মা শরীরের একটি উপাদান। উহা কম হইয়া গেলে দুধের প্রয়োজন। পিত্তরস আর অন্য একটি উপাদান। উহা বেশী হইলে টক খাইতে হয়।

সুতরাং যখন দেহের এই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তখন যদি কেহ উহা গ্রহণ না করে তবে দেহের ক্ষতিসাধন অসম্ভাবী। অন্যপক্ষে লোভ লালসার বস্তু হইতে আত্মাকে ফিরাইয়া রাখিলে ক্ষতির পরিবর্তে লাভই হয়। সুতরাং অতিরঞ্জিত কোন কিছু করাই ক্ষতিকারক।

ইবনে আকীল বলেন—ওহে সুফীগণ ! ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের রীতিনীতি সত্যই অদ্ভুত। তোমরা দুইটি বিষয়ের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছ। হয় তোমরা নফসের বশীভূত হইয়া রহিয়াছ, নয় খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত প্রবর্তন করিয়াছে।

শয়তান কোন কোন দরবেশের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে যে, আহার এবং পোশাক পরিচ্ছদে কৃচ্ছ্রতা সাধনের মধ্যেই দরবেশীর সফলতা নিহিত রহিয়াছে। তাই কোন কোন দরবেশ তাহাই করেন। অথচ তাহাদের অন্তর মান সম্মান এবং প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের আশায় সর্বদা উন্মুখ হইয়া থাকে। তাই দেখা যায়, নেতৃস্থানীয় এবং সম্পদশালী লোকদের দর্শন আশায় তাহারা প্রতিক্ষমান থাকে এবং গরীবদিগকে ঘৃণার চোখে দেখে। লোকের সম্মুখে তাহারা এমন বিনয় এবং ভঙ্গীর প্রকাশ করে যে, মনে হয় তাহারা যেন এইমাত্র

ইবাদত-বন্দেগী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিলেন।

তাহারা এই আশায়ই বসিয়া থাকে যে, লোক তাহাদের নিকট আসিবে, তাহার হাত চুম্বন করিবে এবং তাহাকে সম্মান দেখাইবে।

শয়তানের তালে পড়িয়া অনেক দরবেশ তাহাদের রিয়া গোপন করিয়া রাখে। প্রকাশ্য রিয়া সম্বন্ধে সে তো নিজেই অবগত। যেমন দেহের দুর্বলতা প্রকাশ করা, মুখমণ্ডলে মলিনতা প্রকাশ করা এবং মাথার চুল এলোমেলো ও রুক্ষ করিয়া রাখা। যাহাতে প্রথম দর্শনেই লোকে মনে করে যে, হযরত খুব ইবাদত বন্দেগী করেন। তেমনি আস্তে কথা বলা যাহাতে বিনয়তা প্রকাশ পায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যখন কোন আমলকারীর আমল শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে না হয় উহা আল্লাহ কবুল করেন না।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন—যে ব্যক্তির আমলের মধ্যে সততা না থাকে ; তাহাকে বলিয়া দাও যে, সে কেন অযথা কষ্ট করিতেছে। জানিয়া রাখ যে, মোমেন ব্যক্তি তাহার কাজ দ্বারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। শয়তান অতি গোপনে তাহার মধ্যে রিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়। শয়তানের চক্রান্ত হইতে নিরাপদে থাকা খুবই মুশকিল।

ইউসুফ ইবনে আসবাত বলেন—তোমরা কাজের শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা দেখ। আমি উহা বাইশ বৎসরে শিখিয়াছি।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন—সামআন নামক একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসীর নিকট আমি মারেফাত শিখিয়াছি। আমি একদিন তাহার উপাসনালয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

—সামআন ! তুমি কতদিন যাবত এই উপাসনালয়ে আছ?

—সত্তর বৎসর।

—তুমি কি খাও?

—ওহে হানাফী? তুমি কেন এইসব জিজ্ঞাসা করিতেছ?

—শুধু জানার আকাঙ্খা।

—প্রতি রাতে একটি করিয়া ছোলা মাত্র !

—এমন কি বস্তু তোমাকে উৎসাহ যোগায় যে তুমি মাত্র একটি ছোলা খাইয়া দিন কাটাও।

—ঐ যে গ্রাম দেখিতেছ ; উহার অধিবাসীরা বৎসরে একবার আমার উপাসনা গৃহ সজ্জিত করিয়া তওয়াফ করিয়া আমাকে সম্মান দেখায়। যখনই আমার মন ইবাদতের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে তখনই আমি এই দিনটির কথা স্মরণ করিয়া সেই অসহ্য কষ্টকেও সহ্য করিয়া থাকি। হে হানাফী ! তোমার কর্তব্য চিরস্থায়ী সম্মানের জন্য কষ্ট করা।

ইবরাহীম আদহাম বলেন—তাহার কথায় আমার অন্তরে মারেফাত বাসা বাঁধিল। সাধু আমাকে বলিল—ইহার চেয়ে অধিক কিছু দেখিতে চাহিলে উপাসনা গৃহের নিচে গিয়া দাঁড়াও। আমি নিচে গিয়া দাঁড়াইলে সাধু একটি থলে রশিতে লটকাইয়া আমাকে দিল। এবং বলিল—উহা লইয়া ঐ গ্রামে যাও। উহারা দেখিয়াছে আমি তোমাকে কি দিয়াছি।

আমি থলেটি খুলিয়া দেখিলাম—উহাতে বিশটি ছোলা। আমি ছোলা কয়টি লইয়া উক্ত গ্রামে গেলাম। গ্রামবাসী জিজ্ঞাসা করিল—বাবা তোমাকে কি দিয়াছেন ?

আমি বলিলাম—বিশটি ছোলা।

তাহারা বলিল—ওহে হানাফী ! উহা তোমার কোন কাজেই আসিবে না। আমাদিগকে দাও।

তাহারা উহা বিশটি দেরহাম দিয়া খরিদ করিয়া রাখিল। আমি পুনরায় সাধুর নিকট আসিলে সে বলিল—তুমি ভুল করিয়াছ। তুমি উহার দাম বিশ হাজার দেরহাম চাইলেও তাহারা দিত। ওহে হানাফী ! এখন চিন্তা করিয়া দেখ—যে আল্লাহর ইবাদত করে না ইহা তাহার ইজ্জত। আর যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থে ইবাদত বন্দেগী করে তাহার সম্মান কি হইবে ?

গ্রন্থকার বলেন—এই রিয়ার ভয়েই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাহাদের ইবাদত বন্দেগী গোপন করিয়া রাখিতেন যেন উহা বিফল না হয়। এবং এমন কাজ করিতেন যাহাতে লোকে তাহাদের ইবাদত বন্দেগীর পরিমাণ জানিতে না পারে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) দিনের বেলা লোকের সম্মুখে খুব হাসিতেন কিন্তু রাতের অন্ধকারে নির্জনে বসিয়া কাঁদিতেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম অসুস্থ হইলে এমন সব বস্তু শিয়রে রাখিতেন যাহা সুস্থ লোকের আহার্য।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন—এক ব্যক্তি তাহার যুগের শ্রেষ্ঠ অলীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। বহু দূর দূরান্ত হইতে লোক তাহার দর্শনে আসিত এবং তাহাকে খুব সম্মান করিত।

একদিন তিনি তাহার দর্শকদের সমাবেশে বলিলেন—আমি রিয়া এবং অহংকারের ভয়ে লোক ও লোকসমাজকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু ধনশালীর ধনসম্পদ তাহাকে যত ক্ষতি না করে আজকাল ইবাদতকারীর ইবাদত তাহাকে উহার চেয়ে অধিক ক্ষতিসাধন করে। আমাদের প্রত্যেকেই ইহা চায় যে—তাহার দ্বীনদারীর জন্য তাহার প্রয়োজন সমাধা করিয়া দেওয়া হউক, কোন জিনিস ক্রয় করিতে গেলে লোকে যেন তাহার নিকট হইতে দাম কম নেয় ; এবং যে কেহ তাহার সাথে সাক্ষাত করিতে আসুক সে যেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করে।

তাহার এই কথা বাদশাহর কান পর্যন্ত পৌছিলে বাদশাহ তাহাকে সালাম করার জন্য রাজধানী হইতে দরবেশের আস্তানার দিকে রওয়ানা হইলেন।

দরবেশ এই সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন এবং খাদেমকে বলিলেন—খাবার কিছু থাকিলে আন।

খাদেম কিছু ফলমূল আনিয়া দিল। তিনি খাওয়া আরম্ভ করিলেন। অথচ তিনি সারা বৎসর রোযা রাখিতেন।

ইত্যবসরে বাদশাহ আসিয়া তাহাকে সালাম করিলেন। তিনি নিম্নস্বরে সালামের উত্তর দিয়া খাওয়ায় মনোনিবেশ করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই দরবেশ কোথায়? কেহ উত্তর করিল—এখানেই আছেন।

বাদশাহ বলিলেন—যিনি খাইতেছেন? উত্তর পাইলেন—জ্বি হাঁ।

বাদশাহ বলিলেন—তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তেমন কিছু তো দেখিতে পাইলাম না। এই বলিয়া বাদশাহ ফিরিয়া চলিয়া গেলেন।

দরবেশ বলিলেন—আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, তিনি তোমাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

ইবনে আতা বলেন—খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ইয়াযীদ ইবনে মারসাদকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করার মনস্থ করেন। ইয়াযীদ এই সংবাদ পাইয়া উল্টা জামা পরিধান করিলেন, হাতে এক গুচ্ছ রুটি এবং মাংস লইয়া খালি পায়, খালি মাথায় বাজারে গিয়া

হাটিতে হাটিতে সেই রুটি খাইতে লাগিলেন।

খলীফা ওয়ালীদের নিকট সংবাদ গেল ইয়াযীদ ইবনে মারসা পাগলপ্রায় হইয়া গিয়াছে। খলীফা তাহাকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত কর হইতে বিরত রহিলেন।

দাউদ ইবনে আবু হিন্দ একাদিক্রমে বিশ বৎসর পর্যন্ত রোযা রাখিয়াছিলেন। অথচ তাহার বাড়ীর লোক জানিতে পারে নাই। তিনি বাড়ী হইতে খাওয়ার লইয়া বাজারে যাইতেন এবং পথিমধ্যে দান করিয়া দিতেন। বাড়ীর লোক জানিত তিনি বাজারে গিয়া খান। আবার বাজারের লোক জানিত তিনি বাড়ী হইতে খাইয়া বাজারে আসেন।

আল্লাহর অলীদের ইহাই ছিল ইবাদত বন্দেগীর ধারা।

কোন কোন দরবেশ বাড়ীঘর ছাড়িয়া মসজিদ অথবা অন্য কোন নির্জন স্থানে পড়িয়া থাকেন। লোকে তাহাকে সংসার ত্যাগী হিসাবে জানুক ইহা প্রচার হওয়া তাহার নিকট অতি প্রিয়। আবার কোন কোন দরবেশ হাট–বাজার অথবা লোক সমাবেশে যাওয়া পরিত্যাগ করেন। কারণ স্বরূপ বলেন—যাহা কিছু দর্শন করা শরীয়ত মত নিষিদ্ধ উহা যাহাতে আমার চোখের সামনে না পড়ে তজ্জন্য আমি হাট বাজার বা লোকসমাজে যাই না। কিন্তু ইহার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে। যেমন আত্মগর্ব এবং লোককে ছোট মনে করা, অথবা লোকে তাহার সম্মুখে বেআদবী করিতে পারে অথবা লোকের সাথে মেলামেশা করিলে তাহার দাম কমিয়া যাইতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অধিকাংশ সময় এই উদ্দেশ্য থাকে যে, এই জাহেল আবেদের দোষাবলী এবং অজ্ঞতা জনসাধারণের নিকট গোপন থাকুক। তাই লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই দরবেশের আকাঙ্খা থাকে লোক তাহার দর্শনে আসুক ও সে কাহারও দর্শনে যাইবে না। নেতৃস্থানীয় লোক আসিলে খুব খুশী হয় এবং জনসাধারণ যখন তাহার দ্বারপ্রান্তে সমবেত হয় এবং তাহার হাত চুম্বন করে তখন সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়।

সে কোন রুগ্ন ব্যক্তির রোগশয্যার নিকট যায় না এবং কাহারও জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করে না। তাহার পাণ্ডার দল বলে—আমাদের পীর সাহেবের নীতি কোথাও না যাওয়া। কি সুন্দর শরীয়ত বিরোধী নীতি।

এই জাতীয় দরবেশের কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে এবং ঘটনাক্রমে যদি আনিয়া দেওয়ার লোক না থাকে তবে সে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকে। জনসাধারণের সাথে মেলামেশা হইলে সম্মানের লাঘব হইবে এই ভয়ে সে প্রয়োজনের তাকীদেও ঘর হইতে বাহির হয় না। অথচ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে যাইতেন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন ; নিজের হাতে উহা বহন করিয়া আনিতেন। এমন কি প্রতিবেশীর দরকারী বস্তুও বাজার হইতে আনিয়া দিতেন।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। নিজের কাপড়ের গাঠুরি কাঁধে করিয়া বাজারে যাইতেন, কাপড় ক্রয় বিক্রয় করিতেন আবার কাঁধে করিয়া বাড়ী ফিরিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা বলেন—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযিঃ)কে লোকে লাকড়ির বোঝা বহন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হযরত! আপনার অবস্থা তো সচ্ছল তথাপি বোঝা বহন করিতেছেন? তিনি বলিতেন—আমি এই পন্থায় নফসের গর্বকে চুরমার করিয়া দিতে চাই।

তিনি আরও বলিতেন—আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি—

لا يدخل الجنة عبد فيه مثقال ذرة من كبر –

'যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার থাকিবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।'

কোন কোন দরবেশকে যদি কোমল কাপড় পরিধান করিতে বলা হয় তবে তাহারা তাহাদের দরবেশীর ক্ষতি হইতে পারে এই ভয়ে কোমল কাপড় পরিধান করিতে অস্বীকার করেন। বাহিরে লোকের সামনে পানাহার করা হইতে বিরত থাকেন লোকসমক্ষে কখনও হাসেন না। অথচ ইহা রিয়াকারী। কারণ, শয়তান তাহাকে ধোকা দেয় যে, ইহাও মানুষকে সংশোধন করার একটি পথ। এমন দরবেশ লোকের সামনে মাথা নোয়াইয়া বসিয়া থাকে, সর্বক্ষণ তাহার মুখমণ্ডলে চিন্তা ভাবনার রেখা ফুটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে নির্জনে দেখিলে দেখা যাইবে সে বনের বাঘ।

কোন কোন দরবেশ ছেড়াফাটা কাপড় পরিধান করে ; সেলাই করেন না। পাগড়ী ঠিক করিয়া বাধেন না. দাড়ি এলোমেলো করিয়া রাখেন। লোকে মনে করে তাহার নিকট এই কাপড় ব্যতীত আর অন্য কোন পোশাক পরিচ্ছদ নাই। ইহাও রিয়া। কারণ, লোকে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া মনে করে ইবাদত–বন্দেগীতে মশগুল থাকার দরুনই তিনি এই সমস্তের প্রতি খেয়াল করিতে পারেন না। ইহা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সাহাবাদের নীতি ছিল না।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় তৈল দিতেন, চুল দাড়ি আঁচড়াইতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। অথচ তাহার চেয়ে কেহ বেশী ইবাদত বন্দেগী করিতেন না। হযরত আব বকর এবং ওমর (রাযিঃ) দাড়িতে রং লাগাইতেন। অথচ তাহারা সকল সাহাবাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করিতেন এবং দরবেশ ছিলেন। তাহাদের চেয়ে বেশী শ্রেষ্ঠত্বের দাবী যে করে তাহার দিকে ফিরিয়া চাওয়াও উচিত নয়।

কোন কোন দরবেশ সর্বক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন এবং পরিবার পরিজনের সাথে মেলামেশা করা হইতে বিরত থাকেন। দরবেশ তাহার এই জঘন্য ব্যবহার দ্বারা সকলকে কষ্ট দিয়া থাকেন এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ভুলিয়া যায় যে—'তোমার উপর তোমার পরিবার পরিজনের হক রহিয়াছে।' হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যমুখে লোকের সাথে কথা বলিতেন, হযরত আয়েশার সাথে দৌড়াইতেন। এক কথায় মানবসুলভ প্রত্যেকটি কাজই তিনি করিতেন।

আর এই জাহেল দরবেশকে দেখ যে তাহার স্ত্রীকে নিজে জীবিত থাকিতেই বিধবা করিয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে ইয়াতীম করিয়াছে। তাহাদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। এবং নির্জনতা অবলম্বন করিয়াছে যে এই সমস্ত কাজ তাহাকে পরকালের পথে বাধা দিতেছে। অথচ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবের (রাযিঃ)কে বলিয়াছিলেন—তুমি কেন কুমারী মেয়ে বিবাহ করিলে না? যদি করিতে তবে সে তোমার সাথে খেলা করিত আর তুমি তাহার সাথে খেলা করিতে।

অধিকাংশ সময় এই সমস্ত বানাওয়াট দরবেশদের দেহের রসকষ শুকাইয়া যায়। যাহার ফলে সে স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করে। অথচ স্ত্রীর হক আদায় করা ফরয। নফল রক্ষা করিতে গিয়া ফরয নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে কি কখনও পুণ্য লাভ হয়?

কোন কোন দরবেশ নিজের কেরামত প্রকাশ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। মনে করে যে—সে প্রবাহিত নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারে। কোন সময় দোআ করিলে যদি কবুল না হয়, তবে সে মনক্ষুন্ন হয়। মনে হয় সে যেন শ্রমিক ছিল আর তাহার পারিশ্রমিক না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইল।

তাহার জ্ঞান থাকিলে সে বুঝিতে পারিত যে, সে তো একজন ক্রীতদাস আর ক্রীতদাস নিজের খেদমতের পরিবর্তে কোন কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না। যদি বুঝিতে পারে যে, সে সৎকাজ করিতে সমর্থ তবে তাহার পক্ষে শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব।

শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কোন কোন জাহেল দরবেশ নিজ মতের প্রাধান্য দিতে গিয়া ফকীহদের মতবাদকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

ইবনে আকীল (রহঃ) বলেন—আবু ইসহাক খাযযাযের নিকট আমি প্রথমে কুরআন শরীফ শিক্ষা করি। তাহার নিয়ম ছিল রমযান মাসে কাহারও সাথে কথা বলিতেন না। প্রয়োজন বোধে কুরআন শরীফের আয়াত পাঠ করিয়া অন্যকে বুঝাইয়া দিতেন। যেমন কাহাকেও তাহার নিকট আসিতে বলিলে বলিতেন—

ادخلوا عليهم الباب

হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা এই দ্বার পথে কাফেরদের নিকট পৌছ।

তরিতরকারী খরিদ করার প্রয়োজন হইলে ছেলেকে বলিতেন—

من بقلها و قثائها

যমীনের শাক সবজি ইত্যাদি।

একদিন আমি শায়খকে বলিলাম—আপনি ইহাকে পুণ্যের কাজ মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাতে পাপ হয়।

আমার কথায় ওস্তাদজী মনক্ষুন্ন হইলে আমি বলিলাম—কুরআন শরীফ আহকামে শরীয়ত বর্ণনা করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা দুনিয়ার কাজে লাগানো খুবই খারাপ।

ওস্তাদজী আমাকে খুব মন্দ বলিলেন এবং আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না।

গ্রন্থকার বলেন—অল্পবিদ্যার অধিকারী দরবেশ কখনও কখন নিজের ইচ্ছামত ফতওয়া দিয়া থাকেন। আবু হাকীম ইবরাহীম ইবনে দীনার ফকহী বলেন—আমার নিকট ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হইল যে—তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সন্তান প্রসব করার পর ঐ স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি না?

আমি বলিলাম—না।

আমার পাশে উপবিষ্ট প্রসিদ্ধ দরবেশ শরীফ দাহালী বলিলেন—না! তালাক দেওয়া স্বামীর জন্য হালাল হইবে। আমি বলিলাম—কোন আলেম তো এই ফতওয়া দিবেন না।

দরবেশ দাহালী বলিলেন—খোদার কসম। আমি তো এখান হইতে বসরা পর্যন্ত এই ফতওয়াই দিয়া আসিতেছি।

শয়তানের ধোকায় পড়িয়া কোন কোন জাহেল দরবেশ আলেমদিগকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং তাহাদিগকে মন্দ বলে। তাহারা বলে যে এলমের উদ্দেশ্য আমল করা। কিন্তু তাহারা একথা বুঝিতে পারে না যে এলম অন্তরের নূর। যদি এই অজ্ঞ দরবেশগণ আলেমদের মরতবা বুঝিতে পারিত যে আল্লাহ তাআলা এই আলেমদের দ্বারাই তাঁহার শরীয়তের হেফাযত করিতেছেন এবং ইহা আম্বিয়া (আঃ)দের মরতবা তবে তাহারা আলেমদের সামনে মাথা ঝুকাইয়া দিত। আলেমগণ পথপ্রদর্শক সমস্ত লোক তাহাদের অনুসারী।

মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত সাহল ইবনে সাআদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—খোদার কসম! তোমার দ্বারা যদি একটি লোকও হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় তবে তোমার জন্য উহা লাল উটের এটি দল হইতেও উৎকৃষ্টতর হইবে।

এই দরবেশগণ যেই সমস্ত বিষয়ে আলেমদিগকে দোষারোপ করিয়া থাকে উহার মধ্যে একটি এই যে—আলেমগণ মোবাহ বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা মোবাহ বস্তু শক্তি অর্জনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাতে তাহারা সুষ্ঠুভাবে অন্যকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ আলেমগণ টাকা পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাই অজ্ঞ দরবেশগণ তাহাদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এই দরবেশ সম্প্রদায় যদি মোবাহ শব্দের অর্থ বুঝিত তবে তাহারা দোষারোপ করিত না। অবশ্য যে সঞ্চয় না করে সে ভাল। যে ব্যক্তি ফরয নামায আদায় করিয়া শুইয়া থাকে সেই ব্যক্তিকে কি ঐ ব্যক্তি নিন্দা করিতে পারে যে ফরয আদায়ের পরও নফল নামায আদায় করিতে থাকে?

আবু আবদুল্লাহ খাওয়াস বলেন—আমরা তিনশত বিশজন লোক হাতেম আসামের সাথে 'রে' পৌছিলাম। সকলেই ছিলাম হজ্জযাত্রী। সকলের পরিধানেই পশমী কাপড়। কাহারও নিকট পানাহারের কোন কিছু ছিল না।

একজন সওদাগর আমাদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। পরের দিন সকালে সওদাগর বলিলেন—ওহে আবু আবদুর রহমান! আপনাদের কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? আমাদের ফকীহ অসুস্থ! আমি তাহাকে দেখিতে যাইব।

হাতেম বলিলেন—তোমাদের অসুস্থ ফকীহকে দেখিতে আমিও যাইব। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া পুণ্যের কাজ।

অসুস্থ মুহাম্মদ ইবনে মাকাতিল 'রে'র কাযী ছিলেন। হাতেম কাযীর দ্বারপ্রান্তে দারওয়ান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে একজন আলেমের দ্বারে দারওয়ান? তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বাড়ী-ঘর খুব ফিটফাট, সাজানো গোছানো এবং মূল্যবান ফরাশ বিছানো রহিয়াছে। হাতেম বিস্ময়ভরা নেত্রে সবকিছু দেখিতে লাগিলেন। কাযীকে মূল্যবান বিছানায় শায়িত এবং আশে পাশে খাদেমদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

কাযী সাহেব তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি বলিলেন—আমি বসিব না। আপনার নিকট একটি প্রশ্ন করিতে চাই।

কাযী—বলুন।

হাতেম—আপনি উঠিয়া বসুন তারপর জিজ্ঞাসা করিব।

কাযী সাহেব খাদেমদের সাহায্যে বালিশে হেলান দিয়া বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—আপনি কাহার নিকট এলম শিখিয়াছেন?

—বুযুর্গ আলেম ও ইমামদের নিকট।

—তাহারা কাহার নিকট শিখিয়াছেন?

—তাবেয়ীদের নিকট।

—তাহারা?

—সাহাবাদের নিকট।

—সাহাবাগণ?

—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট।

—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহার নিকট শিখিয়াছেন?

—হযরত জিবরাঈল (আঃ)এর নিকট।

—জিবরাঈল (আঃ)?

—আল্লাহর নিকট।

হাতেম আসেম বলিলেন—এই এলম যাহা আল্লাহ তাআলা হইতে বিভিন্ন স্তরের মারফত তোমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহা দ্বারা তোমার কি কাজ হইয়াছে? পৃথিবীতে যাহার বাড়ী সবার বাড়ীর চেয়ে সুন্দর যাহার বিছানা সকলের বিছানার চেয়ে নরম তাহার মর্যাদা কি আল্লাহর নিকট বেশী?

কাযী সাহেব বলিলেন—না।

হাতেম বলিলেন—তবে তোমার অভিমত কি?

কাযী বলিলেন—যে সংসার বিরাগী; পরকালের প্রতি আসক্ত এবং পরকালের পুঁজি মৃত্যুর আগে পাঠাইয়া দেয় সেই ব্যক্তিই আল্লাহর অধিক প্রিয়।

হাতেম—তবে তুমি কাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছ? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম; তাবেঈন না ফেরআউন ও নমরুদের? যে নমরুদ ও ফেরআউন সর্বপ্রথম পৃথিবীতে ইট-পাথরের ঘর তৈয়ার করিয়াছে। হে আলেমগণ! তোমাদের দেখাদেখি দুনিয়ার

জাহেল লোকগণ দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। তাহারা তো এই কথাই বলিবে যে আলেমগণ যখন এরূপ তবে আমরা হইব না কেন?

ইহার পর মুহাম্মদ ইবনে মাক্বাতিল আরও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

হাতেম আসেম জানিতে পারিলেন যে—কাযবীনের মুহাম্মদ ইবনে উবাইদের নিকট গিয়া বলিলেন—'আল্লাহ্ আপনার প্রতি মেহেরবান হউন।' আমি একজন অনারব। নামাযের কুঞ্জি অযূ কিভাবে করিতে হয় আমাকে শিখাইয়া দিন।

ইবনে উবাইদ প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করিয়া ধৌত করতঃ বলিলেন—এইভাবে অযু করিতে হয়।

হাতেম বলিলেন—আমি আপনার সম্মুখে অযু করিতেছি; দেখুন আমার অযু ঠিক হয় কিনা। এই কথা বলিয়াই তিনি অযু করিতে আরম্ভ করিলেন। হাত ধোয়ার সময় তিন বারের পরিবর্তে চারি বার ধৌত করিতেই ইবনে উবাইদ বলিলেন—তিন বারের পরিবর্তে চারি বার ধুইয়া আপনি অতিরিক্ত কাজ করিলেন। ইহা শরীয়ত বিরোধী।

হাতেম বলিলেন—সোবহান আল্লাহ। আমি এক হাত ধুইয়া অতিরিক্ত কাজ করিলাম আর আপনি যে বাড়ীঘর ও বিষয় সম্পত্তি করিয়াছেন—উহাতে কি অতিরঞ্জিত কিছু করেন নাই?

ইবনে উবাইদ বুঝিতে পারিলেন—তাহাকে সতর্ক করার জন্যই হাতেমের আগমন। তাই তিনি আর কোন কথাবার্তা না বলিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর লোক সম্মুখে বাহির হইলেন না।

অতঃপর হাতেম মদীনা শরীফ গিয়া লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে গিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিব।

লোকে বলিল—নবীজীর কোন প্রাসাদ ছিল না। তিনি একটি কাঁচা বাড়ীতে থাকিতেন।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার পরিবার পরিজন অথবা সাহাবাদের অট্টালিকা কোথায়?

লোকে বলিলেন—তাহারাও কাঁচা বাড়ীতে থাকিতেন।

হাতেম বলিলেন—তবে তো ইহা ফেরআউনের শহর।

লোকে এই কথা শুনিয়া তাহাকে গালাগালি করিল এবং বিচারকের নিকট ধরিয়া লইয়া গেল। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এমন কথা কেন বলিলে?

হাতেম বলিলেন—হে ন্যায়পরায়ণ বিচারক! আমি একজন বিদেশী। এই শহরে প্রবেশ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলিল—ইহা রাসূলুল্লাহর শহর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাহার সাহাবাদের প্রাসাদ কোথায়? লোকে বলিল—তাহাদের অট্টালিকা ছিল না, বরং তাহারা কাঁচা বাড়ীতে বসবাস করিতেন। আমি কুরআন মজীদে শুনিয়াছি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

'রাসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্যেই তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।'

সুতরাং আপনিই বলুন আপনারা কাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহর, তাহার সাহাবাদের, না ফেরআউনের?

গ্রন্থকার বলেন—এই জাহেল শ্রেণীর দরবেশগণ আলেম সমাজের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করে উহা সত্যই পরিতাপের বিষয়। ইহারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিকেই শ্রেয় মনে করে। কেননা, হাতেম আসেম প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে বিষয়কে অস্বীকার করিয়া গিয়াছে উহা মোবাহ! মোবাহকে শরীয়ত স্বীকৃতি দিয়াছে। যে বিষয়ে শরীয়ত স্বীকৃতি দিয়াছে—উহা সম্বন্ধে আযাব বা শাস্তি হইবে না। চিন্তার বিষয় অজ্ঞতা কত খারাপ জিনিস।

হাঁ হাতেম যদি ঐ সমস্ত আলেমকে এতটা বলিতেন যে, বন্ধুগণ! তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার চেয়ে কম করিলে কি চলিত না। কারণ, জনসাধারণ তো তোমাদেরই অনুসরণ করিবে। হাতেমের পক্ষে এই কথা বলাই যথাযথ ছিল।

দেখ! যদি এই দরবেশ শুনিতেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে

আউফ এবং যোবায়ের ইবনে মাসউদ মৃত্যুর সময় বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তবে তিনি কি বলিতেন?

হযরত তামীমুদ্দারী (রাযিঃ)এর হাজার দেরহাম দ্বারা একটি জামা খরিদ করিয়াছিলেন এবং উহা পরিধান করিয়া রাতের নামায আদায় করিতেন।

দরবেশদের উচিত আলেমদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা। আর যদি না শিখে তবে চুপ করিয়া থাকা।

মালেক ইবনে দীনার বলেন—জাহেল দরবেশদের সাথে শয়তান এমনভাবে খেলা করে যেমন বালকগণ আখরোট দ্বারা খেলা করে। হাবীব আযমী বলেন—শয়তান অজ্ঞ দরবেশদের সাথে এমনভাবে খেলা করে যেমন বালক-বালিকা আখরোট দ্বারা খেলা করে।

সুফীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

সুফী সম্প্রদায় ও দরবেশদেরই একটি শাখা। দরবেশদের সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কিছু বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দরবেশদের হইতে সূফী সম্প্রদায় কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য। তাহারা কোন কোন বিষয় নিজেদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। আমরা ঐ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করিব।

তাছাউফ প্রথমে যুহদে কুল্লিয়া অর্থাৎ দরবেশীর সমস্ত স্তরকেই বুঝাইত। অতঃপর যাহারা তাছাউফের সাথে সম্পর্কে যুক্ত তাহারা গান ও নর্দন-কুর্দনের অনুমতি দিল। তখন পরকালের প্রতি আসক্ত জনসাধারণ উহার প্রতি ঝুকিয়া পড়িল। কারণ, ইহারা বৈরাগ্য প্রকাশ করায় দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিগণও ঝুঁকিয়া পড়িল। অতঃপর তাহারা আরাম-আয়েশের প্রতি খেয়াল করিল। তাই তাহাদের প্রতি শয়তানের চক্রান্তের কথা বর্ণনা করা কর্তব্য। ইহার আসল ও নকল সম্বন্ধে বর্ণনা করার পরই এই সম্বন্ধে আলোচনা করা সহজসাধ্য হইবে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাহারা ইসলাম ও ঈমানে বিশ্বাসী ছিলেন তাহাদিগকে মুসলমান অথবা মোমেন বলা হইত। তারপর যাহেদ আবেদ ইত্যাদি নামের প্রচলন হইতে থাকে। তারপর কিছুসংখ্যক লোক ইবাদত বন্দেগী করার জন্য সংসার ত্যাগ করতঃ নির্জনতা অবলম্বন করিল। ইহারা নিজেদের জন্য বিশেষ বিশেষ এমন

সব কাজ নির্ধারিত করিয়াছিল—যাহা অন্য সম্প্রদায়ে পাওয়া যাইত না।

তাহারা দেখিল কাবার খেদমতের জন্য সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল তাহার উপাধি ছিল সূফা। নাম ছিল গাওস ইবনে মাররা। পরবর্তীকালে সংসারত্যাগী সূফী সম্প্রদায় সূফার নামানুসারে নিজেদের সম্প্রদায়ের নাম রাখিল সূফিয়া।

আবূ সাঈদ আল হাফেয বলেন—আমি ওয়ালিদ ইবনে আবুল কাসেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—এই সূফী নামের তাৎপর্য কি?

তিনি বলিলেন—জাহেলিয়াতের যুগে একটি সম্প্রদায়কে সূফী বলা হইত। ইহারা আল্লাহর নামে সংসার বিরাগী ছিল এবং কাবার পার্শ্বে থাকিত। যে কেহ তাহাদের মতাবলম্বী হইত তাহাকেই সুফিয়া বলা হইত।

আবদুল গনী বলেন—তামীম ইবনে মাররার ভাই গাউস ইবনে মাররার বংশধরকে সূফা বলা হইত।

যোবায়ের ইবনে বুকার বলেন—আরাফায় লোকদিগকে হজ্জ করার অনুমতি দেওয়ার অধিকার ছিল গাওস ইবনে মাররা এবং তাহার বংশধরের। লোক ইহাদিগকে সূফা বলিত।

ইবনুস সায়েব কালবী (রহঃ) বলেন—গাউস ইবনে মাররার মায়ের সন্তানাদি বাঁচিত না। তাহার মা মানত করিল—যদি আমার সন্তান জীবিত থাকে তবে তাহার মাথায় পশম (সূফ) বাধিয়া কাবার খেদমতের জন্য নিয়োগ করিব। গাউসকে তাহার মা কাবার খেদমতের জন্য নিয়োজিত করিল। তাহার উপাধি পড়িয়া গেল সূফা। পরবর্তীকালে তাহার বংশধরও এই নামে পরিচিত হইল।

হযরত হাসান (রহঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কিছু নিঃস্ব মুসলমানের জন্য মসজিদে নববীর সাথে একটি বারান্দা (সূফ) করিয়া দেন। অন্যান্য মুসলমান তাহাদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী তাহাদের পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট তাশরীফ আনিতেন এবং বলিতেন—

السلام عليكم يا اهل الصفه -

হে সুফফাবাসী তোমাদিগকে সালাম।

তাহারা বলিতেন—

و عليك السلام يا رسول الله

হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

তারপর নবীজী ইরশাদ করিতেন—

كيف اصبحتم

কিভাবে তোমাদের প্রভাত হইল?

তাহারা উত্তর দিতেন—হে রাসূলাল্লাহ! মঙ্গলমতই আমাদের রাত অতিবাহিত হইয়াছে।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলেন—আমিও একজন সুফফাবাসী ছিলাম। আমরা সন্ধ্যার সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতাম। নবীজীর নির্দেশমত এক একজন সাহাবা আমাদের এক একজনকে সাথে করিয়া লইয়া যাইতেন। দশ বারজন যাহা অবশিষ্ট থাকিতাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলকে রাতের খাওয়া দিতেন। খাওয়া শেষ হইলে ইরশাদ করিতেন—যাও, মসজিদে গিয়া শুইয়া থাক।

গ্রন্থকার বলেন—ইহারা প্রয়োজনবোধে মসজিদে থাকিতেন এবং সদকার দান খাইতেন। তারপর আল্লাহ তাআলা যখন বিভিন্ন দেশ জয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের অবস্থান সচ্ছল করিয়া দেন তখন তাহারা মসজিদ ছাড়িয়া চলিয়া যান।

কিন্তু আহলে সুফফার সাথে সম্পর্কযুক্ত করিয়া কোন সম্প্রদায়কে সূফী বলা ভুল হইবে। যদি তাহাই হইত তবে সুফা বলা হইত।

সওফ–এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করিয়া যে সুফী নাম রাখা হইয়াছে উহাই শুদ্ধ। আর সুফার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত আরও শুদ্ধ। ইহারা সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন। একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিতেন। অতঃপর শয়তান ক্রমান্বয়ে এই সুফী সম্প্রদায়কে নানাভাবে বিপথগামী করিতে থাকে। অবশেষে তাহাদের উপর পূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

প্রথমতঃ তাহাদিগকে জ্ঞানার্জন করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

তাহাদিগকে বুঝাইয়াছে আমলই আসল উদ্দেশ্য। জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত হইয়া ইহারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া যায়। আবার কাহারও মাথায় ইহা প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে যে—সংসার বিরাগী হওয়ার মধ্যেই মুক্তি নিহিত। ফলে তাহারা এমন সব বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে যাহা তাহাদের শক্তি সামর্থ অটুট থাকিতে সাহায্য করিত। ইহারা ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা হারাম মনে করে। অথচ ধনসম্পত্তি প্রয়োজন সমাধা করার জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। পরিতাপের বিষয় যে, তাহাদের উদ্দেশ্য সৎ হইলেও পন্থা শরীয়তবিরোধী।

সূফী তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু লোক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবু নসর সেরাজ 'লামউস সুফিয়া' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে আজেবাজে কথা এবং বাজে আকীদা সম্বন্ধে বহু কিছু লিখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পরে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

আবু তালেব মক্কীও 'কুওয়াতুল কুলুব' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহাতে আজে বাজে আকীদা ব্যতীতও সনদবিহীন বহু মউযু হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কিতাবে কোন কোন সূফীর বর্ণনা দিয়াছেন যে আল্লাহ তাআলা আওলিয়াদিগকে এই পৃথিবীতেই তাহার জালওয়াহ দেখান।

মুহাম্মদ ইবনে তাহের মুকাদ্দসী সূফীদের জন্য একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি উহাতে এমন সব কথা লিখিয়াছেন যাহা পড়িতে এবং শুনিতে জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই লজ্জিত হন। প্রয়োজন বোধে আমরা উহার কিছু কিছু বর্ণনা করিব।

ইমাম গাযযালী সূফীদের তরীকার উপর যে এহইয়াউল উলূম গ্রন্থ লিখিয়াছেন—উহা বাজে হাদীসে পরিপূর্ণ। তিনি উহাতে লিখিয়াছেন—হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে চাঁদ, সূর্য এবং তারকা দেখিয়াছিলেন—উহা বাস্তব চাঁদ সূর্য নয় বরং উহা নূর যাহা মহান আল্লাহর পর্দার অন্তরালে অবস্থিত। ইহা বাতেনিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা।

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, সূফীগণ জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতা এবং আম্বিয়াদের আত্মা দর্শন করে, তাহাদের শব্দ শোনে এবং উহা হইতে উপকৃত হয়।

গ্রন্থকার বলেন—তাহাদের এই সমস্ত লেখার কারণ এই যে, তাহারা ইসলাম এবং সুন্নত সম্পর্কে খুব কম জ্ঞান রাখেন এবং সূফীদের তরীকা ভাল মনে হওয়ায় উহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের এই রীতিনীতি ভাল লাগার কারণ এই যে, বৈরাগ্যের সৌন্দর্য অন্তরে বসিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রকাশ্য অবস্থা এবং কথাবার্তার চেয়ে অন্য কোন কিছুই তাহারা ভাল চোখে দেখে না।

সূফীদের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে উহার সনদ এলমে উসূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত নহে। উহা সূফীদের মৌখিক বর্ণনা মাত্র—যাহা একে অন্যের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। ইহাকেই তাহারা এলমে বাতেন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট ওয়াস ওয়াসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—সাহাবা এবং তাবেয়ীগণ এই সম্বন্ধে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করেন নাই। হযরত যুনযুন মিসরীও এই কথা বলিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হারেস মুহাসেবীর বর্ণনা শুনিয়া এক প্রতিবেশীকে বলিয়াছিলেন—ঐ সমস্ত লোকের সাথে সম্পর্ক রাখা আমি তোমাদের জন্য বৈধ মনে করি না।

সাঈদ ইবনে আমর বারদায়ী বলেন—আমি আবু যুরআর নিকট বসা ছিলাম। কোন এক ব্যক্তি তাহার নিকট হারেস মুহাসেবীর রচনাবলীর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—খবরদার! ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিও না। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বেদআত এবং গোমরাহীতে ভরা। হাদীসের অনুসরণ কর। তাহা হইলে ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

কোন এক ব্যক্তি বলিলেন—ঐ সমস্ত গ্রন্থে তো বেশ নসীহত রহিয়াছে।

আবু যুরআ বলিলেন—আল্লাহর কুরআনে যাহার জন্য নসীহত নাই; ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাহার জন্য কি নসীহত থাকিতে পারে।

তারপর তিনি বলিলেন—তোমরা কি শুনিয়াছ যে, মালেক ইবনে আনাস, সুফইয়ান সাওরী, আওযায়ী বা অন্যান্য ইমামগণ এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন? ইহারা আলেম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করিয়াছে।

কখন হারেস মুহাসেবী কখন আবদুর রহীম ওয়াবেলী কখন হাতেম আসেম আবার কখনও বা শকীক বলখীর বক্তব্যকে সনদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা কত শীঘ্র বেদআতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সর্বপ্রথম যুনযুন মিসরী এই পর্যায়ের আলাপ আলোচনা করেন। মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম এবং মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে হাকাম তাহার মতের বিরোধিতা করেন। যখন লোক জানিতে পারিল যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ যে সমস্ত বিষয় বলেন নাই যুনযুন মিসরী তাহা বলিতেছেন তখন মিশরের আলেম সম্প্রদায় তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। এমনকি তাহাকে যিন্দীক উপাধি দিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

সালমা বলেন—দামেস্কের আবু সোলায়মান দারানী বলিতেন, আমি ফেরেশতাদিগকে দেখি এবং তাহাদের সাথে কথাবার্তা বলি। লোকে এই কথা শুনিয়া আবু সোলায়মানকে দামেস্ক হইতে বাহির করিয়া দেয়।

আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী আম্বিয়াদের উপর আওলিয়াদিগকে ফযীলত দেওয়ায় লোক তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

সালামা বলেন—সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলিতেন—ফেরেশতা, জিন এবং শয়তান আমার নিকট আগমন করেন। আমি তাহাদিগকে ওয়ায করিয়া শুনাই। লোকের তাড়নায় তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া বসরা চলিয়া যান এবং সেখানেই মারা যান।

সালমা বলেন—হারেস মুহাসেবী কালামে এলাহী এবং সিফাতে এলাহী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাহার সাথে মেলামেশা পরিত্যাগ করেন। ইহার পর মৃত্যু পর্যন্ত হারেস মুহাসেবী আর লোক সমক্ষে বাহির হন নাই।

আবু বকর খেলাল কিতাবুস সুন্নত এ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলিতেন—তোমরা মুহাসেবীর নিকট হইতে দূরে থাক, সে সমস্ত বিপদের মূল। জহমিয়া সম্প্রদায়ের দোষে দোষান্বিত। সে তাহার অমুক অমুক সাথীকে জহমিয়া (বেদআতী) করিয়া ছাড়িয়াছে। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন—হারেস ওৎপাতা বাঘের ন্যায়, সুযোগ পাইলেই লোকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

গ্রন্থকার বলেন—প্রাথমিক সূফী সম্প্রদায় কুরআন এবং সুন্নতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর কম এলমের দরুন শয়তান তাহাদিগকে ধোকায় নিপতিত করে।

আবু সোলায়মান দারানী বলেন—সময় সময় সূফীদের কোন কোন সূক্ষ্ম বিষয় আমার অন্তরে জাগ্রত হয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নতের পরিপন্থী হইলে আমি উহা গ্রহণ করি না।

আবু ইয়াযীদ বলেন—যদি তুমি কোন কেরামত সম্পন্ন দরবেশকে শূন্যে বসা দেখ তবু যদি সে শরীয়তপন্থী না হয় তবে তুমি তাহার এই কেরামত দেখিয়া ধোকায় পড়িও না।

আবু ইয়াযীদ আরও বলেন—যদি কোন লোক কোরআন তেলাওয়াত পরিত্যাগ করে, জামাআতে না যায়, শরীয়তের সাহায্য না করে, জানাযায় অংশগ্রহণ না করে, রোগীদের খবরাখবর গ্রহণ না করে অথচ এলমে বাতেনীর দাবী করে তবে সে যতবড় সূফীই হউক না কেন সে পরিত্যাজ্য।

সাররী সাকতী বলেন—যে ব্যক্তি প্রকাশ্য শরীয়ত পরিত্যাগ করিয়া বাতেনীর দাবী করে সে ভ্রান্ত।

হযরত জোনাইদ (রহঃ) বলেন—আমাদের তাছাউফ মযহাব কুরআন হাদীস এবং নিয়ম কানূনের মধ্যে সীমিত।

তিনি আরও বলেন—আমাদের এলম কিতাব ও সুন্নত দ্বারা বাধা। যাহার কিতাব স্মরণ নাই,হাদীস শিখে না এবং যে ফেকাহ শিখে না সে অনুসরণীয় নহে।

তিনি আরও বলেন—আমাদের তাছাউফ বাদানুবাদের পরিণতি নহে। বরং অনাহারের কষ্ট সহ্য করিয়া, পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় ও সুখের বস্তু ত্যাগ করিয়া এবং ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়া উহা অর্জন করিয়াছি। কেননা, তাছাউফের অর্থ আল্লাহর সাথে সাফ সম্পর্ক রাখা। সুতরাং তাছাউফের অর্থ পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া।

হারেসাহ বলেন—পৃথিবী দ্বারাই আমি আমার নফসের পরিচয় জ্ঞান লাভ করিয়াছি। সুতরাং রাতে অনিদ্র এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রহিয়াছি।

আবু বকর সাফাফ বলেন—যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে আদেশ নিষেধের গণ্ডি নষ্ট করে সে বাতেনে অন্তরের দর্শন হইতে বঞ্চিত থাকে।

আবু হুসাইন সুরী তাহার সাথীদিগকে বলিতেন—তোমরা যদি এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ যে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থার সম্পর্কের কথা বলে যাহা শরীয়তের সীমাকে লঙ্ঘন করে তবে তোমরা তাহার নিকট যাইও না।

জারীরী বলেন—আমাদের কর্তব্য অন্তরকে মোরাকাবায় লিপ্ত রাখা এবং যাহেরী এলমে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা।

আবু হাফছ বলেন—যে ব্যক্তি নিজের কার্যাবলী কিতাব ও সুন্নত মোতাবেক সম্পাদন না করে এবং নিজের দোষাবলীকে অন্যায় মনে না করে তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করিও না।

গ্রন্থকার বলেন—সূফী সম্প্রদায়ের বুযুর্গদের বর্ণনা দ্বারাই যখন ইহা প্রমাণিত হইল তখন কম এলমের দরুন উক্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন লোক দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হইতে থাকে। যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি তাহাদের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে উহা যদি সঠিক হয় তবে আমাদের বর্ণনার প্রতি মনোনিবেশ করিবে। তাহাদের দ্বারা যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি হইয়াছে আমরা উহাই বর্ণনা করিব। আর আল্লাহ তাআলা ভালভাবেই জানেন যে, ভুল বর্ণনাকারীর ভুল ধরিয়া দেওয়ায় আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, শরীয়ত সঠিকভাবে লোকের সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক। ভুল বর্ণনাকারীর ভুল ধরা পড়ুক।

এখন যদি কোন জাহেল এই কথা বলে যে, অমুক বিশিষ্ট যাহেদের কার্যকলাপকে কিভাবে সমালোচনা করা যাইতে পারে? আমরা বলিব—কোন লোকের নয় বরং শরীয়তের অনুসরণ করিতে হইবে। আল্লাহর অলী মানুষই। তাহাদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে। তাহাদের এই ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ হওয়া তাহাদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর নয়।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন—আমি শোবা, সুফইয়ান ইবনে সাঈদ, সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা, মালেক ইবনে আনাছ প্রমুখ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—যে ব্যক্তির স্মরণশক্তি ঠিক নয়, হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ পোষণ করে তাহার সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি?

সকলেই এক বাক্যে বলিলেন—তাহার ত্রুটির বিষয় সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কোন ব্যক্তির প্রশংসা করিতেন

এবং সাথে সাথে তাহার দোষগুলিরও উল্লেখ করিতেন। একবার এক ব্যক্তি সম্বন্ধে বলিলেন—যদি তাহার মধ্যে এই দোষ না থাকিত তবে সে অত্যন্ত ভাল লোক ছিল।

সূফীদের বদ এতেকাদ সম্পর্কীয় বর্ণনা

আবু আবদুল্লাহ রামলী বলেন—আবু হামযা তারসুসের মসজিদে ওয়ায করিতেন এবং লোকে আগ্রহের সাথে শুনিতেন। একদিন তিনি ওয়ায করিতেছিলেন। এমন সময় মসজিদের ছাদে একটি কাক কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিল। আবু হামযা উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—লাব্বায়েক লাব্বায়েক! (আমি হাযির প্রভু! হাযির!) লোক তাহার এই কথা শুনিয়া বলিল—এতো যিন্দীক। জামে মসজিদের দরজায় তাহার ঘোড়া এই বলিয়া নিলাম হইল যে, ইহা যিন্দীকের ঘোড়া।

আবু বকর ফারগানী বলেন—আবু হামযা কোন শব্দ শুনিতেই লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলিতেন। লোকে তাহাকে হুলুলী বলিত। আবু আলী বলেন—আবু হামযা এই জাতীয় শব্দকে আল্লাহর পক্ষ হইতে শব্দ মনে করিতেন এবং বলিতেন—এই শব্দ আমাকে আল্লাহর যিকর করাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

সেরাজ বলেন—একবার আবু হামযা হারেস মুহাসেবীর বাড়ী যান। ইত্যবসরে একটি ছাগল চেঁচাইয়া উঠে। আবু হামযা ছাগলের ডাক শুনিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—লাব্বায়েক ইয়া সাইয়্যেদী! হে প্রভু আমি হাযির।

হারেস মুহাসেবী একখানি ছুরি হাতে লইয়া বলিলেন—তুমি যদি তোমার এই এতেকাদ হইতে তওবাহ না কর তবে আমি তোমাকে যবেহ করিব।

আবু হামযা বলিলেন—তুমি যদি আমার এই অবস্থা পছন্দই না কর তবে তোমার উচিত ভুষি এবং মাটি খাওয়া।

আবু আবদুর রহমান সালমী বর্ণনা করেন—আমর মক্কী বলিয়াছেন—আমি হোসায়েন ইবনে মানসূরের সাথে মক্কার কোন এক গলিপথে যাইতেছিলাম এবং কুরআন তেলাওয়াত করিতেছিলাম। আমার কেরাত শুনিয়া হোসায়েন বলিলেন—আমিও এমন কালাম

Contents

বলিতে পারি।

আমর মক্কী বলেন—এই কথা শুনিয়া আমি তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিলাম।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন—আমি মুহাম্মদ ইবনে ওসমানকে মানসুর হাল্লাজের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে শুনিয়াছি। এবং ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে—সুযোগ পাইলে নিজ হাতে হাল্লাজকে হত্যা করিব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি তাহার প্রতি এত অসন্তুষ্ট কেন?

তিনি বলিলেন—আমি একটি আয়াত পাঠ করায় সে বলিল, সম্ভবত আমিও এমন কালাম বলিতে পারি অথবা রচনা করিতে পারি।

আবু বকর ইবনে মামসাদ বলেন—দিনুর নামক স্থানে এক ব্যক্তি আমাদের নিকট আসিল। তাহার নিকট একটি থলে ছিল যাহা সে সর্বক্ষণ নিজের কাছেই রাখিত। লোকে সেই থলেটি তালাশ করিয়া মনসূর হাল্লাজের লিখিত একখানি পত্র পাইল। উহাতে লেখা ছিল—রহমান এবং রহীমের পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের নিকট। পত্রখানি বাগদাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। হাল্লাজকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখানো হইলে সে বলিল—হাঁ আমিই এক পত্র লিখিয়াছি।

লোকে বলিল—এতদিন পর্যন্ত তো নবুয়তের দাবী করিতে। আজ প্রভু হওয়ার দাবী করিতেছ?

হাল্লাজ বলিলেন—প্রভু হওয়ার দাবী করি নাই। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কিছু লেখার ক্ষমতা আছে কি? হাত তো লেখার উপকরণ মাত্র।

জিজ্ঞাসা করা হইল—তোমার মতবাদে বিশ্বাসী আর কেহ আছে নাকি?

হাল্লাজ বলিলেন—হাঁ। ইবনে আতা, মুহাম্মদ ইবনে জরীরী এবং আবু বকর শিবলী। শিবলী এবং জরীরী এই মতবাদকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।

জরীরীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন—হাল্লাজ কাফের। যে এই কথা বলে সে হত্যার উপযুক্ত।

শিবলীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন—এমন কথা যে বলে

তাহাকে নযরবন্দী করিয়া রাখিয়া হইবে।

ইবনে আতা হাল্লাজের কথারই পুনরাবৃত্তি করিল। এই কারণেই তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফের নিকট এই কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইল—

سبحان من اظهرنا سوته – سرسنا لا هوته الثاقب

ثم بدا فى خلقه الظاهرا – فى سورة الا كل و الشارب

حتى لقد عانيه خلقه – كلى حظة الحاجب بالحاجب

পবিত্র ঐ সত্তা যিনি তাহার নাসূতকে লাহূতের উজ্জ্বল আলোর রহস্যের প্রকাশ স্থানে পরিণত করিয়াছেন। অতঃপর স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ্যভাবে পানাহারকারীর ন্যায় প্রকাশ লাভ করিয়াছেন। এমনকি তাহার সৃষ্টি তাহাকে এমনভাবে দেখিতে পাইয়াছে যেমন একটি ভ্রূ অন্য ভ্রূকে সামনা সামনি দেখিতে পায়।

শায়খ এই কবিতা রচনাকারীকে লানত করিলে ঈসা ইবনে নযুল কাযবিনী বলিলেন—ইহার রচয়িতা হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ। শায়খ বলিলেন—যদি তাহাই হয় তবে সে কাফের। অন্যথায় ইহাও হইতে পারে যে, লোকে উহা তাহার রচনা বলিয়া প্রচার করিয়াছে।

আবুল কাসেম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ যানজী তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে—সামারীর মেয়েকে হামীদ উযীরের নিকট পাঠানো হইল। হামীদ উযীর তাহার নিকট হাল্লাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সামারী কন্যা বলিল—আমাদের পিতা আমাকে হাল্লাজের নিকট লইয়া গেলেন। হাল্লাজ আমাকে বলিলেন—নিশাপুরে বসবাসকারী আমার পুত্রের সাথে তোমাকে বিবাহ দিব। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হইলে দিনে রোযা রাখিবে। সন্ধ্যায় ছাদের উপর উঠিয়া লবণবিহীন কোন কিছু দ্বারা ইফতার করতঃ আমার দিকে তোমার মুখ করিয়া তোমার অভিযোগ পেশ করিবে। আমি সকল কিছুই দেখি এবং সকল কিছুই শুনি।

সামারী কন্যা বলে—এক রাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম। আমার মনে হইল হাল্লাজ আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—আমি তোমাকে নামাযের জন্য জাগাইতে আসিয়াছি। আমি নিচে নামিয়া আসিলে হাল্লাজের মেয়ে আমাকে বলিল—হাল্লাজকে সেজদাহ কর।

আমি বলিলাম—আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও সেজদাহ করা যায় নাকি?

হাল্লাজ আমার কথা শুনিয়া বলিল—হাঁ, এক খোদা আসমানে এবং অন্য খোদা পৃথিবীতে।

গ্রন্থকার বলেন—সেই যুগের আলেমগণ হাল্লাজকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার একমত হইয়াছিলেন। সর্বপ্রথম কাযী আবু আমর ফতওয়ায় দস্তখত দেন। শুধু আবুল আব্বাস ইবনে শরীহ ফতওয়ায় দস্তখত না দিয়া বলিয়াছিলেন—হাল্লাজ কি বলে আমি জানি না। আলেমদের একমত হওয়া এমনই দলীল যে, যাহা কখনও ভুল হইতে পারে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে ইহা হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন যে, তোমরা সকলে ভুল মতবাদে একমত হইবে।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাউদ ইস্পাহানী বলেন—আল্লাহ তাআলা তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা যদি সত্য হয় তবে হাল্লাজ যাহা কিছু বলে—উহা মিথ্যা। আবু বকর হাল্লাজের প্রবল বিরোধিতা করিতেন।

গ্রন্থকার বলেন—অজ্ঞতা এবং ফকীহদের মতবাদের পরওয়া না করিয়া সূফীদের একটি সম্প্রদায় হাল্লাজের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে।

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ নাসরাবাদী বলিয়াছেন—নবী এবং সিদ্দীকদের পরই হাল্লাজের স্থান।

গ্রন্থকার বলেন—আমাদের সময়কার সূফী এবং ওয়েজীনদের এই মযহাব। কারণ, তাহারা শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞ; হাদীস সম্বন্ধে বেপরওয়া। হাল্লাজের টালবাহানা সম্বন্ধে আমি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।

আলেমগণ তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাও উহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দাকী বলেন—আমাদের এখানে একটি লঙ্গরখানা ছিল। একদিন দুইটি খেরকাহ পরিধান করিয়া আবু সোলায়মান নামক একজন দরবেশ আসিয়া বলিলেন—আমি এখানে মেহমান স্বরূপ থাকিতে চাই। আমি আমার ছেলেকে বলিলাম—দরবেশকে মেহমানখানায় লইয়া যাও।

আবু সোলায়মান নয় দিন পর্যন্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যেক তিন দিন পর একদিন আহার করিতেন। যাওয়ার সময় বলিলেন—তিন দিন পর্যন্ত মেহমান থাকা যায়।

আমি বলিলাম—আপনার খবরাখবর আমাদিগকে জানাইবেন।

বার বৎসর পর তিনি আমাদের এখানে আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—এতদিন কোথায় ছিলেন?

বলিলেন—আবু শোয়াইব নামক একজন দরবেশকে আমি দেখিয়াছি। তিনি পক্ষাগ্রস্ত রোগী ছিলেন। এক বৎসর পর্যন্ত আমি তাহার খেদমত করি। আমার ইচ্ছা হইল তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তাহার রোগের কারণ কি?

জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি আমাকে বলিলেন—যে কাজে তোমার কোন উপকার হইবে না উহা জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?

ইহার পর আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া আরও তিনটি বৎসর তাহার খেদমত করিলাম।

ইহার পর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যই কি তুমি আমার অবস্থা জানিতে চাও?

আমি বলিলাম—বলিলে আপনার যদি ক্ষতি না হয় তবে দোষ কি?

তিনি বলিলেন—এক রাতে আমি নামায পড়িতেছিলাম। হঠাৎ মেহরাবে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—হে মালউন দূর হইয়া যা। আমার আল্লাহ কখনও এমনভাবে প্রকাশ লাভ করেন না। আমি তিনবার এই কথা বলিলাম।

আওয়াজ আসিল—হে আবু শোয়াইব?

আমি বলিলাম—লাব্বায়েক।

শব্দ হইল—তুমি কি চাও যে, এখনই তোমার জান কবয করি।

অথবা তোমার বিগত ইবাদত বন্দেগীর প্রতিফল দান করি। অথবা তোমাকে রোগাক্রান্ত করিয়া তোমার মর্যাদাকে আরও বাড়াইয়া দেই।

আমি বলিলাম—আমাকে রোগাক্রান্ত করুন।

উহার পর হইতেই আমার এই অবস্থা।

অতঃপর পূর্ণ বারটি বৎসর আমি তাহার খেদমত করি।

একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—আমার নিকট আস। আমি তাহার নিকট গিয়া শুনিলাম—তাহার একটি অঙ্গ অন্য অঙ্গকে বলিতেছে সকলে পৃথক হইয়া যাও। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহ হইতে পৃথক হইয়া যিকর আযকারে লিপ্ত হইয়া গেল। ইহার কিছুদিনের পর এই বুযুর্গ ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থকার বলেন—এই কাহিনীতে ইহাই সন্দেহ হয় যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু অস্বীকার করায় তাহাকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস তাহারা এই পৃথিবীতেই আল্লাহর দর্শন লাভ করিয়া থাকে।

আবুল কাসেম আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলখী বলেন—একটি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই পৃথিবীতেই চর্মচোখে আল্লাহকে দেখা যায়। তাহারা আরও বলে যে—রাস্তায় চলাকালীনও আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হইতে পারে। তাহার সাথে মুসাফাহা এবং কথাবার্তাও হইতে পারে। তাহারা ইহাও দাবী করে যে—আল্লাহ তাহাদের নিকট আসেন তাহারা খোদার নিকট যায়। ইরাকে এই সম্প্রদায় আসহাবুন নাযের এবং আসহাবুল ওসায়েস নামে পরিচিত।

ইহারা জঘন্যতম লোক! আল্লাহ তাআলা মুসলমানদিগকে ইহাদের শয়তানী হইতে রক্ষা করুন।

সূফীদের পবিত্রতা অর্জনে ধোকা

পবিত্রতা সম্পর্কে আবেদদিগকে শয়তান কিভাবে ধোকা দেয় তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সূফীদের সম্পর্কে শয়তান নিতান্তই বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। সুতরাং অধিক পানি ব্যবহার করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে। আমি শুনিয়াছি একবার ইবনে আকীল রাবাত যান। সেখানে

অল্প পরিমাণ পানি দ্বারা তাহাকে অযু করিতে দেখিয়া সূফী সম্প্রদায় ঠাট্টা করিয়াছিল। অথচ তাহারা অবগত নহে যে, এক বতল পানিই অযুর জন্য যথেষ্ট।

আবু হামেদ সিরাজী বলেন—আমি একজন সূফীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় গিয়াছিলেন?

তিনি বলিলেন—অযু করার জন্য নদীতে গিয়াছিলাম। কম পানি দ্বারা অযু করিলে আমার সন্দেহ দূর হয় না।

আবু হামেদ বলেন—একসময় আমি দেখিয়াছি সূফী সম্প্রদায় শয়তানকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করিত। আর এখন দেখি শয়তান তাহাদের সাথে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে—ইহারা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করে অথচ ভিতরটা আবর্জনায় পরিপূর্ণ।

ইবাদতখানা

শয়তান সূফীদের একটি সম্প্রদায়কে এই বলিয়া ধোকা দিতেছে যে, তোমরা নির্জনে ইবাদত–বন্দেগী করার জন্য ইবাদতখানা তৈয়ার করিয়া লও। কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে ইহা জায়েয নহে বরং বেদআত—

(১ম) ইসলামের বুনিয়াদ শুধুমাত্র মসজিদ।

(২য়) এই প্রকার ইব্যাদতখানা মসজিদ সাদৃশ্য মনে করা হইয়া থাকে।

(৩য়) তাহারা মসজিদে যাওয়ার এবং জমাআতে নামায আদায় করার ফযীলত হইতে বঞ্চিত থাকে।

(৪র্থ) খৃষ্টান পাদরীদের সাদৃশ্য তাহারা এই প্রকার ইবাদতখানা তৈয়ার করিয়া থাকে।

(৫ম) যুবক হওয়া সত্ত্বেও এই নির্জনতা বাসের জন্য বিবাহশাদী করে না। অথচ তাহাদের বিবাহের প্রয়োজন।

(৬ষ্ঠ) তাহারা লোক সমাজে খ্যাতি চায় যে লোক তাহাদিগকে দরবেশ বলুক, তাহাদের দর্শনে আসুক এবং তাহাদের দোআ প্রার্থী হউক।

যদি তাহারা তাহাদের নিয়তে ঠিক না হয় অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি না চায় তবে তো তাহারা মিথ্যার দোকানদার।

আমি বর্তমান যুগে বহু সূফীকে দেখিয়াছি যাহারা জীবিকা অর্জনের

শ্রম হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এইরূপ উপাসনা গৃহে বসিয়া থাকে। সুস্বাদ পানাহারে লিপ্ত থাকে। হালাল হারামে পার্থক্য না করিয়া সকলের নিকট হইতেই নাযরানা গ্রহণ করে। কোন প্রকার তাকওয়াই তাহাদের মধ্যে নাই।

ইহাদের অধিকাংশের উপাসনা গৃহই অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারীদের টাকা পয়সায় তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোকের ওয়াকফ করা সম্পত্তির আয়েই তাহাদের ভরণ–পোষণ হইয়া থাকে।

শয়তান তাহাদিগকে এই ধোকায় রাখিয়াছে যে, যাহা কিছু তোমার খেদমতে আসে ইহাই তোমার জীবিকা। সুতরাং তাহারা তাকওয়া এবং পরহেযগারীকে বিদায় করিয়া দেয়। অতঃপর তাহাদের চরম লক্ষ্য থাকে বাবুর্চিখানা এবং আরাম–আয়েশের দিকে। কোথায় থাকে বশর হাফীর ক্ষুধার জ্বালা, কোথায় থাকে সাররী সাকতীর তাকওয়া আর কোথায় থাকে জোনাইদ বাগদাদীর বৈরাগ্য।

ইহারা হাসি তামাশা এবং লোকের সাথে দেখা সাক্ষাত করিয়াই সময় অতিবাহিত করে।

ধন সঞ্চয়

প্রথম যুগের সূফীগণ যাহারা সত্যিকারের খোদাভীরু ছিলেন শয়তান তাহাদিগকে ধোকা দিত এবং ধনসম্পদের দোষ–ত্রুটি তাহাদের চোখে ধরাইয়া দিত ; উহার অপকারিতা সম্বন্ধে ভয় দেখাইত। সুতরাং তাহারা ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকিতেন এবং অভাব অনটনে কালাতিপাত করিতেন।

তাহাদের উদ্দেশ্য সৎ হইলেও কম জ্ঞানের দরুন তাহাদের কার্যাবলী ত্রুটি–বিচ্যুতিও ছিল। আর এই যুগে তো শয়তান এইসব কাজের জন্য কোন মেহনতই করে না। কারণ, দরবেশগণ টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য কোন প্রকার শ্রমই করেন না।

আবু নসর তুসী বলেন—পিতার মৃত্যুর পর জায়গা জমি ছাড়াই আবু আবদুল্লাহ মাকরী নগদ পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পান। তিনি যাবতীয় কিছু দান করিয়া দেন। দানের এমন কাহিনী আরও অনেকেরই শুনিতে পাওয়া যায়।

যদি কোন লোকের জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন পথ থাকে যাহার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে না অথবা সম্পত্তি হালাল হওয়ায় সন্দেহ থাকে—তবে এমন দানকারীর বিষয়ে আমাদের কিছুই বলার নাই। কিন্তু হালাল সম্পদ দান করার পর যদি অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় বা তাহার পরিবার পরিজন গরীব হইয়া যায়—তখন এমন ব্যক্তি হয় অন্যের উপর নির্ভরশীল হইবে অথবা অন্যায় উপার্জনকারীর দ্বারস্থ হইবে। এমন কাজ অবশ্যই নিন্দনীয়।

অজ্ঞ দরবেশগণ এমন কিছু করিলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। কিন্তু আফসোস তো ঐ সমস্ত লোকের জন্য যে জ্ঞানীগুণী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কিভাবে শরীয়তবিরোধী এইসব কাজে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

হারেস মুহাসেবী এই সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে—তুমি যদি হালালভাবে অর্জিত টাকা পয়সা সঞ্চয় না করার চেয়ে করাকে ভাল মনে কর তবে তুমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য পয়গাম্বরদেরকে দোষারোপ করিলে। আর ইহাই মনে করিলে যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার উম্মতদিগকে টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অথচ তিনি জানিতেন টাকা পয়সা সঞ্চয় করা ভাল না।

আর ইহাও মনে করিলে যে, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ধনসঞ্চয়ে যে নিষেধ করিয়াছেন—তুমি উহার প্রতি উদাসীন। স্মরণ রাখিও, সাহাবাদের ধনসম্পদের প্রমাণ দেওয়া তোমার পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক নয়। কেয়ামতের দিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ আফসোস করিয়া বলিলেন—হায়! আমার যদি এত ধনসম্পদ দুনিয়ায় না থাকিত।

আমি হাদীস শুনিয়াছি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ মারা যাওয়ার পর কিছুসংখ্যক সাহাবা বলাবলি করিতে লাগিলেন—আবদুর রহমান ইবনে আউফ এত সম্পদ ছাড়িয়া গিয়াছেন যে, আমাদের ভয় হইতেছে।

হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলিলেন—সুবহানাল্লাহ! কেন ভয় হইতেছে, তিনি হালাল উপায়ে ধনার্জন করিয়া গিয়াছেন এবং উপযুক্ত পাত্রে দানও করিয়া গিয়াছেন।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) কাবের এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার তালাশে বাহির হইলেন। পথিমধ্য হইতে উটের পাঁজরের একখানি হাড় হাতে লইয়া তাহার সন্ধান করিতে থাকেন।

হযরত কা'ব লোক মুখে এই কথা শুনিয়া হযরত ওসমানের নিকট আসিলেন এবং সকল কথা বলিয়া বিচারপ্রার্থী হইলেন। এদিকে হযরত আবু যরও তাহার সন্ধান করিতে করিতে ওসমান (রাযিঃ)এর গৃহে উপস্থিত হইলেন। হযরত কা'ব ভয়ে হযরত ওসমানের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন।

হযরত আবু যর বলিলেন—ওহে ইহুদীর বাচ্চা! তোমার কি এই ধারণা যে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছাড়িয়া গিয়াছেন উহার জন্য কিয়ামতের দিন তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না?

একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—যে যত বেশী সম্পদশালী হইবে কেয়ামতের দিন সে তত অভাবগ্রস্ত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্তহস্তে দান করিবে সে মুক্তি পাইবে।

অতঃপর বলিলেন—'হে আবু যর! তুমি সম্পদ চাও আর আমি দৈন্য চাই।'

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈন্যের আকাঙ্খী! আর হে ইহুদী তনয় তুই বলিস আবদুর রহমান ইবনে আউফের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির জন্য কোন ভয় নাই। তুমি মিথ্যাবাদী আর যে এরূপ করে সেও মিথ্যাবাদী।

কা'ব এই সমস্ত কথার কোন উত্তরই দিলেন না। হযরত আবু যরও চলিয়া গেলেন।

হারেস মুহাসেবী বলেন—

হালালভাবে অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার দরুন কেয়ামতের মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। ফকীর ও মুহাজিরদের সাথে জান্নাতে যাইতে পারিবেন না। বরং হাঁটুতে ভর দিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে যাইবেন।

সাহাবা কেরামদের নিকট যখন কিছু থাকিত না তখন তাহারা সন্তুষ্ট

থাকিতেন। আর তোমার অবস্থা এই যে, তুমি সঞ্চয়ী এবং দৈন্যের ভয়ে ভবিষ্যতের জন্য টাকা পয়সা সঞ্চয় করিয়া রাখ। অথচ তোমার এই কাজে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, খোদার প্রতি তোমার সুধারণা নাই এবং আল্লাহ যে জীবিকা দাতা উহাতে তোমার বিশ্বাস নাই। ইহার চেয়ে কঠিন পাপ আর কি হইতে পারে? ইহাতে আরও প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার আরাম আয়েশ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্যই তুমি টাকা পয়সার প্রতি এত আগ্রহী।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি পার্থিব হৃত বস্তুর জন্য আফসোস করিবে সে এক বৎসরের সমপরিমাণ রাস্তার দোযখের নিকটবর্তী হইবে।

আর তোমার অবস্থা এই যে, দুনিয়ার সামান্য বস্তু হাতছাড়া হইলে পরিতাপ করিতে থাক এবং আল্লাহর আযাবের নিকটবর্তী হওয়ার কোন প্রকার ভয় কর না। তোমার জন্য পরিতাপ! তুমি কি তোমার যুগে হালাল বস্তু পাও—যেভাবে সাহাবাগণ পাইয়াছেন। দুনিয়ায় হালাল কোথায় পাইবে যে তুমি সঞ্চয় করিবে।

আমার কথা শোন! স্বাভাবিকভাবে যতটা আসে উহাতেই সন্তুষ্ট থাক। সৎকাজ করার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করিও না।

কোন একজন বুযুর্গ লোকের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে—এক ব্যক্তি হালালভাবে অর্থ উপার্জন করিয়া উহা হইতে আত্মীয়-স্বজনকে দান করিল এবং পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিল। অন্য আর এক ব্যক্তি এইসব কিছু হইতে দূরে থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী করিলে। এই দুইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

বুযুর্গ বলিলেন—খোদার শপথ! উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। নির্জনে ইবাদত ও বন্দেগীকারী শত গুণে শ্রেয়।

এই পর্যন্ত হারেস মুহাসেবীর বর্ণনা। আবু হামীদ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। সালাবার হাদীস দ্বারা উহাকে শক্তিশালী করিয়াছেন। আবু হামেদ বলেন—আম্বিয়া এবং আওলিয়াদের কার্যাবলীর প্রতি খেয়াল করিলেই দেখা যাইবে যে, সম্পদ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল—যদিও ভাল কাজে উহা ব্যয় করা হয়।

কমপক্ষে এতটা তো অবশ্যই হইবে যে হালালভাবে টাকা পয়সা অর্জন করার জন্য যে শক্তি ও সময় ব্যয় করা হয় ঐ শক্তি ও সময়টুকু আল্লাহর স্মরণে ব্যয় করা হয় না। সুতরাং মুরীদের কর্তব্য ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকা। যতটা প্রয়োজন ততটাই নিজের কাছে রাখিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট একটি দেরহাম অবশিষ্ট থাকিবে এবং উহার প্রতি খেয়াল থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ও আল্লাহর মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থকার বলেন—উপরোক্ত বর্ণনার সবটুকুই জ্ঞান ও শরীয়ত বিরোধী। সম্পদ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতেই তাহারা ভুল করিয়াছে।

সম্পদের গৌরব তো ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলা উহাকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দিয়াছেন। উহাকে মানুষের জীবন ধারণের উপকরণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষ মর্যাদাসম্পন্ন। মর্যাদাসম্পন্নের অস্তিত্বের জন্য যাহা প্রয়োজন উহাও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَاتُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا -

'যে সম্পদ তোমাদের জীবনের অস্তিত্বের কারণ স্বরূপ করিয়াছেন উহা অজ্ঞদিগকে দান করিও না।'

আল্লাহ তাআলা অবুঝদিগকে ধনসম্পদ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই ইরশাদ করিয়াছেন—

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ -

যখন তোমরা ইয়াতীমদিগকে দেখিবে তাহারা ভালভাবে বোধগম্যের অধিকারী হইয়াছে—তখন তাহাদের ধনসম্পদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযথা টাকা পয়সা নষ্ট করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হযরত সাআদ (রাযিঃ)কে ইরশাদ করিয়াছেন—তোমার ওয়ারিশদিগকে দৈন্যের অবস্থায় লোকের দ্বারে দ্বারে

হাত প্রসারিত করিয়া ফেরার চেয়ে সম্পদশালী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করা ভাল।

তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন—আবু বকরের টাকা পয়সা দ্বারা আমি যতটা উপকৃত হইয়াছি আর কাহারও সম্পদ দ্বারা ততটা উপকৃত হই নাই।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন—নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি খেদমতে উপস্থিত হইলে ইরশাদ করিলেন—পোশাক পরিধান করিয়া এবং হাতিয়ার বাঁধিয়া আস। আমি সজ্জিত হইয়া আসার পর বলিলেন—তোমাকে একটি বাহিনীর সেনাপতি করিয়া পাঠাইতেছি। আল্লাহ তোমাকে সহী সালামত রাখিবেন এবং গনীমত দান করিবেন। নেক নিয়তের সাথে যত খুশী টাকা পয়সা গ্রহণ করিও।

আমি বলিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! টাকা পয়সা লাভের আশায় আমি ইসলাম গ্রহণ করি নাই বরং ইসলামের মহব্বতে মুসলমান হইয়াছি।

ইরশাদ করিলেন—হে আমর! হালাল সম্পদ ভাল লোকের জন্য খুব উপকারী।

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন—হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মঙ্গল কামনা করিয়া দোআ করিলেন। দোআর শেষাংশ ছিল—হে খোদা! আনাসকে অধিক সন্তানাদি এবং সম্পদ দান কর ও উহাতে বরকত দাও।

আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক বলেন—আমি তওবাহ করার মনস্থ করিয়া বলিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তওবাহ তো এই যে, আমার ধনসম্পদ সব কিছু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের জন্য দান করিয়া দেই।

ইরশাদ করিলেন—কিছু রাখিয়া দাও, তোমার জন্য ভাল হইবে।

গ্রন্থকার বলেন—উপরে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই সহীহ এবং সূফীদের অনুসৃত নীতির বিরোধী যে অধিক সম্পদ আল্লাহর পথের অন্তরায় ও শাস্তির কারণস্বরূপ। আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখার অন্তরায়।

ইহাও অনস্বীকার্য যে, ধন সঞ্চয়ের মধ্যে বিপদ রহিয়াছে। তাই অধিকাংশ আল্লাহ ওয়ালা ধনসম্পদ হইতে দূরে রহিয়াছেন। ইহাও স্বীকার্য যে হালাল উপায়ে সম্পদ সঞ্চয় করা খুবই কম হয়। উহার বিপদাপদ হইতে মনও শান্তিতে থাকিতে পারে না। তাই সম্পদ সঞ্চয়ের মধ্যে বিপদ নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেখিতে হইবে যে, এই সম্পদ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য কি? যদি টাকা পয়সা জমা করার উদ্দেশ্য গৌরব দেখানো তবে খুবই খারাপ। আর যদি পরিবার পরিজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ, অনাগত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকা, গরীব-দুঃখীকে দান করার উদ্দেশ্যে কেহ অর্থ উপার্জন করে তবে সে পুণ্যের ভাগী হইবে। এই নিয়তে টাকা পয়সা জমা করা বহু প্রকার ইবাদত বন্দেগীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

ধন সঞ্চয়ের ব্যাপারে সাহাবা কেরামদের নিয়ত পবিত্র ছিল। হযরত সাআদ ইবনে উবাদা (রাযিঃ) দোআ করিতেন—হে আল্লাহ, আমাকে স্বাচ্ছন্দ দান কর।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)কে যখন তাহার ছেলেরা আসিয়া বলিল—

وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ـ

এক উটের বোঝা পরিমাণ শস্য আরও বেশী পাওয়া যাইবে।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাহাদের কথা মত বেশী খাদ্যশস্য পাওয়ার জন্য তাহার পুত্র ইয়ামীনকে অন্যান্য ভাইদের সাথে পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত শোয়াইব (আঃ)ও নিজের লাভের বেলায় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)কে কুরআনের ভাষ্যে বলিয়াছিলেন—

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ـ

যদি তুমি পূর্ণ দশ বৎসর বকরী চরাও তবে উহা তোমার পক্ষ হইতে বদান্যতা হইবে।

হযরত আইউব (আঃ) রোগমুক্তির পর একদিন দেখিলেন তাহার নিকট দিয়া একটি স্বর্ণের পঙ্গপাল যাইতেছে। তিনি উহা ধরার জন্য হাত বাড়াইলেন যাহাতে তাহার ধনদৌলত আরও বাড়ে। ইরশাদ হইল—হে আইউব! তোমার কি পেট ভরিল না! উত্তর করিলেন—হে প্রভু! ...

তোমার মেহেরবানীতে কাহারই বা পেট ভরে?

মোটকথা সম্পদ সঞ্চয় করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। উহা যখন সদুদ্দেশ্যে করা হয় তখন উহার পরিণতিও ভাল হয়।

হারেস মুহাসেবী এই সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা একেবারেই ভুল। ইহাতে তাহার শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রমাণিত করে। মুহাসেবী বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাহার বান্দা এবং নবীবর তাহার উম্মতকে সম্পদ সঞ্চয়ে নিষেধ করিয়াছেন ইহা একেবারেই মিথ্যা। বরং অন্যায়ভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করাকে নিন্দা করিয়াছেন।

কা'ব এবং আবু যরের যে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে উহা একেবারেই মিথ্যা এবং জাহেলদের রচনা মাত্র—হাদীস নয়।

মালেক ইবনে আবদুল্লাহ যি-ইয়াদী বলেন—আবু যর হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর বাড়ী যান এবং গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি লইয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। ঐ সময় তাহার হাতে একখানি লাঠি ছিল।

এই সময় হযরত ওসমান (রাযিঃ) কাবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—কাব! আবদুর রহমান ইবনে আউফ বহু সম্পদ রাখিয়া মারা গিয়াছেন এই সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?

কা'ব বলিলেন—তিনি যদি তাহার সম্পদ হইতে আল্লাহর হক আদায় করিয়া গিয়া থাকেন তবে কোন ভয় নাই।

ইহা শুনিয়া আবু যর হাতে লাঠি দ্বারা কা'বকে আঘাত করিয়া বলিলেন—আমি আল্লাহর রাসূলকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি—এই অহুদ পাহাড় যদি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হয়, আমি উহা দান করি এবং আল্লাহ যদি আমার সেই দান গ্রহণ করেন তবুও আমি উহা হইতে দুই উকিয়া পরিমাণ স্বর্ণ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করাকেও পছন্দ করিব না।

ইহার পর আবু যর তিনবার বলিলেন—হে ওসমান! আমি তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি; তুমি কি এই হাদীস শুনিয়াছ?

হযরত ওসমান (রাযিঃ) বলিলেন—হাঁ। আমি শুনিয়াছি।

গ্রন্থকার বলেন—ইহা প্রমাণিত হাদীস নয়। ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইবনে লাহিয়া নিন্দনীয় ব্যক্তি। ইয়াহইয়া বলেন—ইবনে লাহিয়ার হাদীস প্রমাণস্বরূপ হইতে পারে না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় হযরত আবু যর পঁচিশ হিজরী এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ বত্রিশ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আবু যরের পরও আবদুর রহমান (রাযিঃ) সাত বৎসর জীবিত ছিলেন।

সদুপায়ে ধনসম্পদ সঞ্চয় করা সর্বসম্মতিক্রমে মোবাহ। মোবাহ কাজে কেন ভয় থাকিবে। শরীয়তের অভিমত কি এই যে, যাহাকে মোবাহ বলিবে আবার উহাকেই শাস্তির কারণ স্বরূপ বলিবে? এই সব অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত তালহা (রাযিঃ) তিনশত বুহার রাখিয়া মারা যান। প্রত্যেক বুহার তিন তিন কেনতারের সমান। প্রত্যেক কেনতার এক হাজার দুই শত উকিয়ার সমান। হযরত যোবায়ের (রাযিঃ)এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি দুই হাজার দেরহাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাখিয়া যান নয় হাজার দেরহাম। অধিকাংশ সাহাবা কেরামই হালাল উপায়ে সঞ্চয় করিয়াছেন এবং মৃত্যুর সময় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অন্য কোন সাহাবা প্রতিবাদ করেন নাই।

মুহাসেবী যে বলেন—কেয়ামতের দিন হযরত আবদুর রহমান হেঁচড়াইয়া বেহেশতে যাইবেন—ইহা হাদীস নয়। হাদীস সম্বন্ধে মুহাসেবী অজ্ঞ। ইহা স্বপ্নের ঘটনা জাগ্রত অবস্থার নয়।

খোদা না করুন হযরত আবদুর রহমান (রাযিঃ) যদি হেঁচড়াইয়া বেহেশতে যান তবে দৌড়াইয়া কে বেহেশতে যাইবে? অথবা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দশজন সাহাবাকে জীবিতাস্থায়ই জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়াছিলেন—হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিঃ) তাহাদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন বদর যোদ্ধার একজন এবং বায়আতে রেদওয়ানের সময়কার একজন।

হারেস মুহাসেবী যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার রাবী উমারাতা ইবনে যাযান। ইমাম বুখারী বলেন—ইবনে যাযানের বর্ণিত হাদীস অধিকাংশ সময়ই সন্দেহযুক্ত। আবু হাতেম রাযী বলেন—ইবনে যাযানের হাদীস প্রমাণযোগ্য নয়। দারে কুতনী বলেন—ইবনে যাযান দুর্বল রাবী।

হযরত আনাছ (রাযিঃ) বলেন—একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ঘরে বসা ছিলেন। এমন সময় শব্দ শুনিয়া বলিলেন—ইহা কিসের শব্দ? লোকে বলিলেন—আবদুর রহমান ইবনে আউফের বাণিজ্য কাফেলা

সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কাফেলা নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

হযরত আনাছ বলেন—কাফেলায় সাত শত উট ছিল। উহাদের গলার ঘন্টার আওয়াজে সমস্ত মদীনা ঝংকারিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন—আমি নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতেছে।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ এই সংবাদ শুনিয়া বলিলেন—আমার দ্বারা সম্ভব হইলে দৌড়াইয়া বেহেশতে যাইব। এই কথা বলিয়াই তিনি সাতশত উটবাহিত সমস্ত পণ্যদ্রব্য এমনকি উহাদের হাওদা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় দান করিলেন।

হারেস মুহাসেবীর বক্তব্য—হালালভাবে সম্পদ সঞ্চয় করার চেয়ে না করাই ভাল। ইহা ভুল। কখনও এমন হইতে পারে না। বরং আলেমদের মতে সদুদ্দেশ্যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করাই ভাল।

হারেস মুহাসেবী বলেন—পৃথিবীতে হালাল কোথায় যে উহা সঞ্চয় করিবে?

আমাদের জিজ্ঞাস্য—তবে হালাল কোথায় পাওয়া যাইবে এবং হালাল বলিতে কি বুঝায়?

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—হালালও প্রকাশ্য হারামও প্রকাশ্য। তবে কি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর এই অর্থই ছিল যে, খনি হইতে কোন বস্তু সংগ্রহ করা যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না। অথচ ইহা অসম্ভব।

মুহাসেবী বলেন—মুরীদের কর্তব্য তাহার নিজস্ব ধনসম্পদ হইতেও দূরে থাকা।

আমরা এই সম্বন্ধে বলিয়াছি যে—তাহার সম্পত্তিতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ থাকে, কিংবা সে অল্পে পরিতুষ্ট থাকে অথবা নিজের উপার্জনের উপর আস্থা থাকে তবে ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকা দোষণীয় নয়।

হযরত ইবরাহীম এবং শোয়াইব (আঃ) সম্পদশালী ছিলেন এবং কৃষিকার্য করিতেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইব বলিতেন—যে ব্যক্তি ধন সঞ্চয় না করে সে ভাল নয়। টাকা পয়সা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায়, মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া যাওয়া যায়। সাঈদ ইবনে মুসাইব চারিশত দেরহাম রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। সাহাবাদের কথা তো পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

সুফইয়ান সাওরী দুইশত দেরহাম রাখিয়া মারা যান। তিনি বলিতেন—এই যুগে টাকা পয়সা হাতিয়ার স্বরূপ।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বিপদাপদে কাজে লাগার এবং অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য করার জন্য তাহাদের সাধ্যানুযায়ী টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতেন। হাঁ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি ইবাদত বন্দেগীতে একাগ্র থাকার মানসে ধনসম্পদের প্রতি উদাসীন ছিলেন—তবে উহা ভিন্ন কথা। হারেস মুহাসেবী যদি বলিতেন যে—কিছু টাকা পয়সা থাকা ভাল তবে কথার কথা ছিল। কিন্তু তিনি সঞ্চয়কে পাপ নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

অভাব একপ্রকার রোগ। যে অভাবে পড়িয়া ধৈর্যধারণ করে সে অত্যন্ত পুণ্যবান। তাই অভাবগ্রস্ত লোক সম্পদশালীর চেয়ে পাঁচশত পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কারণ সে দুঃখের সময় ধৈর্যশীল ছিল।

সম্পদ একপ্রকার নেয়ামত। নেয়ামতের জন্য অবশ্য শুকরিয়া আদায় করিতে হয়। সম্পদশালী যখন পরিশ্রম করে এবং নিজকে ভাল কাজে নিয়োজিত করে তখন সে মোজাহিদ এবং মুফতীর মর্যাদায় পৌছে। অভাবগ্রস্ত নির্জনতা অবলম্বনকারীর ন্যায়।

আবু আবদুর রহমান সালামী সুনানে সুফীয়া নামক এক কিতাব রচনা করিয়া উহাতে লিখিয়াছেন যে—ফকীরের পক্ষে ধনসম্পদ কিছু রাখিয়া মারা যাওয়া মাকরূহ। প্রমাণস্বরূপ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে—আহলে সুফফার একজন সাহাবা দুইটি দীনার রাখিয়া মারা গেলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছিলেন—'ইহা জাহান্নামের দুইটি দাগ।'

গ্রন্থকার বলেন—প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যে অজ্ঞাত সে-ই এই হাদীস প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। যে সাহাবা মারা গিয়াছিলেন—তিনি দান-খয়রাত গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্যান্যদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ

করিতেন। তাহার নিকট যাহা ছিল উহা রাখিয়া মারা গিয়াছিলেন। তাই ইরশাদ করিয়াছিলেন—ইহা জাহান্নামের দুইটি দাগ।

যথার্থ ধনসম্পদ রাখিয়া মারা যাওয়া যদি দোষণীয় হইত তবে নবীজী ইরশাদ করিতেন না—তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারী অভাবের তাড়নায় অন্যের দ্বারে হাত প্রসারিত করার চেয়ে কিছু রাখিয়া যাওয়াই ভাল।

যদি দোষণীয়ই হইত তবে সাহাবা কেরামগণও টাকা পয়সা রাখিয়া মারা যাইতেন না।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলেন—একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাহ্ দেওয়া সম্বন্ধে উৎসাহ দিলেন। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক পরিমাণ আনিয়া হাজির করিলে ইরশাদ করিলেন—হে ওমর! ছেলেমেয়েদের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম—যতটা আনিয়াছি ততটা পরিমাণই রাখিয়া আসিয়াছি। আমার কথার পর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কোন প্রকার মন্তব্য করিলেন না।

আল্লামা ইবনে জরীর তাবারী বলেন—এই হাদীস দ্বারা জাহেল সূফীদের এই দাবী অসার প্রমাণিত হইল যে—আগামীকালের জন্য নিজের নিকট কিছু রাখিতে নাই। এমন ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসাকারী নয়। আল্লাহর প্রতি কুধারণা পোষণকারী।

ইবনে জরীর তাবারী বলেন—তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা ছাগল পালন কর উহাতে বরকত নিহিত রহিয়াছে।

যে সূফী বলেন—যে বান্দা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল তাহার উচিত নয় নিজের নিকট কিছু টাকা পয়সা রাখা। উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাহাদের কথার অসারতাই প্রমাণিত হয়।

তোমরা কি শোন নাই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রত্যেক মহিষীর জন্য এক বৎসরের জীবিকা এক সাথে দিয়া রাখিতেন।

কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাহারা তাহাদের হালাল ধনসম্পদ হইতেও পৃথকতা অবলম্বন করিয়া থাকে। তারপর তাহারা এমন

লোকের দারস্থ হয় যাহাদের রোযগারে হালাল হারামের কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ, মানুষের প্রয়োজনীয়তা লাগিয়াই থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি ভবিষ্যতের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—আবু হুসাইন সালমী তাহার খনিতে কিছু স্বর্ণ পাইলেন। উহা হইতে কিছু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিলেন। অবশিষ্ট কবুতরের ডিমের সমপরিমাণ স্বর্ণ লইয়া নবীবরের খেদমতে গিয়া আরয করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইহা যথোপযুক্ত কাজে আপনি খরচ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন—আবু হুসাইন সালামী নবীজীর ডান দিক দিয়া আসিয়াছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তারপর বা দিক হইতে আসিলে নবীজী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর সম্মুখ দিক হইতে আসিলে নবীজী মাথা নোয়াইয়া দিলেন। তারপর বার বার বিরক্ত করায় নবীজী তাহার হাত হইতে স্বর্ণটুকু কাড়িয়া লইয়া খুব জোরে তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। যদি লাগিত তবে তাহার চোখ অন্ধ হইয়া যাইত।

তারপর ইরশাদ করিলেন—তোমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যাহারা যথাসর্বস্ব দান করিয়া পরে লোকের নিকট হাত পাতে। দেখ সচ্ছলতার পর দান খয়রাত করিতে হয়। প্রথমে পরিবার পরিজনের প্রতি খেয়াল রাখিতে হয়।

আবু দাউদ আবু সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণনা করেন—এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিয়া কিছু কাপড় চাহিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলকে কিছু কাপড় সদকা করিতে বলায় লোকে কিছু কাপড় দান করিলেন। উক্ত কাপড় হইতে নবীজী সেই ব্যক্তিকে দুইখানা কাপড় দিলেন। তার পর সকলকে দান খয়রাত করিতে উৎসাহ দিলেন।

সেই ব্যক্তি দুইখানা কাপড়ের একখানা দান করিতে উদ্যত হইলে নবীজী বলিলেন—না ! তোমার কাপড় তোমার নিকটই থাক।

গ্রন্থকার বলেন—আমি নিজে ইবনে আকীলের হাতের লেখা দেখিয়াছি যে—তিনি লিখিয়াছেন সূফীদের একটি দল শিবলীর নিকট যান। শিবলী তাহার এক খাদেমকে কোন এক ধনী ব্যক্তির নিকট সূফীদের

খাওয়া দাওয়ার জন্য কিছু টাকা পয়সা চাহিয়া পাঠাইলেন। ধনী ব্যক্তি খাদেমকে এই বলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিল যে—শিবলী তো আল্লাহর আরেফ! আমার নিকট না পাঠাইয়া আল্লাহর নিকট চায় না কেন?

শিবলী খাদেমকে বলিলেন—তুমি পুনরায় গিয়া বল টাকা পয়সা হীন বস্তু তাই হীন লোকের নিকটই চাহিয়া পাঠাইয়াছি। আল্লাহ মহান! তাহার নিকট মহান বস্তুই চাহিব।

ইহা শুনিয়া ধনী ব্যক্তি একশত দীনার পাঠাইয়া দিল।

ইবনে আকীল বলেন—এই হীন কথা বলার পূর্বেই যদি ধনী ব্যক্তি একশত দীনার দান করিত তবে দোষণীয় কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তো শিবলী নাপাক বস্তু খাইলেন এবং মেহমানদিগকেও খাওয়াইলেন।

সূফীদের আল্লাহর প্রতি ভরসা

কোন কোন সূফী ধনসম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উহা দান করিয়া থাকেন এবং বলেন—আল্লাহর প্রতি ভরসাই আমার জন্য যথেষ্ট। অথচ ইহা অজ্ঞতা। কারণ, ইহারা মনে করে যে, জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ এবং টাকা পয়সা হইতে দূরে থাকার নামই তাওয়াক্কোল বা আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।

জাফর খালাদী বলেন—জোনায়েদ বাগদাদী বলিয়াছেন যে, আমি একবার আবু ইয়াকুব যিয়ারতের দ্বারপ্রান্তে তাহার মুরীদদের সাথে গিয়া দাঁড়াইলাম। আবু ইয়াকুব তাহার মুরীদদিগকে বলিলেন—তোমরা আল্লাহর এমন কোন কাজে কেন লিপ্ত থাক না যাহা আমার নিকট আসা হইতে তোমাদিগকে বিরত রাখে।

আমি বলিলাম—আপনার নিকট আসাই যখন আল্লাহর সাথে লিপ্ত থাকা তখন আমরা কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর আমি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তাহার নিকট যে একটি দেরহাম ছিল উহা দান করিয়া দেওয়ার পর ঐ সম্বন্ধে বলিলেন। এবং আরও বলিলেন যে—আমার নিকট কিছু থাক আর আমি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে কিছু বলি—ইহা অন্যায়।

গ্রন্থকার বলেন—ইহারা তাওয়াক্কোল অর্থ সম্বন্ধেই অজ্ঞাত। তাওয়াক্কোলের অর্থ আল্লাহর প্রতি অন্তরের দৃঢ় ভরসা থাকা—ধনসম্পদ পরিত্যাগ করা নয়। বড় বড় সাহাবা এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ টাকা পয়সা সঞ্চয় করিতেন। কোনদিন ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকিতেন না।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) যখন মুসলিম জগতের খলীফা মনোনীত হইলেন তখন রাষ্ট্রের কাজের চাপে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে সুযোগ পাইলেন না। এই সময় তিনি বলিয়াছিলেন—আমি আমার সন্তানদিগকে কিভাবে লালন পালন করিব?

অথচ সূফী সম্প্রদায় এমন উক্তিকে ঘৃণা করেন এবং এমন উক্তিকারীকে তাওয়াক্কোলকারীর দপ্তরে স্থান দেন না।

আবার যাহারা বলে—অমুক বস্তু আমার পক্ষে ক্ষতিকারক তাহাদিগকেও তাওয়াক্কোলকারীর দলে স্থান দান করেন না।

এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা এইভাবে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেব রাযী একবার তাহার ভক্তদের সাথে কোন একস্থানে উপস্থিত হইলে তথাকার লোক তাহাকে দুধপান করিতে অনুরোধ করে। তিনি বলিলেন—আমি দুধপান করিব না ; দুধ আমার পক্ষে ক্ষতিকারক।

ইহার চল্লিশ বৎসর পর তিনি মক্কা শরীফ যান এবং মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করার পর তিনি মুনাজাত করাকালীন বলিলেন—'হে খোদা! তুমি অবগত আছে যে কোন একটি মুহূর্তেও আমি কাহাকেও তোমার সাথে শরীক করি নাই।'

গ্রন্থকার বলেন—আল্লাহই জানেন এই ঘটনা কত দূর সত্য। মনে রাখিতে হইবে যে, যদি কেহ এই কথা বলে যে, অমুক বস্তু আমার পক্ষে ক্ষতিকারক তবে উহার অর্থ এই নয় যে, উক্ত বস্তুই ক্ষতিসাধনের হোতা। বরং উহার অর্থ এই যে—অমুক বস্তু ক্ষতির কারণস্বরূপ। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলিয়াছিলেন—

إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ –

এই মূর্তিগুলি বহু লোককে গোমরাহ করিয়া দিয়াছে।

যেমন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—'উপকার হয় নাই এই বাণীর বিপরীতে ক্ষতিসাধন হয় নাই।'

যেমন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন— খয়বর যুদ্ধের সময়কার বিষমিশ্রিত গ্রাস বহু দিন পর প্রতিক্রিয়া দেখাইতেছে। এমন কি আমার অন্তরের রগ কাটিয়া ফেলিতেছে।

তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন—'আবু বকরের সম্পদে আমি যেভাবে উপকৃত হইয়াছি, অন্যের সম্পদ দ্বারা আর ততটা হই নাই।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপকারকে সম্পদের প্রতি এবং ক্ষতিকে আহারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি হইতে সরিয়া যাওয়া শরীয়তের উপর হস্তক্ষেপ করার শামিল। অতএব যাহারা এমন সব বাজে কথা বলে তাহাদের কথার প্রতি খেয়াল না করাই উচিত।

গ্রন্থকার বলেন—আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, প্রথম যুগের সূফী সম্প্রদায় তাকওয়া পরহেযগারীর এবং সদুদ্দেশ্যে ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকিতেন। তথাপিও তাহারা ভুল করিয়াছেন। শরীয়ত এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের দিক হইতে আমি তাহাদের এই ভুল সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি।

অবশিষ্ট রহিল পরবর্তী যুগের সূফী সম্প্রদায়। যে কোনভাবেই হউক তাহারা সম্পদ সঞ্চয়ে আগ্রহী। কারণ, তাহারা শ্রমে কাতর আরাম আয়াশের দাস। কাম রিপু লোভ লালসায় বশীভূত। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও আছে—যাহারা জীবিকা অর্জনে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও পরের দান খয়রাতের আশায় মসজিদ বা উপাসনাগারে বসিয়া থাকে। ইবাদতে মন লাগানোর চেয়ে লোকের পদ শব্দের প্রতিই বেশী খেয়াল থাকে যে কখন কে দান খয়রাত করিতে আসিবে। অথচ সক্ষম এবং সম্পদশালীর জন্য খয়রাত গ্রহণ করা নাজায়েয।

তাহারা ইহাও খেয়াল করে না যে, দান খয়রাতকারীর টাকা পয়সা কিভাবে অর্জিত—হালাল না হারাম। ইহাকে তাহারা আল্লাহর দান নামে অভিহিত করে। সুতরাং আল্লাহর দান কখনও ফিরাইয়া দেওয়া যায় না। হায়রে টালবাহানা! তাহাদের এই সব যুক্তি শরীয়ত এবং বুযুর্গদের নীতি বিরোধী।

অথচ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—'হালালও প্রকাশ্য হারামও প্রকাশ্য। দুইয়ের মধ্যবর্তী বস্তু

সন্দেহজনক। যে সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করিয়াছে।'

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্দেহজনক বস্তু খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সন্দেহজনক এবং অন্যায়কারীর দান-খয়রাত গ্রহণ করিতেন না। এমনকি তাকওয়া পরহেযগারীর জন্য স্বীয় ভাইয়ের দ্বারাও উপকৃত হইতেন না।

আবু বকর মারুযী বলেন—আমি আবু আবদুল্লাহর নিকট একজন মুহাদ্দেসের কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন—যদি তাহার মধ্যে একটি দোষ না থাকিত তবে তিনি কতই না ভাল ছিলেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর বলিলেন—সমস্ত গুণাবলী মানুষ আয়ত্বে আনিতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—উক্ত মুহাদ্দেস কি সুন্নতের অনুসারী নহেন?

তিনি বলিলেন—আমার জীবনের শপথ! আমি নিজেও তাহার নিকট হইতে হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু তাহার স্বভাব ছিল কোন প্রকার বাচবিচার না করিয়াই সকলের দান খয়রাত গ্রহণ করিতেন।

গ্রন্থকার বলেন—একজন সূফী কোন অত্যাচারী ধনীর নিকট গিয়া তাহাকে খুব নসীহত করিলেন। ধনী তাহাকে কিছু দান করিলে সে উহা লইয়া ফিরিয়া আসেন। ধনী বলিল—আমরা শিকারী। কিন্তু জাল বিভিন্ন প্রকারের।

দুঃখের বিষয় এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্ব বলিতে কি কিছু নাই? অপদস্থ হওয়া কিভাবে তাহারা সহ্য করে?

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভাল। অর্থাৎ দানকারী গ্রহণকারীর চেয়ে ভাল।

গ্রন্থকার বলেন—পূর্ববর্তী সূফী সম্প্রদায় টাকা পয়সা এবং পানাহারের ব্যাপারে খুব সতর্ক ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন—সরবী সাকতী হালালভাবে অর্জিত পানাহারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অথচ আজকাল

সূফী সম্প্রদায় হালাল হারামের কোন পার্থক্য করে না।

গ্রন্থকার বলেন—আমি একবার এক দরবেশের সাথে সাক্ষাত করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি এক আমীর ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়াছেন। এই আমীর ব্যক্তি কাফের এবং অত্যাচারী ছিল।

ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম—তোমাদের সর্বনাশ হউক। এই দোকান খুলিয়া রাখার পরও কি তোমাদের আমীরদের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন বাকী রহিয়াছে? শক্তি–সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আরামে বসিয়া যার তার সদকা গ্রহণ কর। ইহার পরও অন্যায়কারী অত্যাচারীর নিকট পাওয়ার আশায় যাতায়াত কর। যাহার হুকুমতে বিচার নাই, যে ন্যায়ের বিরোধী তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তাহার নিকট যাও। খোদার শপথ! তোমরাই ইসলামের প্রধান শত্রু।

কিছুসংখ্যক সূফী অন্যায়ভাবে সম্পদ সঞ্চয় করিয়া থাকে—হালাল হারামের প্রতি কোন খেয়াল রাখে না। নিজকে অভাবগ্রস্ত প্রকাশ করিয়া যাকাতের টাকা পয়সা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ইহারা গরীবের হক নষ্ট করে।

আবুল হাসান বুস্তামী নামক একজন সূফী পশমী কাপড় পরিধান করিতেন। বহু দূর দূরান্ত হইতে লোক তাহার নিকট দোআ গ্রহণ করিতে আসিত। অথচ তাহার মৃত্যুর পর দেখা গেল চারি হাজার দীনার তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আহলে সুফফার একজন সাহাবা দুইটি দীনার রাখিয়া মারা যাওয়ার নবীজী ইরশাদ করিয়াছিলেন—'ইহা জাহান্নামের দুইটি দাগ।'

সূফীদের পোশাক

প্রাথমিক যুগের সূফী সম্প্রদায় যখন জানিতে পারিলেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা কাপড়ে তালি লাগাইতেন এবং হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে ইরশাদ করিতেন—কাপড়ে তালি না লাগানো পর্যন্ত পরিত্যাগ করিও না ; হযরত ওমর (রাযিঃ) কাপড়ে তালি লাগাইয়া পরিধান করিতেন—তখন তাহারাও জামা কাপড়ে তালি লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। অধিকন্তু ইহারা ধারণায় বহু দূর চলিয়া

গেলেন। কেননা, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা কেরামগণ ছেঁড়া, পুরানো কাপড় পরিধান করিয়া থাকা পছন্দ করিতেন এবং পরহেযগারীর দরুন পৃথিবীর প্রতি বিমুখ ছিলেন।

আবার অধিকাংশ বুযুর্গ অভাবের তাড়নায় এরূপ করিতেন। মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট গিয়া দেখেন তিনি ময়লা জামা পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ওমরের স্ত্রী ফাতেমাকে বলিলেন—আমীরুল মোমেনীনের জামা ধুইয়া দাও।

ফাতেমা বলিলেন—খোদার কসম! এই একটি জামা ব্যতীত আর কোন জামা তাহার নাই।

ইহা যদি সত্যিকারের বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যে না হয় তবে উহার কোন মূল্যই নাই।

গ্রন্থকার বলেন—আমাদের যুগের সূফী সম্প্রদায় তো দুই তিন রংয়ের নতুন কাপড় কাটিয়া কাটিয়া জামা তৈরী করে। এই জামায় দুইটি বস্তু নিহিত থাকে। প্রথম বাসনা দ্বিতীয় প্রসিদ্ধি। নিজের ইচ্ছামত পোশাকের সৌন্দর্য বর্ধন করা এবং লোকের নিকট সূফী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করা।

পোশাক পরিধান করিলেই কি বুযুর্গ হওয়া যায়। ইহা তাহাদের খেয়াল মাত্র। শয়তান তাহাদিগকে এই বলিয়া ধোকা দেয় যে, সূফী সম্প্রদায় তালি দেওয়া পোশাক পরিধান করিতেন। তুমিও করিতেছ। সুতরাং তুমিও সূফী। কমবখত একটা বুঝে না যে আকৃতিতে সূফী হওয়া যায় না বরং প্রকৃতিতে হওয়া যায়। ইহারা কোন প্রকারের সূফীই নয়। কারণ আকৃতিতে এইজন্য নয় যে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ প্রয়োজন বোধে কাপড়ে তালি লাগাইতেন এবং উহাতে কোন প্রকার সৌন্দর্য কামনা করিতেন না।

প্রকৃতিতে এই জন্য নয় যে—পূর্ববর্তী সূফী সম্প্রদায় সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানার্থেই ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকিতেন।

ইহাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোকও আছে, যাহারা জামার নিচে পশমি কাপড় পরিধান করে এবং পশমী জামার আস্তিন বাহির

করিয়া রাখে যেন লোকে দেখিতে পায়। ইহারা রাতের চোর। আবার কেহ কেহ পশমি জামার নিচে অন্য কোন নরম জামা পরিধান করে। ইহারা প্রকাশ্য দিবালোকের ডাকাত।

আবার কিছু সংখ্যক লোক সূফী হইতে চায় কিন্তু পুরানো ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরিধান করিতে মন উঠে না। আরাম আয়াশে থাকাই পছন্দ করে। অথচ সূফী সাজিয়া না থাকিলে জীবন ধারণের পথও বন্ধ হইয়া যায়। তখন তাহারা মসনদী কাপড়ের জামা এবং বহু মূল্যবান রোমী পাগড়ী পরিধান করে যাহার মূল্য রাজা-বাদশাহদের পোশাকের সমতুল্য। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহারা ধনীদের সাথে মধুর সম্পর্ক রাখে এবং গরীবদিগকে ঘৃণা ও কৃপার চোখে দেখে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিতেন—হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আমার নিকট সাধুর পোশাক পরিধান করিয়া আস; অথচ তোমাদের অন্তর হিংস্র বাঘের ন্যায়। শোন! রাজা বাদশাহর ন্যায় পোশাক পরিধান কর কিন্তু অন্তরকে সদা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কোমল রাখ।

মালেক ইবনে দীনার বলিয়াছেন—আমি দেখিলাম এক যুবক সদা সর্বদা মসজিদে বসিয়া থাকে। আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম—হে যুবক আমি কি অমুক আমীরের নিকট তোমার কথা বলিব—তিনি হয়ত তোমাকে কিছু দান করিতে পারেন। যুবক বলিল—হে আবু ইয়াহইয়া আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন।

মালেক এক মুষ্টি ধূলাবালি উঠাইয়া তাহার মাথায় ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে খাফীফ বলেন—আমি রুয়াইমকে বলিলাম—আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বলিলেন—তোমার সত্তাকে আল্লাহর কাজে লিপ্ত রাখ, সূফীদের মিঠা কথায় পড়িও না।

মুহাম্মদ ইবনে আলী তালি লাগানো জামা কাপড় পরিধানকারীকে দেখিয়া বলিতেন—ভাই! তোমার বাতেনের সাথে যদি তোমার পোশাকের মিল থাকে তবে তুমি তোমার বাতেনকে লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া

দিলে? আর যদি দুইয়ের মধ্যে মিল না থাকে তবে খোদার কসম! তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ।

আবু আবদুল্লাহ তাহার কোন কোন বন্ধুকে বলিতেন—তোমরা আজকালের সূফীদের যাহেরী পোশাক দেখিয়া খুশী হইওনা। ইহারা তাহাদের বাতেনকে খারাপ করিয়া দিয়া যাহেরকে সুসজ্জিত করিতে ব্যস্ত।

ইবনে আকীল বলেন—আমি একদিন হামামখানায় গিয়া দেখি মসনদের তালি লাগানো একটি জামা খুটির সাথে ঝুলিতেছে। আমি হামামখানার চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এই যে জামা ঝুলিতেছে ভিতরে কে গিয়াছে?

চৌকিদার এমন এক ব্যক্তির নাম করিল যে বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ফিরিয়া টাকা পয়সা জমা করিত।

কোন কোন সূফী রঙ্গীন কাপড় পরিধান করে। রঙ্গীন কাপড় পরিধান করিলে সাদা কাপড়ের ফযীলত নষ্ট হইয়া যায়। শরীয়ত সাদা কাপড় পরিধান করার নির্দেশ দিয়াছে এবং যে কাপড়ে প্রসিদ্ধি লাভ হয় তেমন কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছে। সাদা কাপড় পরিধান সম্বন্ধে হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর, উহা সকল কাপড়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সাদা কাপড় দ্বারাই মৃত ব্যক্তির কাফন দাও।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইসহাক বলেন—কাফন দেওয়ার জন্য আমরা সাদা কাপড়কেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকি।

মুহাম্মদ ইবনে তাহের বলেন—রঙ্গিন কাপড় পরিধান করা সুন্নত। প্রমাণস্বরূপ বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল হুল্লা পরিধান করিয়াছেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন কালো পাগড়ী পরিধান করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার বলেন—আমরা স্বীকার করি যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা পরিধান করিয়াছিলেন এবং উহা পরিধান করা জায়েযও বটে। বর্ণিত আছে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রং

দেখিয়া খুশী হইতেন। কিন্তু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করার নির্দেশ দিতেন এবং যাহা সর্বদা করিতেন উহাই সুন্নত। সাহাবা কেরামগণও লাল এবং লাল পোশাক পরিধান করিতেন। তথাপি আমরা বলিব যে—ফওত এবং মুরাক্কা (এক জাতীয় দামী কাপড়) প্রসিদ্ধি লাভের পোশাক।

প্রসিদ্ধি লাভের পোশাক নিষেধ হওয়া সম্বন্ধে হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের পোশাক পরিধান করে উহা খুলিয়া না ফেলা পর্যন্ত আল্লাহ তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখেন।

হযরত আবু হোরায়রা এবং যায়েদ ইবনে সাবেত হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি প্রসিদ্ধি লাভের বস্তু হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন।

সাহাবাগণ আরয করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কি? ইরশাদ করিলেন—পোশাক পাতলা হওয়া, মোটা হওয়া, কোমল হওয়া শক্ত হওয়া এবং বড় হওয়া ও ছোট হওয়া। হাঁ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী জিনিস ব্যবহার কর।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভের পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাহাকে অপদস্থ করিবেন। অন্য বর্ণনামতে কেয়ামতের দিন হীনতার পোশাক পরিধান করাইবেন।

মাকাতিল বলেন—আমার পিতা বলিয়াছেন—আমি খয়বর বিজয়ের সময় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং যাহারা দূর্গের উপর উঠিয়াছিল আমিও তাহাদের সাথে ছিলাম। সেখানে আমি এতটা সামনে ছিলাম যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনায়াসে দেখিতে পাইতেছিলাম। আমি লাল কাপড় পরিহিত ছিলাম। আমি জানি না যে, প্রসিদ্ধি লাভের জন্য ইসলাম গ্রহণ করার পর ইহার চেয়ে অন্য কোন বড় পাপ আমি করিয়াছিলাম কিনা?

সুফইয়ান সাওরী বলেন—সাহাবাগণ (রাযিঃ) প্রসিদ্ধি লাভের কাপড়

পরিধান করা মকরূহ জানিতেন। প্রথম তো এমন ভাল কাপড় পরিধান করা তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এমন খারাপ কাপড় পরিধান করা যাহা লোকে ঘৃণার চোখে অবলোকন করে।

পশমী পোশাক পরিধান

সূফীদের কেহ কেহ পশমী (কম্বলজাতীয়) কাপড় পরিধান করে। প্রমাণস্বরূপ বলে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী কাপড় পরিধান করিতেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশমী কাপড় সময় সময় পরিধান করিতেন। কিন্তু আরববাসীদের পক্ষে পশমী কাপড় পরিধান করা প্রসিদ্ধি লাভের তেমন কোন কিছু নয়। এই জাতীয় পোশাক পরিধান সম্বন্ধে তাহারা যে সমস্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করে উহা সবই মওযু হাদীস। উহা দ্বারা কোন প্রকার প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না।

পশমী কাপড় পরিধানকারীর দুইটি অবস্থার একটি অবশ্য হইয়া থাকে। হয়ত সে পশমী বা শক্ত কাপড় পরিধান করার অভ্যস্ত। তাহার জন্য এমন পোশাক পরিধান করা মাকরূহ নয়, কারণ উহাতে সে প্রসিদ্ধি লাভ করে না।

নয়ত সে অবস্থা নয় বরং বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। এমন ব্যক্তির জন্য দুইটি কারণে জায়েয নয়। প্রথম তো অযথা নফসকে কষ্ট দেওয়া। দ্বিতীয়ত প্রসিদ্ধি লাভের আশায় পশমী কাপড় পরিধান করে আল্লাহ তাহাকে কেয়ামতের দিন পাঁচড়াযুক্ত কাপড় পরিধান করাইবেন—যাহার ফলে তাহার চোখের রগ টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি রিয়াবশতঃ পশমী পোশাক পরে জমিন তাহার সম্বন্ধে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে।

খালেদ ইবনে শাওযাব বলেন—আমি হাসানের নিকট ছিলাম। এমন সময় কম্বল পরিধান করিয়া ফারকাদ তাহার নিকট আসে। হাসান তাহার কম্বল টানিয়া ধরিয়া বলিলেন—ফারকাদ! কম্বলের মধ্যে পুণ্য নিহিত নাই। বরং অন্তরের বিশ্বাস এবং সৎকাজের মধ্যেই পুণ্য নিহিত রহিয়াছে।

একদিন এক ব্যক্তি পশমী জামা, পাগড়ী এবং চাদর পরিধান করিয়া হাসানের নিকট আসিয়া মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণিকের জন্যও উপরের দিকে মাথা উঠাইতে ছিল না। হাসান ইহাকে গর্ব মনে করিয়া বলিলেন—এমন লোকও আছে যাহাদের অন্তর গর্ব ও অহংকারে পরিপূর্ণ। খোদার কসম! তাহারা ধর্মকে নিন্দার পাত্রে পরিণত করিয়াছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের অবস্থা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

লোকে জিজ্ঞাসা করিল—হে আবু সাঈদ! মুনাফিকদের অবস্থা কি?

তিনি বলিলেন—পোশাকে নম্রতা প্রকাশ করা অথচ অন্তর নম্রতাশূন্য।

ইবনে আকীল বলেন—ইহা এমন লোকের উক্তি যিনি লোকের অবস্থা ভালভাবে বুঝিতেন এবং পোশাক দেখিয়া ধোকায় পড়িতেন না।

আবু কালাবা বলিতেন—পশমী পোশাক পরিধানকারীদের নিকট হইতে তোমরা দূরে থাক।

আবু সোলায়মান বলেন—আমার পিতা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহারা কোন্ অভিপ্রায়ে পশমী পোশাক পরিধান করে?

আমি বলিলাম—বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করার জন্য।

তিনি বলিলেন—আমার তো মনে হয় যখন তাহারা এই পোশাক পরিধান করে তখনই তাহাদের অন্তরে গর্বের সঞ্চার হয়।

সুফইয়ান সাওরী এক ব্যক্তিকে পশমী পোশাক পরিহিত দেখিয়া বলিলেন—ইহা বেদআত।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক এক ব্যক্তির গায়ে পশমী পোশাক দেখিয়া বলিলেন—আমি ইহাকে মকরূহ মনে করি।

মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস আম্বারী বলেন—এক যুবককে চটের পোশাক পরিধান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন আলেম ইহা পরিধান করিয়াছেন? কোন আলেম এমন করিয়াছেন?

যুবক বলিল—বিশির ইবনে হারেস আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া কোন প্রকার প্রতিবাদ করেন নাই।

ইবনে ইদরীস বলেন—আমি বশরের নিকট গিয়া বলিলাম—অমুক

ব্যক্তিকে চটের পোশাক পরিধান করিতে দেখিয়া প্রতিবাদ করায় সে বলিল--বিশির আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া কিছু বলেন নাই।

বিশির বলিলেন--হে আবু খালেদ! সে আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে নাই। তাছাড়া আমি প্রতিবাদ করিলেও সে বলিত---অমুকে অমুকে পরিধান করিয়াছে? আমি পরিধান করায় কেন দোষণীয় হইবে?

ইবনে সীরুবিয়া বলেন—একবার আবু মুহাম্মদ পশমী জুব্বা পরিধান করিয়া আবুল হাসানের নিকট যান। আবুল হাসান বলিলেন--ওহে আবু মুহাম্মদ! দেহকে সূফী করিয়াছ না অন্তরকে? শোন! তাছাউফ আয়ত্ব কর এবং সাদার উপর সাদা কাপড় পরিধান কর।

আবু জাফর ইবনে জরীর তাবারী বলেন—হালাল পন্থায় সূতী কাপড় পাওয়া সত্ত্বেও যে উল অথবা পশমী কাপড় পরিধান করে; গমের রুটি পাওয়ার পরও যে শাক পাতা খায়; স্ত্রীর প্রয়োজন হইবে বিধায় যে গোশত খাওয়া পরিত্যাগ করে সে অবশ্য ভুল করে।

গ্রন্থকার বলেন—বুযুর্গগণ মধ্যম প্রকারের পোশাক পরিধান করিতেন। জুমআ ও ঈদের নামায অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাত করার সময় পাক-পবিত্র এবং সুন্দর কাপড় পরিধান করিতেন।

মুসলিম শরীফে হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) মসজিদের পাশে সোনালী রংয়ের বর্ডার দেওয়া একটি হুল্লা বিক্রি হইতে দেখিয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিলেন—জুমআর নামাযের এবং বহিরাগত লোকের সাথে দেখা করার জন্য আপনি এই হুল্লাটি ক্রয় করিলে ভাল হইত।

ইরশাদ করিলেন—পরকালে যাহাদের কোন অংশ নাই তাহারাই এমন পোশাক পরিধান করে।

ঐ পোশাকে সুসজ্জিত হওয়ায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেন নাই। বরং রেশমী হওয়ায় আপত্তি করিয়াছিলেন।

আবুল আলিয়া বলিয়াছেন—পূর্ববর্তী মুসলমানগণ কোথাও গেলে ভাল পোশাক পরিধান করিয়া যাইতেন।

মুহাম্মদ বলেন—মুহাজির ও আনসারগণ বহু মূল্যবান পোশাক পরিধান করিতেন।

তামীমাদ্দারী এক হাজার দেরহাম দ্বারা একটি জামা ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন। অন্য বর্ণনামতে তিনি উহা রাতে পরিধান করিয়া তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন।

গ্রন্থকার বলেন—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বহু মূল্যবান কাপড় পরিধান করিতেন এবং উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বহু মূল্যবান কাপড় পরিধান করিতেন।

কুলসুম ইবনে হাওসান বলেন—একবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বহু মূল্যবান জামা এবং চাদর পরিধান করিয়া বাহিরে আসেন।

ফারকাদ ইহা দেখিয়া বলিলেন—ওস্তাদ! আপনার কাপড় কি এমন হওয়া উচিত।

তিনি বলিলেন—ওহে ইবনে উম্মে ফারকাদ! তুমি কি অবগত নও যে, অধিকাংশ দোযখবাসীই পশমী পোশাক পরিধানকারী।

হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাযিঃ) আদনের তৈরী মূল্যবান কাপড় পরিধান করিতেন।

মোটকথা পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ খুব বেশী এবং কম দামের কাপড় চোপড় পরিধান করিয়া লোকসমাজে অতি উচ্চ এবং অতি হীন সওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিতেন না। বাড়ীতে যেমন তেমন পোশাক পরিধান করিলেও বাহিরে যাওয়ার সময় ভাল পোশাক পরিধান করিতেন।

গ্রন্থকার বলেন—যে পোশাকে লোকের দরবেশী বা দরিদ্রতা প্রকাশ পায় উহা পরিধান করা দোষণীয় ও মাকরূহ এবং নিষেধ।

আহওয়াস বলেন—আমার পিতা বলিয়াছেন যে, আমি খুব খারাপ অবস্থায় দরবারে নববীতে উপস্থিত হইলাম। নবীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কোন সম্পদ আছে কি?

আমি বলিলাম—জ্বি হাঁ।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কি প্রকার সম্পদ?

আমি বলিলাম—উট, ছাগল, ঘোড়া এবং দাসদাসী।

ইরশাদ করিলেন—আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দান করিয়াছেন তখন ধনাঢ্যতা প্রকাশ কর।

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন—একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে তাশরীফ আনেন। এক ব্যক্তির মাথার চুল এলোমেলো দেখিয়া বলিলেন---তাহার কি এমন কোন কিছু নাই যাহা দ্বারা সে তাহার চুল ঠিক করে!

অন্য আর এক ব্যক্তির ময়লা কাপড় দেখিয়া বলিলেন—তাহার কি এমন ক্ষমতা নাই যে কাপড় ধুইয়া পরে।

আবু উবায়দা মামার ইবনে মুছান্না বলেন—হযরত আলী (রাযিঃ) একবার অসুস্থ রবী ইবনে যিয়াদকে দেখিতে যান। রবী বলিলেন—আমীরুল মোমেনীন! আমার ভাই আসেম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া সংসার বিরাগী হইয়াছে।

হযরত আলী বলিলেন—আসেমকে ডাক।

আসেম আসিলে তিনি কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—তুমি কি জান যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন, কোন কিছুই তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লন নাই। তোমরা অতি জঘন্য। কথার চেয়ে কাজে আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আসেম বলিলেন—আমীরুল মোমেনীন! আমরা তো দেখি যে, আপনি যেমন তেমন তরকারী দিয়া মোটা রুটি আহার করেন।

হযরত আলী ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার জন্য আফসোস। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ শাসকদের উপর ফরয করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা গরীবদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্য রাখে যাহাতে গরীবের গরীবত্ব আরও বাড়িয়া না যায়।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, সুন্দর পোশাক পরিধান করা তো খাহেশে নফসানী। অথচ আমাদের উচিত নফসকে দমন করিয়া রাখা এবং কোন কাজ মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য না হইয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া।

ইহার উত্তর এই যে, নফস যাহা চায় ইহার প্রত্যেকটিই নিন্দনীয় নহে এবং লোক দেখানো প্রত্যেকটি কাজও নিন্দনীয় নহে। বরং শরীয়ত যাহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং ধর্মের কাজে যাঁহা যাহা রিয়ায় পরিণত হয় উহাই দোষণীয়। প্রত্যেক লোকই চায় তাহাকে সুন্দর দেখাক। এই

জন্য সে যদি তৈল দিয়া মাথা আঁচড়ায়, সুন্দর পোশাক পরিধান করে তবে উহা নিন্দনীয় হইতে পারে না।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন—বহির্দ্বারে একদল সাহাবা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য উঠিলেন। ঘরে একটি পাত্রে পানি ভরা ছিল। সেই পানিতে নিজের চেহারা দেখিয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দাড়ি এবং চুল ঠিক করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও এমন করিতেছেন?

ইরশাদ করিলেন—হাঁ! হাঁ! লোক যখন তাহার ভাইদের সাথে সাক্ষাত করিতে যায়, তখন নিজকে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কারণ, আল্লাহ জামীল (সৌন্দর্যময়) এবং জামালকে পছন্দ করেন।

এই সূফীদের মধ্যে আবার কেউ কেউ মাথায় পাগড়ী না বাধিয়া একখণ্ড কাপড় বা রুমাল জড়ায়। ইহাও প্রসিদ্ধি লাভের একপ্রকার পন্থা। ইহা মাকরূহ। কারণ, ইহা শরীয়তসিদ্ধ পোশাকের বিরোধী।

এক জোড়া কাপড় থাকাই ভাল। কিন্তু সম্ভবপর হইলে ঈদ ও জুমআর জন্য অন্য কাপড় রাখাও ভাল।

ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন—আমার পিতা বলিয়াছেন—একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন খুতবাহ দেওয়ার সময় বলিলেন—কাজকর্মের কাপড় ব্যতীত তোমরা যদি জুমআর নামায আদায় করার জন্য অন্য কাপড় তৈয়ার করাইয়া লও তবে দোষ কি?

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একখানি মূল্যবান চাদর এবং আম্মারের তৈরী একটি পায়জামা ছিল। তিনি উহা পরিধান করিয়া জুমআ এবং ঈদের নামায আদায় করিতেন। পরে আবার ভাজ করিয়া রাখিয়া দিতেন।

পানাহারে শয়তানের ধোকা

কম এবং শক্ত বস্তু খাওয়া এবং ঠাণ্ডা পানি পান না করার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের সূফীদিগকে এই সম্বন্ধে ধোকা দেওয়ার পরিশ্রম হইতে শয়তান রেহাই পাইয়াছে। প্রথমে প্রাথমিক যুগের সূফীদের সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

প্রাথমিক যুগের সূফীদের কেহ কেহ একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিতেন। অপারগ হইলেই কিছু পানাহার করিতেন। আবার কেহ কেহ প্রত্যহ যৎসামান্য কিছু আহার করিতেন।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ সম্বন্ধে বলেন—তিনি প্রথমাবস্থায় এক দেরহামের মিঠাই খরিদ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিতেন। অতঃপর উহাকে তিনশত ষাট ভাগ করিয়া প্রত্যেক দিন এক ভাগ করিয়া খাইতেন। আবু হামেদ তূসী ইবনে আবদুল্লাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বহুদিন পর্যন্ত তিনি কুল পাতা খাইয়াছেন। তার পর খাইয়াছেন ভুষী। তিন বৎসরে মাত্র তিন দেরহাম মূল্যের খাদ্য খাইয়াছেন।

আবু জাফর হাদ্দাদ বলেন—আমি একদিন কূপের পাশে বসা ছিলাম। ষোল দিন যাবত আমি অনাহারী ছিলাম। এমন সময় আবু তোরাব আসিয়া বলিল—তুমি কেন এখানে বসিয়া রহিয়াছ?

আমি বলিলাম—এলম এবং ইয়াকীনের যাচাই করিতেছি। দেখি কে জয়ী হয়। যে জয়ী হইবে তাহার দিকেই ঝুকিয়া পড়িব।

আবু তোরাব বলিলেন—অতি শীঘ্রই তুমি কোন এক অবস্থায় উপনীত হইবে।

ইবরাহীম ইবনে বানা বাগদাদী বলেন—আমি আল হামীম হইতে এসকান্দারিয়া পর্যন্ত যুনযুন মিসরীর সাথে ছিলাম। ইফতার করার সময় হইলে আমার থলে হইতে রুটির টুকরা এবং লবণ বাহির করিয়া বলিলাম—আসুন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার লবণ কি খুব মিহিন?

আমি বলিলাম—জ্বি হাঁ।

তিনি বলিলেন—তুমি পরকালে মুক্তি পাইবে না। আমি দেখিলাম—তাহার থলের মধ্যে কিছুটা যবের ছাতু। তিনি উহা বাহির করিয়া চাটিতে আরম্ভ করিলেন।

সাহলের সাগরিদ আবু সাঈদ বলেন—আবদুল্লাহ যোবায়রী যাকিয়া সাজী এবং ইবনে আবু আউফী যখন শুনিলেন যে সহল বলেন—'আমি সৃষ্টির জন্য আল্লাহর প্রমাণস্বরূপ' তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কেমন প্রমাণ? তুমি কি নবী না সিদ্দীক?

সাহল বলিলেন—আমার কথার অর্থ এই নয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমি হালাল রুটি খাই। আস! আমরা সকলে মিলিয়া দেখি হালাল কি?

তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি সঠিকভাবে হালাল চিনিয়াছেন?

উত্তর দিলেন—হাঁ।

—কি ভাবে?

সাহল বলিলেন—আমি আমার জ্ঞান, মারেফাত এবং সামর্থকে সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া ছাড়িয়া দেই। উহার মধ্য হইতে ছয় টুকরা বিলীন হইয়া যাইবে। যাহার ফলে আমি আত্মঘাতি হইয়া পাপী হইব। তখন আমার নফসকে আহার দান করি। যাহার ফলে বিলীন হওয়া ছয়টি অংশও ফিরিয়া আসে।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুঈদ বলেন—চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আমি আমার নফসকে এমন সময় আহার্য দিয়াছি যখন ক্ষুধার্থের পক্ষে মৃত খাওয়া হালাল হয়।

ঈসা ইবনে আদম বলেন—এক ব্যক্তি আবু ইয়াযীদের নিকট আসিয়া বলিল—আপনি যেই মসজিদে থাকেন আমি সেখানে থাকিতে ইচ্ছা করি।

আবু ইয়াযীদ বলিলেন—তোমার সেই শক্তি নাই।

উক্ত ব্যক্তি বলিল—মেহেরবানী করিয়া অনুমতি দিন।

আবু ইয়াযীদ অনুমতি দিলেন।

সেই ব্যক্তি প্রথম দিন অনাহারে কাটাইল। দ্বিতীয় দিন বলিল—ওস্তাদ! আমাকে খাবার দিন।

আবু ইয়াযীদ বলিলেন—সাহেবজাদা! আল্লাহর যিকিরই আমাদের খাদ্য।

আবার বলিল—ওস্তাদ আমাকে এমন কিছু দিন যাহার সাহায্যে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আমার দেহ কায়েম থাকে।

আবু ইয়াযীদ বলিলেন—বৎস! দেহ তো আল্লাহর সাথেই কায়েম থাকে।

ইবরাহীম খাওয়াস বলেন—আবু তুরাবের একজন মুরীদ তিন দিন অনাহারে থাকার পর তরমুজের এক খণ্ড বাকলার দিকে হাত বাড়ায়। আবু তুরাব ইহা দেখিয়া বলিলেন—ওহে সূফী! তুমি তাছাওউফের উপযুক্ত নও। তোমার উচিত বাজারে থাকা।

আবুল কাসেম বলেন—আবুল হাসান নাসিরী তাহার মুরীদগণ সহ এক সপ্তাহ কাল অনাহার অবস্থায় হরম শরীফে অবস্থান করিতে থাকেন। একজন মুরীদ প্রয়োজন বশত কোথাও যাওয়ার সময় রাস্তায় একখণ্ড তরমুজের বাকলা দেখিয়া উঠাইয়া খাইয়া ফেলে।

কোন এক ব্যক্তি উহা দেখিয়া কিছু আহার্য লইয়া তাহার পিছনে পিছনে গমন করে এবং সমলের সম্মুখে আসিয়া সেই খাবার রাখিয়া দেয়।

শায়খ আবুল হাসান বলিলেন—তোমাদের মধ্যে কে এই পাপের কাজ করিয়াছে?

সেই মুরীদ বলিল—হযরত আমি রাস্তায় এক টুকরা তরমুজের বাকলা পাইয়া খাইয়াছিলাম।

শায়খ বলিলেন—তুমি তোমার পাপ লইয়া থাক। আর এই খাবার সামলাও।

এই বলিয়া আবুল হাসান অন্যান্য মুরীদদিগকে সাথে লইয়া হরম শরীফ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত ব্যক্তিও তাহার পিছনে রওয়ানা হইল। শায়খ বলিলেন—আমি তোমাকে না তোমার পাপ লইয়া থাকিতে বলিয়াছি।

উক্ত মুরীদ বলিল—আমি ভবিষ্যতের জন্য তওবাহ করিতেছি।

শায়খ বলিলেন—তওবাহ করার পর আর কিছু বলবার থাকে না।

বেনান ইবনে মুহাম্মদ বলেন—আমি মক্কার মুজাবের ছিলাম। সেখানেই ইবরাহীম খাওয়াছের সাথে আমার দেখা হয়। একবার

Contents

কয়েকদিন পর্যন্ত আমি অনাহারে থাকি।

মক্কায় একজন হাজাম ছিল। সে ফকীরদিগকে খুব মহব্বত করিত। তাহার নিয়ম ছিল কোন ফকীর তাহার নিকট শিঙ্গা লাগাইতে গেলে সে বাজার হইতে মাংস আনিয়া রান্না করাইয়া খাওয়াইত।

আমি তাহার সম্মুখে শিঙ্গা লাগাইতে বসিলাম। আমার নফস আমাকে বলিল—শিঙ্গা লাগানো শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি রান্না শেষ হইবে?

এমন সময় আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি বলিলাম—হে নফস! এই খাওয়ার লালসাই তো শিঙ্গা লাগাইতে আসিয়াছ। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম হাজামের কিছুই আমি খাইব না।

অতঃপর শিঙ্গা লাগানো শেষ হইলে আমি রওয়ানা হইলাম। হাজাম আমাকে বলিল—ভাই তুমি তো আমার নিয়ম অবগত আছ। আমি বলিলাম—আমি না খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

অতঃপর হরম শরীফে চলিয়া আসিলাম। সেখানেও দুই দিন পর্যন্ত খাওয়ার কিছু জুটিল না। আসরের নামাযের সময় আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। লোক আমার আশে পাশে সমবেত হইল এবং মনে করিল—আমি পাগল। এমন সময় ইবরাহীম খাওয়াছ সেখানে আসিয়া লোক সরাইয়া দিয়া আমার সাথে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিছু খাইবে?

আমি বলিলাম—রাত হইতেও তো আর বেশী বাকী নাই।

তিনি বলিলেন—সাবাস! দৃঢ় থাক,নাজাত পাইবে।

এশার নামাযের পর দুইখানি রুটি এবং এক পেয়ালা ডাল আনিয়া আমাকে বলিলেন—খাও।

খাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—আরও খাইবে? আমার সম্মতি পাইয়া আরও দুইখানি রুটি এবং এক পেয়ালা ডাল আনিয়া দিলেন। আমি উহা খাইয়া এমন ঘুম দিলাম যে, সেই রাতে নামায পড়া এবং তাওয়াফ করা হইল না।

আলী রাউজবারী বলেন—পাঁচ দিন অনাহারে থাকার পরও যদি কোন সূফী বলে যে, আমি ক্ষুধার্ত তবে তাহাকে বাজারে গিয়া জীবিকার সন্ধান করিতে বল।

আহমদ সগীর বলেন—আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ আমাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন—ইফতার করার জন্য প্রত্যহ আমাকে দশটি করিয়া আঙ্গুর দিবে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হওয়ায় একদিন পনরটি আঙ্গুর দিলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন—এই নির্দেশ তোমাকে কে দিয়াছে? ইহার পর তিনি দশটি আঙ্গুরই খাইলেন। পাঁচটি অবশিষ্ট রহিল।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে খাফীফ বলেন—আমি প্রথমাবস্থায় চল্লিশ মাস পর্যন্ত সন্ধ্যার সময় মাত্র এক মুঠি শাক দিয়া ইফতার করিতাম। একদিন আমি আমার রগের দুষিত রক্ত বাহির করিতে গেলাম। মাংস ধোয়া পানির মত সামান্য তরল পদার্থ বাহির হইল। চিকিৎসক বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল—আমি রক্তহীন এমন লোক আর কখনও দেখি নাই।

গ্রন্থকার বলেন—সূফীদের কেহ কেহ মাংস খাইতেন না। তাহারা বলিতেন—এক দেরহাম পরিমাণ মাংস খাইলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অন্তর শক্ত থাকে।

আবার কেহ কেহ যে কোন প্রকার সুস্বাদু আহার্য হইতে বিরত থাকেন। প্রমাণস্বরূপ বলেন—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—নফসকে ভাল আহার্য হইতে বঞ্চিত রাখ। কারণ, ইহার সহায়তায়ই শয়তান রগে রগে চলিতে সমর্থ হয়।

আবার কেহ কেহ ঠাণ্ডা পানির পরিবর্তে গরম পানি পান করিতেন। আবার কেহ কেহ নফসকে শাস্তি দেওয়ার মানসে খাওয়ার কোন কিছু খাইতেন না।

আবু ইয়াযীদ বলেন—আদম সন্তান যাহা কিছু খায় আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উহা খাই নাই। খুব ভাল ব্যবহার এতটাই করিয়াছি যে, একবার নফসকে কোন এক কাজ করিতে বলায় সে অস্বীকার করে। তখন আমি বলিলাম—হে নফস! তোমাকে এক বৎসর পর্যন্ত পানি দিব না।

গ্রন্থকার বলেন—আবু তালেব মক্কী সূফীদের পানাহার সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি উহাতে বলিয়াছেন—সূফীদের কর্তব্য দিবারাত্র মাত্র দুইখানা রুটি আহার করা।

আবু তালেব বলিয়াছেন—কোন কোন সূফী চেষ্টা করিয়া আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিতেন। কম আহার করিলে শরীরের রক্ত কম হইয়া সাদা হইয়া যায়। এই সাদা আল্লাহর নূর। ক্ষুধার্তে অবস্থায় অন্তরের চর্বি গলিয়া অন্তরকে কোমল করে। অন্তরের কোমলতা কাশফের চাবিকাঠি।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী বলেন—প্রাথমিক অবস্থায় সূফীদের কর্তব্য একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখার পর ইফতার করা। ছোট গ্রাসে তরকারী ব্যতীত আহার করা। ফলমূল, সুস্বাদু খানা, ভাই বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং কিতাব অধ্যয়ন পরিত্যাগ করা। কারণ এই সব নফসের আনন্দ দানকারী।

আবার কেহ কেহ চল্লিশ দিনের জন্য চেষ্টা করার নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তাহারা ভাত রুটি না খাইলেও ভাল ফল ও উহার রস খাইয়া থাকেন।

উপরোক্ত বর্ণনামতে শয়তানের চক্রান্ত

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে—উহা নাজায়েয কাজ। কারণ, উহা দ্বারা নফসকে অযথা কষ্ট দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাহারা কেন ফলের বাকলা এবং ভূষি খাইবে। ইহা তো পশুর খাদ্য।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—পানাহার করিয়া শক্তি অর্জন করতঃ দাঁড়াইয়া নামায পড়ার চেয়ে ক্ষুধায় কাতর থাকিয়া বসিয়া নামায পড়া অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

গ্রন্থকার বলেন—ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করার জন্য পানাহার করাও ইবাদত। কারণ, সে ইবাদত করার জন্য সাহায্য কামনা করিয়াছে। আর যখন কেহ অনাহারে থাকিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়ার শক্তি হারাইয়া ফেলে তখন সে নিজেই ফরয অনাদায়ের জন্য দোষী হইবে। সুতরাং অনাহারে থাকা নাজায়েয। তাছাড়া এমন অনাহারে থাকা কি লাভ যাহা ইবাদতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বেকার করিয়া দেয়।

হাম্মাদ বলিয়াছেন—এলম ও ইয়াকীনের যাচাই করিতেছি ; দেখি কে জয়লাভ করে।

ইহা অজ্ঞতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, এলম এবং ইয়াকীন পরস্পর বিরোধী নয়। এলমের উচ্চ মার্গই ইয়াকীন। ইহা কোন এলম এবং ইয়াকীনের মধ্যে পরিগণিত যে সে নফসের প্রয়োজনীয় বস্তু পানাহার হইতে বিরত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে হাদ্দাদ এলম দ্বারা শরীয়ত এবং ইয়াকীন দ্বারা ধৈর্যের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অথচ ইহাও ভুল। ইহারাই বেদআতের প্রবর্তনকারী। যুনযুন বলিয়াছিলেন—তোমার লবণ মিহিন ; তুমি মুক্তি পাইবে না। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা। যে ব্যক্তি মোবাহ বস্তু ব্যবহার করে তাহাকে কিভাবে বলা যাইতে পারে যে পরকালে তোমার মুক্তির পথ বন্ধ।

আবু সোলায়মান বলিয়াছেন—মাখন মধু সহকারে খাওয়া অযথা খরচ।

এমন কথা বলা অন্যায়। কারণ, যাহা শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ উহাই অযথা যায়। মাখন ও মধু খাওয়া শরীয়ত মতে জায়েয। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিঠাই দিয়া শশা খাইতেন, এবং মধু খুব পছন্দ করিতেন।

আবু ইয়াযীদ বলিয়াছেন—আমাদের খাদ্য তো আল্লাহর যিকর। ইহাও ভুল কথা। কারণ, পানাহারের উপরই শরীর তিষ্টিয়া থাকে। এমন কি দোযখবাসীও পানি এবং আহার্য চাহিবে।

তরমুজের বাকলা খাওয়ায় তিরস্কার করা ; তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিয়া নামাযের সময় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাওয়াও অন্যায় কাজ। বেলা ডুবিতে অল্প সময় আছে বলিয়া রোযা না ভাঙ্গার ইচ্ছা প্রকাশ করা এবং ইবরাহীম খাওয়াছের ধন্যবাদ দেওয়াও নাজায়েয। ইবরাহীম খাওয়াছের উচিত ছিল তখনই তাহাকে খাওয়ানো। জীবন নাশের আশঙ্কা থাকিলে রমযানের রোযাও ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—রমযান মাসে রোযা রাখিলে যদি অসুবিধা হয়, তথাপিও যদি রোযা না ভাঙ্গিয়া মারা যায় তবে সে দোযখে যাইবে।

গ্রন্থকার বলেন—ইবনে খাফীফের এত কম আহার করা দোষণীয়। যাহারা শরীয়ত সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহারাই ঐ সমস্ত লোকের প্রশংসা করার

জন্য এমন সব কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকে।

মাংস না খাওয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম। দেহের শক্তি বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা মাংস খাওয়া মোবাহ করিয়া দিয়াছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাংস খাইতেন এবং ছাগলের সামনের পায়ের মাংশ অধিক পছন্দ করিতেন।

হযরত হাসান বসরী প্রত্যহ মাংস ক্রয় করিতেন। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের এই নিয়মই ছিল। তবে হাঁ, যদি কেহ অর্থাভাবে মাংস না খাইতে পারিতেন তবে উহা ভিন্ন কথা।

কিন্তু সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ মাংস না খায় তবে খুবই অন্যায়। কারণ, আল্লাহ তাআলা গরম, ঠাণ্ডা, শুষ্ক এবং আর্দ্রতার সমন্বয়ে দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বাস্থ্য নির্ভর করে রক্ত, শ্লেম্মা, অম্ল এবং পিত্তের সমতুল্যতার উপর। ইহার কোনটার কম বেশী হইলেই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। সুতরাং স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য উহার কোনটার ঘাটতি হইলে গ্রহন করিতে হয় এবং বেশী হইলে কমাইয়া দিতে হয়। যেমন শ্লেম্মা কম হইলে দুধ পান করিতে হয়।

সুতরাং শরীর ঠিক রাখার জন্য যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন উহা গ্রহণ না করার অর্থই আল্লাহর কাজের উপর হস্তক্ষেপ করা। তাছাড়া ইহাতে স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। দেহ মানুষের যানবাহন স্বরূপ। যানবাহনের সাথে কোমল ব্যবহার না করিলে গন্তব্য স্থলে পৌছা যায় না। জ্ঞানের স্বল্পতাই তাহাদিগকে এইভাবে বিপথে পরিচালিত করিতেছে।

তাহারা কখনও প্রমাণ দিলে এমন সব হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেয় যাহার দুর্বল এবং মাউযু। আবু হামেদের কাজে আমি বিস্মিত হই যে তিনিও একজন বিজ্ঞ লোক হইয়া সূফীদের এই সমস্ত কাজের সমর্থন জোগাইয়াছেন। তিনি এমনও বলেন যে—মুরীদের যখন স্ত্রী সহবাস করার ইচ্ছা হয় তখন তাহার কর্তব্য অনাহারে থাকা। যাহার ফলে তাহার এই ইচ্ছা তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপ করিলে নফস তাহার উপর প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারিবে না।

সহীহ হাদীসে কি বর্ণিত নাই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই গোসলে সমস্ত মহিষীদের নিকট গিয়াছেন। কেন তিনি

একজনের সহচর্যই যথেষ্ট মনে করেন নাই? তিনি কি মিঠাই দিয়া শশা খান নাই? তিনি কি আবুল হাসিম ইবনে বাতহানের গৃহে ভুনা গোশত, রুটি এবং মিষ্টি খাওয়ার পর ঠাণ্ডা পানি পান করেন নাই।

সুফইয়ান সাওরী মাংস, আঙ্গুর এবং ফালুদা খাইতেন। খাওয়ার পরপরই উঠিয়া নামাযে দাঁড়াইতেন। ঘোড়াকে কি ঘাস, ছোলা দেওয়া হয় না। মানব দেহও ঘোড়ায় ন্যায়।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সর্বদা এক সাথে দুই প্রকার তরকারী এই জন্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন যে, উহা অভ্যাস হইয়া গেলে ভবিষ্যতে হয়ত এই অভ্যাসের দরুন কষ্টও হইতে পারে। তাহারা শুধু অপব্যয় করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

সূফী সম্প্রদায় এই হাদীস প্রমাণস্বরূপ বলে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—উপাদেয় পানাহার হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিয়া রাখ। এই হাদীস বর্ণনাকারী নবী মিথ্যাবাদী।

সর্বদা যবের রুটি এবং মোটা লাভ খাইলে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছা কমিয়া যায়। কারণ, যবের রুটির প্রতিক্রিয়া শুস্ক। মোটা লবণ কোষ্ঠ কাঠিন্য সৃষ্টি করে। ইহা মস্তিস্ক এবং চোখের উপর দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

ইউসুফ হামদানী বলেন—আমার পীর তরকারী বিহীন ভুট্টার রুটি খাইতেন। তাহার সাগরিদগণ তৈল অথবা চর্বি দ্বারা রুটি ভাজিয়া খাইতে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

গ্রন্থকার বলেন—ইহা খুব অন্যায় কথা। খুব পেট ভরিয়া খাওয়া অন্যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আহার করার নির্দেশ দিয়াছেন—উহাই পানাহারের উত্তম নীতি। মেকদাম ইবনে মাদী কারিব হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—পেট ভরিয়া খাওয়া সবচেয়ে অন্যায়। আদম সন্তানের জন্য কয়েক গ্রাস আহার করাই যথেষ্ট—যাহা তাহার শিরদাড়াকে সোজা রাখিবে। আর যদি অসুবিধা হয় তবে পেটের দুই তৃতীয়াংশ পানি ও শ্বাস গ্রহণ করার জন্য খালি রাখিবে।

মানুষ যেই পরিমাণ আহার করিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পরিমাণ আহার করারই নির্দেশ দিয়াছেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী অর্থাৎ পেটের দুই তৃতীয়াংশ খালি রাখার কথা যদি সক্রেটিস জানিতে পারিতেন তবে ইহার অন্তর্নিহিত হেকমত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া যাইতেন। কারণ, পানি এবং আহার্য পেটে গিয়া ফুলিয়া উঠে। ফলে শ্বাস গ্রহণ করার জন্য কিছু খালি স্থানের প্রয়োজন হয়। খাওয়ার সময় এক তৃতীয়াংশ খালি না রাখিলে পরে শ্বাস লইতে খুবই অসুবিধা হয়।

বর্ণিত আছে, সূফী সম্প্রদায় মুরীদদের প্রথমাবস্থায় এবং যুবকদিগকে কম আহার করার নির্দেশ দেন। অথচ কম আহারে যুবকদেরই বেশী ক্ষতি হয়। কারণ, বৃদ্ধ ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেও যুবক পারে না। কেননা যুবকের হযম শক্তি বেশী তাই তাহাদের ক্ষুধাও বেশী। এই অবস্থায় যদি তাহাদিগকে কম খাইতে হয় তবে তাহাদের দেহ কাঠামো মজবুত এবং যথাযথভাবে বাড়িতে না পারিয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

আকাবাহ ইবনে মুকাররম ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট বলিয়াছেন—নিজে কম খাওয়া এবং অন্যকে কম খাইতে উপদেশ দেওয়া আমার নিকট পছন্দনীয় নহে।

ইসহাক ইবনে দাউদ বলেন—আমি আবদুর রহমান ইবনে মাহদীকে বলিলাম—হে আবু সাঈদ! আমাদের শহরে এমন কিছু সংখ্যক সূফী আছে যাহাদের কেহ কেহ পাগল আর কেহ কেহ যিন্দীক হইয়া গিয়াছে। ইহা অনাহারে থাকারই ফল।

তিনি আরও বলিলেন—একবার সুফইয়ান সাওরী সফরে যাওয়ার সময় দেখিলাম—তাহার সাথে ফালুদা এবং ছাগ মাংস ছিল।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন—একবার এক সূফী আমার নিকট আসিয়া বলিল—আজ পনর বৎসর যাবত শয়তান আমাকে ধোকা দিতেছে এবং বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি আল্লাহ সম্বন্ধে খুব চিন্তা ভাবনা করি যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কি?

আমি বলিলাম—আমার মনে হয় তুমি সর্বদা রোযা রাখ। মধ্যে মধ্যে রোযা ভাঙ্গ, চবিতে তৈরী খাদ্য খাও এবং ওয়ায নসীহত শ্রবণ কর।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তুমি খাইতে কেন নিষেধ করিতেছ?

অথচ তুমিই বর্ণনা করিয়াছ যে, হযরত ওমর (রাযিঃ) প্রত্যহ এগার গ্রাস খাদ্য গ্রহণ করিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাযিঃ) সপ্তাহভর কোন কিছু খাইতেন না। ইবরাহীম তামীমী দুই মাস পর্যন্ত অনাহারে রহিয়াছেন।

উত্তর এই যে, সময় সময় এরূপ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সর্বদা তাহারা এই নিয়ম পালন করেন না। আবার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের মধ্যে কেহ কেহ প্রয়োজন বোধে এমন অভ্যাস করিতেন। সুতরাং অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় তাহাদের দেহের তেমন কোন ক্ষতি হইত না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—হযরত ওমর (রাযিঃ)কে পাত্র ভরিয়া খুরমা খেজুর দেওয়া হইত। তিনি উহা খাইয়া ফেলিতেন।

হযরত ইবরাহীম আদহামকে কেহ মাখন, মধু এবং সাদা রুটি ক্রয় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনিও এমন উপাদেয় খাদ্য খান?

তিনি বলিলেন—যখন সম্ভব হয় তখন মরদের মত খাই আর যখন সম্ভব হয় না তখন মরদের মতই ধৈর্য ধারণ করি।

অবশিষ্ট রহিল গরম পানি পান কর। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একজন আনসার রোগী দেখিতে যান। সেখানে গিয়া তিনি পানি চাহিলেন। নিকটে একটি কূপ ছিল। তিনি বলিলেন—রাতের রাখা পানি যদি মটকায় থাকে তবে দাও। না থাকিলে এই কূপ হইতেই উঠাইয়া দাও।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কূপ হইতে পরিস্কার এবং মিঠা পানি আনা হইত।

গরম পানি পান করিলে হযম শক্তি কমাইয়া দেয়, দেহে অলসতা আসে এবং শরীর দুর্বল করে। সূর্যের গরম পানি ব্যবহার করিলে শরীর অবশ হওয়ার ভয় থাকে। পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা পানি পান করিলে হযমী শক্তি বাড়ায়, শরীর ও মস্তিস্ক ঠাণ্ডা থাকে, দেহে কর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করে।

কোন কোন সূফীর অভিমত যখন তুমি ভাল আহার্য গ্রহণ করিবে এবং ঠাণ্ডা পানি পান করিবে তখন মৃত্যুকে স্মরণ করা তো ভুলিয়া যাইবে।

আবু হামেদ গাযালী বলেন—সুস্বাদু খানা খাইলে অন্তর কঠিন হইয়া যায়, মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। যখনই নফসের আকাঙ্খিত বস্তু তাহাকে দেওয়া না হয় তখনই নফস এই কষ্ট পাওয়ার দরুন মৃত্যুর আকাঙ্খী হইবে।

গ্রন্থকার বলেন—একজন ফেকাহবিদ লোক এই কথা কিভাবে বলিতে পারেন? তাহাদের কি এই ধারণাই যে নফসকে কোন প্রকার কষ্টে নিপতিত করিলেই সে মৃত্যুর আকাঙ্খা করিবে? তাছাড়া নফসকে কষ্টে নিপতিত করা কিভাবে জায়েয হইতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ -

"তোমরা তোমাদের নফসকে মারিয়া ফেলিও না।"

বিদেশ ভ্রমণকালে আল্লাহ তাআলা আমাদের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করতঃ দয়া পরবশ হইয়াই রোযা খোলার অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ بِكُمُ الْيُسْرَ لَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাথে কোমলতা চান কঠোরতা নয়। নফস কি আমাদের এমন যানবাহন নয় যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারি?

আবু ইয়াযীদ এক বৎসর পর্যন্ত পানি পান না করিয়া খুবই অন্যায় করিয়াছেন। কেননা, আমাদের উপর নফসের হক আছে। হকদারের হক আদায় না করা অত্যন্ত অন্যায় ; নফসকে কষ্ট দেওয়া কখনও মানুষের জন্য জায়েয নহে। তদ্রূপ সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকাও অন্যায়।

হিজরত করার সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানাহারের বস্তু সাথে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাকে আরাম করার জন্য হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কোন এক টিলার ছায়ায় বিছানা করিয়া দিয়াছিলেন। একটি পেয়ালায় দুধ দোহন করিয়া উহাতে পানি ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। নফসের সাথে কোমল ব্যবহার করার মানসেই এই সব করিয়াছিলেন।

তিরমিযীর বর্ণনামতে মুরীদ হওয়ার পর দুই মাস পর্যন্ত একাদিক্রমে রোষ থাকার পর ইফতার করার কি কারণ থাকিতে পারে? মানুষ কিতাবপত্র অধ্যয়ন না করিলে কোন পথে অগ্রসর হইবে? ইহা তাহাদের মনগড়া রীতিনীতি, ধর্মের নিয়ম কানুনের সাথে কোন সম্পর্কই নাই।

সাঈদ ইবনে মুসাইব বলেন—একদিন ওসমান ইবনে মাযউন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে এমন সব কিছু কাজ করার ইচ্ছা হয় যাহা আপনার নিকট প্রকাশ না করা পর্যন্ত কার্যকরী করিতে চাই না।

এরশাদ করিলেন—কি কাজ?

ওসমান বলিলেন—ইচ্ছা হয় আমি খাসী হইয়া যাই। অর্থাৎ কাম ইচ্ছা দূর করিয়া দেই।

এরশাদ করিলেন—হে ওসমান! একটু থাম এবং শোন। রোযা রাখাই আমার উম্মতের জন্য খাসী হওয়া। অর্থাৎ রোযা রাখিলেই কাম লালসা কমিয়া যায়।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় আমি পাহাড়ে চলিয়া গিয়া নির্জনতা অবলম্বন করি।

এরশাদ করিলেন—ওসমান! একটু থাম এবং শোন। আমার উম্মতের পক্ষে বৈরাগ্য এই যে মসজিদে বসা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় আমি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করি।

এরশাদ করিলেন—হে ওসমান! একটু থাম এবং শোন। জিহাদ কর, হজ্জ এবং ওমরা করাই আমার উম্মতের জন্য দেশ ভ্রমণ করা।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় আমার ধনসম্পদ হইতে আমি দূরে সরিয়া থাকি।

এরশাদ করিলেন—হে ওসমান! একটু থাম এবং শোন। প্রত্যহ দান করা, নিজের সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করা, ইয়াতীম মিসকীনকে সাহায্য করা এবং তাহাদিগকে পানাহার করানো ধনসম্পদ হইতে দূরে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা আমার স্ত্রীকে তালাক দেই।

এরশাদ করিলেন—একটু থাম এবং শোন। আমার উম্মতের পক্ষে হিজরত হইল—আল্লাহ যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন—উহা পরিত্যাগ করা। আমার জীবিতাবস্থায় হিজরত করিয়া আমার নিকট আসা। আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করা এবং নিজের মৃত্যুর পর এক, দুই, তিন অথবা চারিজন স্ত্রী রাখিয়া যাওয়া।

ওসমান বলিলেন—ইহা রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় স্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করি।

এরশাদ করিলেন—ওসমান একটু থাম এবং শোন! মুসলমান যখন তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে এবং সেই সঙ্গমে কোন সন্তান না হইলেও বেহেশতে সে একজন দাসী পাইবে। আর যদি সন্তান হয় এবং তাহার পূর্বেই মারা যায় তবে সেই সন্তান কেয়ামতের দিন তাহার জন্য শাফায়াত করিবে। আর যদি তাহার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে তবে কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর স্বরূপ হইবে।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় আমি মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করি।

এরশাদ করিলেন—হে ওসমান একটু থাম এবং শোন। মাংস আমার প্রিয় খাদ্য। যখন পাই খাই। যদি আমি আমার প্রভুর নিকট বলি যে, আমাকে প্রত্যহ মাংস খাওয়াইও তবে তাহা দান করিবেন।

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় সুগন্ধি ব্যবহার করা পরিত্যাগ করি।

এরশাদ করিলেন—হে ওসমান একটু থাম এবং শোন। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সময় সময় সুগন্ধি ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। শুক্রবার তো আমি কোনমতেই সুগন্ধি ব্যবহার করা পরিত্যাগ করি না। হে ওসমান! আমার তরীকার বিরোধিতা করিও না। যে আমার নীতির বিরোধিতা করে এবং সেই অবস্থায় বিনা তওবায় মারা যায় ফেরেশতাগণ তাহাকে আমার হাউযের নিকট হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একবার ওসমান

ইবনে মাযউনের স্ত্রী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিষীদের নিকট আলু থালু বেশে উপস্থিত হইল। উম্মুল মোমেনীনগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কুরায়েশদের মধ্যে তোমার স্বামীর চেয়ে তো কেউ বেশী ধনী হয়। (তবে তোমার এই বেশ কেন?)

সে বলিল—ঐ ব্যক্তি দ্বারা আমার কোন উপকারই হয় না। সে সারারাত নামায পড়ে এবং সারা বৎসর রোযা রাখে।

উম্মুল মোমেনীনগণ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথা বলিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমানের সাথে সাক্ষাত করিয়া বলিলেন—ওহে ওসমান! তুমি কি আমার অনুসরণকারী নও?

ওসমান বলিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার বাবা মা উৎসর্গ হউক। এই কথা কেন বলিলেন?

এরশাদ করিলেন—তুমি কি সারারাত নামায পড় এবং সারা বৎসর রোযা রাখ?

ওসমান বলিলেন—জ্বি হাঁ।

এরশাদ করিলেন—এমন করিও না। কারণ, তোমার চোখের তোমার উপর হক আছে, তোমার দেহের তোমার উপর হক আছে, তোমার স্ত্রীর তোমার উপর হক আছে। নামাযও পড় আবার নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখ এবং ইফতারও কর।

কাহমাছ হেলালী বলেন—আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর খেদমতে নববীতে আসিয়া আমার ইসলাম গ্রহণ করার সংবাদ দিলাম। তারপর এক বৎসর পর্যন্ত দূরে থাকার পর আবার তাহার খেদমতে হাযির হইলাম। এই সময় আমার দেহ খুবই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং আমি খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই?

তিনি এরশাদ করিলেন—তুমি কে?

বলিলাম—আমি কাহমাছ হেলালী।

এরশাদ করিলেন—তোমার এই অবস্থা কেন?

আরয করিলাম—আপনার নিকট হইতে চলিয়া যাওয়ার পর একদিনের জন্যও রোযা ছাড়ি নাই এবং একটি রাতও নিদ্রা যাই নাই।

এরশাদ করিলেন—নফসকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তোমাকে কে নির্দেশ দিয়াছে। রমযান মাস পূর্ণ এবং তারপর প্রত্যেক মাসে একটি করিয়া রোযা রাখ।

আমি আরয করিলাম—আমার জন্য আরও কিছু বাড়াইয়া দিন।

এরশাদ করিলেন—পুরা রমযান মাস এবং তারপর প্রত্যেক মাসে দুইটি করিয়া রোযা রাখ।

আমি পুনরায় আরয করিলাম—আমার জন্য আরও কিছু বাড়াইয়া দিন।

এরশাদ করিলেন—রমযান পূর্ণ এবং তারপর প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখ।

আইউব আবু কালাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিতে পাইলেন যে, তাহার কিছু সংখ্যক সাহাবা স্ত্রী সহবাস এবং মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি খুব ধমকাইলেন এবং বলিলেন—আমি যদি পূর্বে তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতাম। বৈরাগ্য দিয়া আল্লাহ আমাকে পাঠান নাই। বরং পবিত্র এবং সরল দ্বীনে ইবরাহীমের সাথে প্রেরণ করিয়াছেন।

তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে ধোকা

আহমদ ইবনে আবু হাওয়ারী বলেন—আবু সোলায়মান দারানী বলিতেন যদি আমাদের তাওয়াক্কোল থাকিত অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভরসা থাকিত তবে আমরা বাড়ীতে প্রাচীর দিতাম না এবং চোরের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিতাম না।

যুননুন মিসরী বলেন—আমি বহু বৎসর সফর করিয়াছি, কিন্তু একবার ব্যতীত আর কখনও আমার তাওয়াক্কোল দুরুস্ত ছিল না। সেইবার আমি নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইতেছিলাম। হঠাৎ

নৌকা ডুবিয়া যায়। আমি একখানি তক্তা ধরিয়া ভাসিতেছিলাম।

আমার অন্তর আমাকে বলিল—আল্লাহ তাআলা যদি ডুবিয়া মরা তোমার ভাগ্যে লিখিয়া থাকেন, তবে এই তক্তা তোমার কোন কাজেই আসিবে না। অতঃপর আমি তক্তা ছাড়িয়া দিলাম এবং সাতার কাটিয়া তীরে পৌছিলাম।

হযরত জোনাইদ বাগদাদী বলেন—আমি আবু ইয়াকুব যিয়াতের নিকট তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার নিকট রক্ষিত একটি দেরহাম দান করিয়া দিয়া যথাযথ উত্তর দিলেন। পরে বলিলেন—আমার নিকট কিছু সম্পদ থাকুক আর আমি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে কিছু বলি—ইহাতে আমার খুবই লজ্জা হইতেছিল।

আবু নসর সেরাজ বলেন—আবদুল্লাহ ইবনে জালার নিকট কোন এক ব্যক্তি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার নিকট তাহার মুরীদগণ বসা ছিল। তিনি উহার উত্তর না দিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন এবং একটি থলি লইয়া মুরীদগণের সামনে আসিলেন। উহার মধ্যে চারিটি দাং ছিল। তিনি উক্ত চারি দাং—এর কিছু ক্রয় করিয়া আনিতে নির্দেশ দিলেন। এবং পরে মাসয়ালার উত্তর দিয়া বলিলেন—আমি আল্লাহর নিকট লজ্জিত হইতেছিলাম যে, আমার নিকট চারিটি দাং থাকুক আর আমি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে কিছু বলি।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—যে ব্যক্তি পেশা সম্বন্ধে দোষারোপ করে সে যেন সুন্নতকে দোষারোপ করিল। আর যে ব্যক্তি তাওয়াক্কোল সম্বন্ধে দোষারোপ করে সে যেন ঈমান সম্বন্ধে দোষারোপ করিল।

গ্রন্থকার বলেন—অজ্ঞতার দরুনই তাহারা এই ভুলের শিকার হইয়াছে। তাহারা যদি তাওয়াক্কোলের প্রকৃত অর্থ বুঝিত তবে দেখিতে পাইত যে, তাওয়াক্কোল এবং উপকরণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, তাওয়াক্কোলের অর্থ এই যে, অন্তর শুধু আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল থাকিবে। দেহকে উপকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখা এবং সম্পদ সঞ্চয় করা উপরোক্ত অর্থের বিরোধী নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا -

যে সম্পদকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য দান করিয়াছেন উহা নাদানদিগকে দিও না।

قياما শব্দের অর্থ তোমাদের দেহ উহার জন্যই অবশিষ্ট থাকে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—

نعم المال الصالح للرجل الصالح -

যেই সম্পদ নেক লোকের কাজে আসে উহাই ভাল সম্পদ।

তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন—

মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরার চেয়ে সম্পদশালী রাখিয়া যাওয়া ভাল।

মনে রাখিও যিনি তাওয়াক্কোল করার আদেশ করিয়াছেন তিনিই অস্ত্র-শস্ত্রসজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন—

خذوا خذركم

অর্থাৎ তোমাদের অস্ত্র সংবরণ কর।

আরও ইরশাদ করিয়াছেন—কাফেরদের বিরুদ্ধে যত শক্তি সঞ্চয় করিতে পার—কর।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের সময় ভিতর বাহিরে দুইটি বর্ম পরিধান করিয়াছিলেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। একবার তিনি বলিয়াছিলেন—আজ রাতে কে আমাকে পাহারা দিবে। তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত জাবের হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল—আমি কি আমার উট বাধিয়া তাওয়াক্কোল করিব, না ছাড়িয়া দিয়া তাওয়াক্কোল দিয়া করিব? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—হাঁ, বাধিয়া রাখ এবং তাওয়াক্কোল কর। অর্থাৎ কাজ কর এবং ভরসা কর।

সুফইয়ান সাওরী বলেন—তাওয়াক্কোলের অর্থ এই যে, তাহার সাথে যাহা কিছু করা হইবে উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

ইবনে আকীল বলেন—একটি সম্প্রদায়ের ধারণা সতর্ক এবং সাবধান থাকা তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী। ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে ঐ সম্পর্কে চিন্তা না করাই তাওয়াক্কোল। আলেমদের মতে ইহা দুর্বলতা এবং বাড়াবাড়ি।

আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা অবলম্বন এবং চেষ্টা করার পরই তাওয়াক্কোল করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ করিয়াছেন—

وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

হে নবীবর ! আপনি আপনার সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করুন। যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

সতর্ক থাকিলে যদি তাওয়াক্কোলের কোন প্রকার ক্ষতি হইত তবে আল্লাহ তাহার নবীকে এমন কথা বলিতেন না। কারণ পরামর্শ করা তো উহার নাম যে যেই ব্যক্তির মধ্যে শত্রু হইতে সতর্ক এবং সাবধান থাকার সামর্থ আছে তাহার পরামর্শ লওয়া।

সুতরাং সাবধান ও সতর্ক থাকা তাওয়াক্কোলের পরিপন্থী নয়। যখন হযরত মূসা (আঃ)কে বলা হইয়াছিল—

إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُوْنَ بِكَ -

অর্থাৎ, 'সর্দারগণ তোমাকে বন্দী করার ফন্দি করিতেছে' তখন হযরত মূসা (আঃ) তাহাদের নাগাল হইতে বাহিরে চলিয়া যান।

হযরত আবু বরক (রাযিঃ)কে সাপের দংশন হইতে রক্ষা করার মানসে গুহার গায়ের গর্তগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সতর্ক থাকার জন্য হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাহার পুত্র ইউসুফ (আঃ)কে কুরআনের ভাষায় বলিয়াছিলেন—

لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ -

স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের নিকট বলিও না।

বিপদাপদ আল্লাহর দান এবং উহা হইতে বাঁচার পথও আল্লাহ বলিয়া দিয়াছেন। যেমন আহার্য পেট ভরার উপকরণ এবং ঔষধ রোগ আরোগ্য হওয়ার উপকরণ। এখন যদি কেহ এই সমস্ত উপকরণ পরিত্যাগ

করিয়া প্রয়োজন সমাধা হওয়ার জন্য দোআ করে তবে উহার উত্তর এই পাইবে যে—তোমার প্রয়োজন সমাধা হওয়ার জন্য যেই সমস্ত উপকরণ আমি দিয়াছি তুমি উহা কাজে না লাগাইয়া উহাকে অযথা মনে করিয়াছ। অধিকাংশ সময় আমি উপকরণ ব্যতীত প্রয়োজন সমাধা করি না।

গ্রন্থকার বলেন—এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তকদীরে যাহা লিখিত আছে তাহা অবশ্যই হইবে। সুতরাং কিভাবে সতর্ক থাকা যাইতে পারে?

উহার উত্তর এই যে, হুকুম এবং ফরমান মওজুদ আছে তবে কেন সতর্ক থাকা যাইবে না? যিনি তকদীরের মালিক তিনিই তো জ্ঞান দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'হাতিয়ার সংবরণ কর।'

কথিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) একদিন পাহাড় চূড়ায় নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় শয়তান আসিয়া বলিল—তোমার কি এই বিশ্বাসই যে, যাহা কিছু তকদীর অনুযায়ীই হইয়া থাকে?

হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন—নিশ্চয়ই।

শয়তান বলিল—তাহা হইলে তুমি পাহাড় চূড়া হইতে গড়াইয়া পড় এবং মনে কর যে, আমার তকদীরে ইহাই লিখিত ছিল।

হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন—ওহে মালঊন! আল্লাহ তাআলাই বান্দার আজমায়েশ করেন, বান্দা আল্লাহর আজমায়েশ করে না।

শয়তান লোকদিগকে এই বলিয়া ধোকা দিয়া থাকে যে, জীবিকার সন্ধান করা তাওয়াক্কোলের খেলাফ।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তশতরী বলেন—তাওয়াক্কোলের দোষারোপকারী ঈমানের দোষারোপকারী। আর যে জীবিকা অর্জনকে দোষ দেয় সে সুন্নতের দোষারোপকারী।

ইউসুফ ইবনে হুসাইন বলেন—যখন তুমি কোন মুরীদকে দেখিবে যে, সে শরীয়তের সহজ কাজগুলির সন্ধান করে এবং রোযগারে লিপ্ত থাকে তখন মনে করিবে যে, তাহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না।

গ্রন্থকার বলেন—এই সম্প্রদায় তাওয়াক্কোল শব্দের অর্থই বুঝে নাই। তাহারা মনে করে জীবিকার সন্ধান না করিয়া হাত পা অবশ করিয়া বসিয়া থাকার নামই তাওয়াক্কোল। যদি তাহাই হইত তবে আম্বিয়া

(আঃ)গণ মোটেই তাওয়াক্কোলকারী ছিলেন না। হযরত আদম (আঃ) কৃষি কাজ করিতেন। হযরত নূহ এবং যাকারিয়া (আঃ) মিস্ত্রী ছিলেন। হযরত ইদরীস (আঃ) দরজীর কাজ করিতেন। হযরত ইবরাহীম এবং লূত (আঃ) কৃষি কাজ করিতেন। হযরত সালেহ (আঃ) ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

হযরত দাউদ (আঃ) বর্ম তৈয়ার করিতেন। হযরত শোয়াইব, মূসা (আঃ) এবং আমাদের নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরী চরাইতেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন—আমি সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে মক্কবাসীদের বকরী চরাইতাম। আল্লাহ তাআলা মালে গনীমত দান করার পর তিনি আর এই কাজ করিতেন না। হযরত আবু বকর, ওসমান, তালহা আবদুর রহমান প্রমুখ সাহাবাগণ কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সাহাবাগণ ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। পরবর্তী বুযুর্গগণও জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন।

আতা ইবনে শায়েখ বলেন—হযরত আবু বকর (রাযিঃ) খলীফা হওয়ার পর কাপড়ের গাঠুরি লইয়া বাজারে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে হযরত ওমর এবং আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর সহিত সাক্ষাত হইলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোথায় যাইতেছেন?

তিনি বলিলেন—বাজারে।

তাহারা বলিলেন—আপনি খলীফা হইয়াও এই কাজ করিবেন?

তিনি বলিলেন—তবে আমার পরিবারের ভরণ পোষণ কিভাবে করিব?

ইহার পর সাহাবা কেরামগণ পরামর্শ করিয়া বৎসরে দুই হাজার দেরহাম বৃত্তি নির্ধারণ করেন। হযরত আবু বকর বলিলেন—আমার পরিবারের লোকসংখ্যা বেশী ইহাতে হইবে না। তারপর তাহারা আরও পাঁচশত দেরহাম বাড়াইয়া দিলেন।

গ্রন্থকার বলেন—কোন লোক যদি কোন সূফীকে জিজ্ঞাসা করে, আমি আমার পরিবারের ভরণপোষণ কিভাবে করিব? তখন বলিবে—তুমি মুশরিক হইয়া গিয়াছ। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কোন ব্যক্তি ব্যবসা করিতে

চায়—আপনার অভিমত কি? উত্তর দিবে সে আল্লাহরর প্রতি ভরসাকারী এবং ইয়াকীনকারী নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইহারা তাওয়াক্কোল এবং ইয়াকীনের অর্থই বুঝে না। ইহাদিগকে যদি বন্ধ দ্বার ঘরে রাখা হয় তবেই বুঝা যায় যে, ইহারা কত বড় তাওয়াক্কোলকারী। ইহারা হয় জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজেরা ভিক্ষা করে না হয় খাদেমদের দ্বারা বাড়ী বাড়ী হইতে ভিক্ষা করাইয়া আনে। কিংবা কোন উপাসনা গৃহে বসিয়া অন্যের দানের অপেক্ষায় তীর্থের কাকের ন্যায় বসিয়া থাকে।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন—হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইব বলিয়াছিলেন—যেই ব্যক্তি রোযী রোযগার ছাড়িয়া মসজিদে বসিয়া থাকে এবং যে যাহা দেয় তাহাই গ্রহণ করে তবে সে যেন বিনয় ও হীনতার সাথে ভিক্ষা করিল।

আবু তোরাব তাহার মুরীদদিগকে বলিতেন—তোমাদের মধ্যে যে কেহ তালি লাগানো জামা পরে সে ভিক্ষুক। আবার যে মসজিদ বা খানকায় বসিয়া থাকে সেও ভিক্ষুক।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিতেন—হে কারী সম্প্রদায়! নিজেদের মাথা একটু উঠাও। কারণ রাস্তা একেবারে পরিস্কার। পুণ্য অর্জনের জন্য ক্ষিপ্র হও। মুসলমানদের বোঝা হইয়া থাকিও না।

মুহাম্মদ ইবনে আসেম বলেন—হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন যুবকের অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে বলিতেন—একি কোন কাজ করে। যদি বলা হইত না, তবে তিনি বলিতেন—এ আমার দৃষ্টিতে খারাপ লোক।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, যেই ব্যক্তি বলে—আমি আমার গৃহে বা মসজিদে বসিয়া থাকিব, কোন কাজ কর্ম করিব না। আমার জীবিকা আমার নিকট আসিবেই। ইহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

ইমাম সাহেব বলিলেন—এই ব্যক্তি জ্ঞানবান নয়। তুমি শোন নাই যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমার জীবিকা আমার তরবারীর ছায়ার নিচে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন—

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ -

দ্বিতীয়তঃ ঐ সমস্ত লোক যাহারা দেশ ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর মেহেরবানীর সন্ধান করে।

আরও ইরশাদ করিয়াছেন—

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ رَبِّكُمْ -

তোমাদের প্রভুর মেহেরবানীর সন্ধান কর—ইহা তোমাদের জন্য দোষণীয় নয়।

সাহাবা কেরামগণ জল ও স্থলপথে বাণিজ্য করিতেন এবং তাহাদের বাগ–বাগিচার কাজ করিতেন। সুতরাং আমাদের কর্তব্য তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট এক ব্যক্তি বলিলেন—আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া হজ্জে যাইতে চাই। ইমাম সাহেব বলিলেন—তবে কাফেলা ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সেই ব্যক্তি বলিল—ইহা হইতে পারে না।

ইমাম সাহেব বলিলেন—তবে কি অন্যের থলির উপর ভরসা করিয়া যাইতে চাও?

আবু বকর মারুযী বলেন—আমি আবু আবদুল্লাহর নিকট বলিলাম—আজকাল তাওয়াক্কোলকারীগণ বলে যে, আমরা একস্থানে বসিয়া থাকিব জীবিকা আল্লাহ পৌঁছাইবেন।

আবু আবদুল্লাহ বলিলেন—ইহা তো মুখরোচক কথা। আল্লাহ তাআলা কি বলেন নাই—যখন জুমআর আযান দেওয়া হয় তখন বেচাকেনা বন্ধ করিয়া নামাযে চলিয়া যাও।

যে কোন কাজ করিতে বিমুখ সে অন্যের রোযগারের পয়সা কিভাবে গ্রহণ করে? তখন তাহার তাওয়াক্কোল কোথায় থাকে?

সালেহ বলেন—আমার পিতা আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল—কেহ যদি বলে আমি কাজ করিব না—বরং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া বলিব—এই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

আমার পিতা বলিলেন—এই ব্যক্তি বেদআতী।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট কেহ বলিল—আমি অবস্থাপন্ন লোক।

ইমাম সাহেব বলিলেন—ব্যবসায় বাণিজ্য কর। উহা দ্বারা তোমার আত্মীয় স্বজন উপকৃত হইবে এবং ছেলেসন্তান আরও সুখে থাকিবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন—আমি আমার ছেলেদিগকে বলিয়া দিয়াছি বাজারে যাওয়া আসা কর এবং ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাক।

যাহারা কাজে বিমুখ তাহারা অতি নিকৃষ্ট পর্যায়ের দলীল দিয়া থাকে। যেমন তাহারা বলিয়া থাকে আমাদের নির্ধারিত জীবিকা অবশ্য আমরা পাইব। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কথা। কেননা মানুষ যদি ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ করিয়া বলে যে—ইবাদত দ্বারা আমার তকদীর আমি পরিবর্তন করিতে পারিব না। আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাতী করিয়া থাকেন তবে জান্নাতে যাইব। আর যদি দোযখী করিয়া থাকেন তবে দোযখে যাইব।

ইহার উত্তর এই যে—তাহাদের এই কথা আল্লাহর সমস্ত হুকুম আহকামের বিরোধী। এমন কথা যদি জায়েয হইত তবে হযরত আদম (আঃ)কে যখন বেহেশত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তখন তিনি বলিতে পারিতেন—'আমার দোষ কি? আমার অদৃষ্টে যাহা লিখিত ছিল আমি তাহাই করিয়াছি।'

তাহারা আরও বলে, হালাল রোযী কোথায় পাইব যে করিব? ইহা জাহেলদের কথা। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—হালালও প্রকাশ্য, হারামও প্রকাশ্য।

ইবরাহীম খাওয়াছ বলেন—জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি মাছ ধরিতে গেলাম। প্রথম বারে জালে একটি মাছ আসিল আমি উহা রাখিয়া দিলাম। দ্বিতীয় বারে যেই মাছ আসিল আমি উহা ছাড়িয়া দিয়া বাড়ী ফিরিলাম। এমন সময় অদৃশ্য আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—'ওহে! ইহাই কি তোমার জীবিকা অর্জনের পথ? যেই জীব আমার যিকর করিতেছিল—উহা মারিয়া ফেলিলে?' ইহার পর আমি আর কোন দিন মাছ ধরি নাই।

গ্রন্থকার বলেন—এই কাহিনী যদি সত্য হয় তবে এই আওয়াজ ছিল শয়তানের। কেননা, আল্লাহ তাআলা শিকার করা নির্দোষ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং শিকার করিলে কেন দোষারোপ করিবেন? খোদার যিকর করে বলিয়া যদি আমরা মাছ শিকার না করি গরু ছাগল যবেহ না করি তবে আমাদের শরীরের শক্তি কোথা হইতে আসিবে। জীবজন্তু যবেহ না করা ব্রাহ্মণ ধর্মের নিয়ম, ইসলামের নয়।

নির্জনতা অবলম্বনে শয়তানের চক্রান্ত

শয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া কোন কোন সূফী পাহাড় পর্বতে গিয়া বৈরাগী জীবন যাপন করে ; জুমআ জমাআত পরিত্যাগ করে এবং কোন আলেমের সাথে সংশ্রব রাখে না। আবার কেহ কেহ তাহার নির্দিষ্ট উপাসনা গৃহে বসিয়া থাকে, নামাযের জন্য মসজিদে আসে না। আরামে বসিয়া থাকিয়া অন্যের দান–খয়রাতের উপর নির্ভর করে।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাহার রচিত 'ইয়াহ ইয়াউল উলূম' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—রিয়াযত অর্থ মনের একাগ্রতা। মানুষ যখন কোন অন্ধকার গৃহে অবস্থান করে, অথবা অন্ধকার গৃহ না থাকিলে মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে তখনই অন্তরের একাগ্রতা লাভ করা যায়। এই অবস্থায় সে হকের আওয়াজ শুনিতে পাইবে, মহান আল্লাহর জালাল মুশাহিদা করিবে।

গ্রন্থকার বলেন—আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম গাযযালীর মত একজন ফেকাহবিদ এই কথা কিভাবে বলিলেন। তিনি কিভাবে জানিতে পারিলেন যে—ঐ অবস্থায় যেই আওয়াজ শুনিবে উহা খোদারই আওয়াজ এবং যাহা দেখিবে উহা আল্লাহর জালাল। ইহা কেন বুঝা যাইবে না যে—উহার সমস্ত কিছুই ওয়াস ওয়াসা এবং ভুল ধারণা। যে ব্যক্তি কম আহার করে তাহার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

আবার যখন চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া চোখ বন্ধ করে তখন তাহার খেয়াল নানাদিকে দৌড়ায়। মস্তিস্কে তিন প্রকার শক্তি থাকে—ধারণা শক্তি, চিন্তা শক্তি এবং স্মরণ শক্তি।

স্মরণ শক্তির স্থান মস্তিস্কের সম্মুখ ভাগের পর্দা। চিন্তার স্থান মধ্যবর্তী পর্দা এবং স্মরণ শক্তির স্থান পিছনের পর্দা। মানুষ যখন মাথা

ঝুকাইয়া চোখ বন্ধ করে তখন চিন্তা এবং ধারণা শক্তি দূর হইয়া যায়।

আবু উবাইদ তছতরীর নিয়ম ছিল রমযান মাসের প্রথম তারিখে তাহার স্ত্রীকে বলিতেন—আমার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দাও। প্রত্যেক রাতে ছিদ্রপথে আমাকে একখানি করিয়া রুটি দিও। ঈদের দিন তাহার স্ত্রী স্বামীর গৃহে গিয়া দেখিত ত্রিশখানি রুটিই পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কিছুই তিনি খান নাই এবং এক অযুতেই ত্রিশ দিন কাটাইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন—দুইটি কারণে আমার নিকট এই কাহিনী ঠিক নয়। প্রথমতঃ একমাস পর্যন্ত একটি লোক কিভাবে পায়খানা প্রস্রাব এবং অযু ব্যতীত থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান হইয়া জুমআ এবং জমাআত কিভাবে পরিত্যাগ করিল? জুমআ এবং জমাআত পরিত্যাগ করা কখনও জায়েয নয়।

এইরূপ নির্জনতা অবলম্বন করা শরীয়ত বিরোধী।

কাসেম আবু ইমামাহ হইতে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহর সাথে আমরা একবার এক বাহিনীর সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন একটি গুহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় সেখানে কিছু পানি দেখিয়া বলিল—আমি জনসমাজ হইতে পৃথক হইয়া এখানেই থাকিব এবং ইহার চারি পাশে শাকপাতা আছে উহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি—তিনি অনুমতি দিলে থাকিব, অন্যথায় থাকিব না।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি ইরশাদ করিলেন—আমি ইহুদী এবং খৃষ্টানদের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত লইয়া আবির্ভূত হই নাই। বরং সঠিক শরীয়ত এবং সহজ ধর্ম সহ আগমন করিয়াছি। যাহার আয়ত্তে মুহম্মদের জীবন তাহার শপথ! সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পথে একবার পা উঠানো দুনিয়া এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার চেয়ে ভাল। জমাআতে নামাযের কাতারে দাঁড়ানো তোমাদের জন্য ষাট বৎসর নামায পড়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

বিনয়তা প্রকাশে ধোকা

আল্লাহর ভয় অন্তরে বিদ্যমান থাকিলে বাহিরে কোমলতা এবং বিনয়তা প্রকাশ পায়। মানুষ ইহা চাপিয়া রাখিতে পারে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কিন্তু ইহা গোপন করিয়া রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন দিনের বেলায় হাসিতেন আর রাতে কাঁদিতেন। আমাদের এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আলেমগণ জনসাধারণের মধ্যে বসিয়া চপলতা প্রকাশ করিবে। বরং ইহাতে তাহাদের অসুবিধাই হইবে।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিয়াছেন—যখন তোমরা এলম সম্বন্ধে আলোচনা কর তখন তোমাদের গাম্ভীর্য রক্ষা করিও। এলমকে হাসি–ঠাট্টার সাথে মিলিত মিশ্রিত করিও না—যাহার ফলে জনসাধারণ উহা অন্তর হইতে দূর করিয়া দেয়। ইহা রিয়া নয়। অবশ্য কৃত্রিম গাম্ভীর্য এবং কোমলতা প্রকাশ করা রিয়া।

আবার বহু খোদাভীরুকে দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহর ভয়ে তাহারা জীবন যাপন করে এবং কখনও আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া তাকায় না। অথচ ইহাতে ফযীলতের কিছুই নাই। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়তার চেয়ে আর কাহারও বিনয়তা বেশী হইতে পারে না।

হযরত আবু মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেন।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আকাশের নিদর্শনসমূহ দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করা মুস্তাহাব।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

اولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا ها –

উপরে আসমান কি তাহারা দেখে না যে, আমি উহা কিভাবে তৈয়ার করিয়াছি?

আরও বলেন—

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

বলুন, দেখ! যমিন এবং আসমানে আল্লাহর কি কি নিদর্শন রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন এক ব্যক্তিকে মাথা ঝুকাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—ওহে তোমার মাথা উঠাও। কেননা, অন্তরে যেই পরিমাণ বিনয়তা আছে বাহিরে উহার চেয়ে বেশী প্রকাশ করিও না। আর যেই ব্যক্তি অন্তরের বিনয়তার চেয়ে বাহিরে বেশী বিনয়তা প্রকাশ করে সে কপটতার উপর কপটতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) কোন এক ব্যক্তিকে চিন্তা বিজড়িত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে শুনিয়া তাহাকে ঘুষি মতান্তরে লাথি মারিয়াছিলেন।

ইবনে আবী খাইছামা তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, শেফা বিনতে আবদুল্লাহ কিছু লোককে অতি আস্তে চলিতে এবং কথা বলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহাদের এই অবস্থা কেন?

লোকে বলিল—ইহারা দরবেশ।

শেফা বলিলেন—খোদার কসম! হযরত ওমর যখন কথা বলিতেন—তখন সকলে শুনিত, দ্রুতপদে চলিতেন। আবার যখন কাহাকেও মারিতেন তখন শরীরের শক্তি দিয়া মারিতেন। অথচ তিনি সত্যিকারের দরবেশ ছিলেন।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তাহাদের অবস্থা গোপন করিয়া রাখিতেন। সুফইয়ান সাওরী কোন এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—যে নামায লোকে দেখিতেছে—উহাতে তোমার কি লাভ হইবে?

আবু উমামা কোন এক ব্যক্তিকে সেজদাহ রত দেখিয়া বলিলেন—এই সেজদাহ যদি তোমার গৃহাভ্যন্তরে হইত তবে কতই না ভাল হইত।

হারমালা বলেন—আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে এই অর্থযুক্ত কবিতা পাঠ করিতে শুনিয়াছি—

যেই ব্যক্তি তোমার নিকট মাথা নত করিয়া আসে তুমি তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ কর।

আর যখন একাকী থাকে তখন সে হিংস্র বাঘের ন্যায় স্বভাব সম্পন্ন হয়।

বিবাহ সম্বন্ধে শয়তানের ধোকা

ব্যভিচারী করার আশংকা থাকিলে বিবাহ করা ওয়াজিব। আশংকা না থাকিলে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। আর ইহাই ওলামা সম্প্রদায়ের অভিমত। ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন—এই অবস্থায় বিবাহ করা যাবতীয় নফল ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—বিবাহ করা সুন্নত। যে আমার সুন্নত হইতে ফিরিয়া থাকিবে সে আমার উম্মত নয়।

হযরত সাআদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসমান ইবনে মাযউনকে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদি নির্দেশ দিতেন তবে আমরা খাশী হইয়া যাইতাম।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—সাহাবাদের একটি দল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসিয়া কি কি কাজ করেন? তাহারা নবীজীর কাজের কথা বর্ণনা করিলে সাহাবাদের মধ্যে কেহ বলিলেন—আমি বিবাহ করিব না।

কেহ বলিলেন—আমি মাংস খাইব না।

কেহ বলিলেন—আমি রাতে শয়ন করিব না।

আবার কেহ বলিলেন—আমি প্রত্যেক দিন রোযা রাখিব। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া মিম্বরে দাঁড়াইয়া হামদ ও সানার পর বলিলেন—ইহারা কেমন লোক যে এমন সব কথাবার্তা বলে। আমি তো রাতে নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই, রোযাও রাখি আবার ইফতারও করি এবং বিবাহও করিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বিরোধী সে আমার নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন—এই উম্মতের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন যাহার স্ত্রী অধিক ছিল। অর্থাৎ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

শিদাদ ইবনে আওমান বলিয়াছেন—আমাকে বিবাহ করাইয়া দাও। কারণ, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিয়াছেন—আমি যেন অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহর সমীপে না যাই।

হযরত আবু যর (রাযিঃ) বলিয়াছেন—ইকাফ নামক এক ব্যক্তি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—ইকাফ! তুমি কি বিবাহ করিয়াছ?

—না।

—তোমার কোন দাসী আছে?

—না।

—তোমার অবস্থা সচ্ছল?

—জ্বি হাঁ।

ইরশাদ করিলেন—এই সময় তুমি শয়তানের ভাই। যদি তুমি খৃষ্টান হইতে তবে সন্নাসী রূপে খ্যাত হইতে। আমার সুন্নত বিবাহ করা। তোমাদের মধ্যে অবিবাহিত লোক খারাপ। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি খারাপ যে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে—অধিকাংশ সময়ই তাহার গৃহে পানাহারের কিছু থাকিত না। তথাপি তিনি বিবাহ করা পছন্দ করিতেন। এবং অন্যান্যকে বিবাহ করার উৎসাহ দিতেন। অবিবাহিত থাকিতে নিষেধ করিতেন। ইহার পরও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকে অপছন্দ করে সে কখনও সত্যের অনুসারী নয়।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) চিন্তা ভাবনার মধ্যে থাকাকালীনও বিবাহ করিয়াছেন এবং তাহার সন্তানাদি হইয়াছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমাকে মেয়েদের প্রতি স্নেহ ও প্রীতি দেওয়া হইয়াছে।

একবার কোন এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনে আদহামের নিকট অভিযোগ করিল যে—বিবাহ করিয়া সন্তান সন্ততির জ্বালায় খুব কষ্টভোগ করিতেছি।

তাহার কথা শেষ না হইতেই ইবরাহীম তাহাকে উচ্চস্বরে ধমক দিয়া বলিলেন—আমি পথ পাইয়াছি। আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখুন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সাহাবাগণ যেই পথে ছিলেন—তুমি উহার প্রতি খেয়াল রাখ। সন্তান তাহার পিতার নিকট কান্নাকাটি করিয়া কিছু চাহিলে এত পুণ্য হয় অত পুণ্য হয়। অবিবাহিত দরবেশ সেই পুণ্য কোথায় পাইবে?

মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমাদের বিশেষ অঙ্গেরও সদকাহ আছে।

সাহাবাগণ আরয করিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেহ যদি স্ত্রী সহবাস করে উহাতে কি তাহার সওয়াব হইবে?

ইরশাদ করিলেন—আচ্ছা বল তো তাহার ইচ্ছাকে যদি সে হারাম স্থানে পূর্ণ করে তবে তাহার পাপ হইবে কিনা?

সকলেই একবাক্যে বলিলেন—হাঁ, পাপ হইবে।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—তোমরা শুধু অন্যায়কেই দেখ ন্যায়ের প্রতি খেয়াল কর না।

কোন কোন দরবেশ বলেন—বিবাহ করিলে ভাত কাপড় দিতে হয়, কিন্তু উপার্জন করা তো অসুবিধাজনক। তাহাদের এই কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আসলে তাহারা পরিশ্রম করিতে ভয় পায়।

সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—এক দীনার যাহা তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর ; এক দীনার যাহা দাসদাসীর জন্য খরচ কর। এক দীনার যাহা তোমরা খয়রাত কর। আর এক দীনার যাহা তোমরা পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট দীনার যাহা পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করা হয়।

সূফীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—বিবাহ করিলে মানুষ সংসারের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে।

সোলায়মান দারানী বলেন—মানুষ যখন হাদীস সংগ্রহের জন্য এবং জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির হয় তখনই সে পৃথিবীর প্রতি ঝুকিয়া পড়ে।

গ্রন্থকার বলেন—ইহাতো শরীয়ত বিরোধী কথা। হাদীস কিভাবে শিক্ষা না করা যাইতে পারে। অথচ তালেবুল এলমদের জন্য ফেরেশতা তাহার পাখা বিস্তার করিয়া দেন।

জীবিকা অর্জনের জন্য কেন চেষ্টা করা হইবে না। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন—স্বীয় জীবিকা অর্জন করার সময় যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তবে জিহাদ করা অবস্থায় মরার চেয়েও শ্রেয় মনে করিব।

বিবাহ কেন করা হইবে না? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—বিবাহ কর এবং বংশ বৃদ্ধি কর।

আবু হামেদ বলেন—সূফীদের কেহ কেহ প্রসিদ্ধ দরবেশ হওয়ার জন্য বিবাহ করে না যেন জনসাধারণ তাহাকে সম্মান দেয় এবং বলে যে অমুক দরবেশ জীবনে রমণীর মুখ দেখেন নাই। অথচ ইহা শরীয়ত বিরোধী কাজ।

তাকরীতি বলেন—মুরীদের কর্তব্য বিবাহ না করা। কারণ বিবাহ তাহার জন্য সলুকের প্রতিবন্ধক। তাহার অন্তরে স্ত্রীর ভালবাসা জন্মিবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি ভালবাসা জন্মিলে সে আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

ইহা খুবই বিস্ময়কর কথা। ইহারা কি এই কথা জানে না যে, মানুষ নিজের পবিত্রতা রক্ষা, সন্তান হওয়া এবং স্ত্রীর পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করিলে সলুক বহির্ভূত হয় না। স্ত্রীর প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা কি আল্লাহর ভালবাসার প্রতিবন্ধক? অথচ আল্লাহ তাআলাই মানুষের প্রতি মেহেরবান হইয়া ইরশাদ করিয়াছেন—

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ـ

আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট আরাম পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা এবং করুণার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে হযরত জাবের হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন—ওহে

জাবের ! তুমি কেন কুমারী মেয়ে বিবাহ করিলে না। যদি করিতে তবে তুমি তাহার সহিত এবং সে তোমার সহিত খেলা করিত।

যে কাজ আল্লাহর ভালবাসা হইতে ফিরাইয়া রাখে এমন কাজে কখনও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে হেদায়াত করিতেন না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করিতেন, হযরত আয়েশার সাথে দৌড়াইতেন। এই সব কি আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রতিবন্ধক ছিল?

যেই সমস্ত যুবক অবিবাহিত থাকে তাহারা তিন প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়।

প্রথম—বীর্যবন্ধক রোগ। বীর্য বহুদিন পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিলে উহার বিষক্রিয়া মস্তিস্ক পর্যন্ত উঠে।

মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া রাযী বলেন—আমি এমন এক সম্প্রদায়কে জানি যাহারা বীর্যবান ছিল। তাহারা দার্শনিক হইয়া সহবাস বাদ দিলে তাহাদের দেহ শুকাইয়া যায় এবং হজমে গোলমাল দেখা দেয়।

সহবাস করে না আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে তাহার পানাহারের কোন ইচ্ছা ছিল না। জোর যবরদস্তী খাইতে বসিলেও সামান্য কিছু খাইয়া উঠিয়া যাইত এবং যাহা খাইত তাহাও বমি করিয়া ফেলিয়া দিত অথবা হজম হইত না। তাহাকে স্ত্রী সহবাস করার উপদেশ দেওয়া হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয়—যেই বিষয় হইতে বিরত থাকে পরিশেষে সেই বিষয়ই মাত্রাধিক চাপিয়া বসে। সূফীদের অনেকেই বিবাহ করা হইতে বিরত ছিল পরে বিবাহ করিয়া মাত্রাধিক সহবাস করার ফলে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা দুনিয়া হইতে যত ভাগিয়াছিল তাহার বেশী আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয়—যুবকদের সহচর্যে থাকে। অর্থাৎ ইহারা বিবাহ করে না। ফলে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহএমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে আত্মসংরক্ষণ করিতে না পারিয়া দাড়ি মোচবিহীন ছেলেদের সাথে কুকর্ম করিয়া দ্বীন দুনিয়া উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

জনসাধারণের উপর শয়তানের ধোকা

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, অজ্ঞ এবং মূর্খ লোকের উপরই শয়তান অতি সহজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাদিগকে যে কত বিপদে ফেলে উহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এখানে শুধু মূলনীতিগুলির উল্লেখ করিব।

শয়তান কোন সাধারণ লোকের নিকট আসিয়া তাহাকে আল্লাহ তাআলার আকৃতি প্রকৃতি এবং তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বাধ্য করে। ফলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর আকৃতি বাস্তবে রূপায়ন করিতে চেষ্টা করে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী করিয়া গিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—এমন এক সময় আসিবে যে মানুষ আশ্চর্য রকমের প্রশ্ন করিবে। তাহারা এমনও বলিবে যে—আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহর সৃষ্টিকর্তা কে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একদিন আমি বসা ছিলাম। এমন সময় একজন ইরাকবাসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া আমি কানে আঙ্গুল দিয়া উচ্চস্বরে বলিলাম—

صدق الله و صدق رسوله الله الواحد انصمدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد -

যখন এই জাতীয় প্রশ্ন কেহ করে বা নিজের মনে উদয় হয় তখন তওবাহ করিয়া বলিবে—আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলে—ইহা কি করিয়া সম্ভবপর যে আল্লাহ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আবার শাস্তি দিবেন। আবার কেহ বলে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীকে অভাবগ্রস্থ এবং পাপীকে কেন ধনী করিয়াছেন? আবার কেহ আল্লাহর নেয়ামতের শোকর গুযারী করে কিন্তু বিপদাপদে পড়িলে সব কিছু বাদ দেয়। এমন কি কুফরী পর্যন্ত করিয়া বসে। আবার কেহ বলে

এমন সুন্দর দেহ তৈরী করিয়া উহা নষ্ট করিয়া কি লাভ? আবার কেহ বিপদাপদে পড়িলে নামায পড়া পরিত্যাগ করে।

আবার কখনও কোন বিধর্মী যদি কোন মুসলমানের উপর জয়ী হয় তখন বলে—তবে আর নামায রোযা করিয়া কি লাভ?

জনসাধারণ আলেম এবং এলম হইতে দূরে পড়িয়া থাকার দরুনই শয়তান তাহাদিগকে এইভাবে বিপদাপন্ন করিয়া থাকে। তাহারা যদি আলেম ওলামাদের নিকট যাইত এবং এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত তবে এই সন্দেহ হইতে পরিত্রাণ পাইত।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের মতামত বজায় রাখার জন্য আলেমদের বিরোধিতা করে। আলেমদের নিন্দাবাদ এবং ছিদ্রাণ্বেষণ করে।

ইবনে আকীল বলেন—আমার দীর্ঘায়ুর মধ্যে যখন কোন ব্যক্তির কাজে হাত দিয়াছি তখনই সে বলিয়াছে ইহা তোমার কাজ নয়। আমি বলিয়াছি—আমি আলেম ব্যক্তি আমার কথা শোন। আমাকে উত্তর দিয়াছে—আল্লাহ তোমার এলমে বরকত দিন। এই কাজ কখনও করিলে বুঝিতে পারিতে ইহা তোমার কাজ নয়।

শয়তানের ধোকায় পড়িয়া জনসাধারণ আলেমের মর্যাদার উপর দরবেশের স্থান দেয়। সুতরাং কোন অজ্ঞ হইতে অজ্ঞতর ব্যক্তিকেও যদি পশমী কম্বল পরিধান করা দেখে তবে তাহাকেই সম্মান করিতে থাকে। আর যদি এই দরবেশ মাথা নামাইয়া চুপ করিয়া থাকে তবে তো কোন কথাই নাই। এই কথাও বলিয়া থাকে যে, কোথায় আলেম আর কোথায় এই দরবেশ। আলেম দুনিয়াদার। আর এই হযরত দরবেশ না ভাল খায়, না ভাল পরে আর না বিয়ে শাদী করিয়া সংসার ধর্ম করিতেছে। কিন্তু তাহারা অজ্ঞতার দরুন এই কথা জানে না যে, দরবেশীর চেয়ে এলমের ফযীলত বেশী? ইহারা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত বাদ দিয়া কোন শরীয়তের অনুসরণ করিতেছে? তাহারা কেন দেখে না যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু বিবাহ করিয়াছেন, মোরগের মাংস, হালুয়া এবং মধু খাইয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন—জনসাধারণকে দেখা যায় প্রায়ই তাহারা বিদেশী

দরবেশকে অধিক ভালবাসে এবং সম্মান করে। নিজের দেশের পীর দরবেশকে তেমন আমল দেয় না। অথচ তাহার কর্তব্য নিজের দেশের দরবেশকে অধিক সম্মান করা এবং তাহার আদেশ নিষেধ মানিয়া চলা।

কেহ কেহ বলে—আল্লাহ মেহেরবান এবং তাহার ক্ষমা অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি তাহার বান্দাদিগকে কখনও আযাব করিবেন না। ইহা তাহাদের খামখেয়ালী। এই খামখেয়ালীর দরুন অনেকেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আবু ওমর ইবনে আলা বলেন—ফরযদক এক মজলিসে বসিয়া আল্লাহর রহমতের বিষয় বর্ণনা করিতেছিল এবং আল্লাহর রহমত প্যাওয়ার বড় ভরসার কথা বলিতেছিল।

লোকে বলিল—তুমি কেন পবিত্র নির্দোষ সম্বন্ধে কুৎসা রটনা কর?

ফরযদক বলিল—আচ্ছা আমাকে বল তো আমি আল্লাহর নিকট যেই পাপ করি, উহা যদি আমার বাবা মার নিকট করি তবে কি তাহারা আমাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে?

সকলেই বলিল—না ; বরং তোমাকে আদর যত্ন করিবে।

ফরযদক বলিল—আমার বাবা মার চেয়েও আল্লাহর উপর আমি অত্যন্ত নির্ভরশীল।

গ্রন্থকার বলেন—ইহা অত্যন্ত মূর্খের কথা। কেননা আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীর অর্থ স্বভাবের কোমলতা নয়। যদি তাহাই হইত তবে কেহ জীবজন্তু যবেহ করিতে পারিত না, কাহারও সন্তান মরিত না এবং কেহই দোযখে যাইত না।

আবু নওয়াসের মৃত্যু সময় ঘনাইয়া আসিলে লোকে বলিল—তওবাহ কর।

আবু নাওয়াস বলিল—তোমরা আমাকে ভয় দেখাইতেছ? ইয়াযীদ রাক্কাশী হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি শাফাআত আছে। আমি আমার শাফায়াত কবীরা গুনাহকারীদের জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছি। এই শাফায়াতপ্রাপ্তকারীদের মধ্যে আমিও যে একজন হইব—ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

গ্রন্থকার বলেন—আবু নাওয়াস দুইটি বিষয়ে ভুল করিয়াছে।

প্রথমতঃ সে আল্লাহর রহমতের দিকটাই দেখিয়াছে শাস্তির দিকটা দেখে নাই। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র তওবাহকারীই আল্লাহর রহমত পাওয়ার ভাগী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ اِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ -

—তওবাকারীকেই আমি ক্ষমা করিয়া থাকি।

আবার কেহ কেহ বলেন—আমি কতটা পাপই করি যে আমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আমি পাপ করিলে আল্লাহর ক্ষতিই বা কি আর পুণ্য করিলে আল্লাহর লাভই বা কি? আমাদের পাপের চেয়ে তাহার ক্ষমা অত্যন্ত প্রশস্ত। আবার কেহ বলে—আল্লাহর নিকট আমার অস্তিত্বই বা কি যে আমি পাপ করিব আর তিনি আমার পাপ মার্জনা করিবেন না।

তাহাদের এই ধারণা অত্যন্ত বোকামী। হয়ত তাহাদের এই ধারণা যে, আল্লাহ তাহার সমতুল্য ব্যক্তিকেই শাস্তি দিবেন।

ইবনে আকীল বলেন—এক ব্যক্তি বলিত আমি কে যে আল্লাহ আমাকে আযাব করিবেন। তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি মারা যায় তখন যদি আল্লাহ বলেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ -

(হে মানব জাতি) তবে তুমিই সেই ব্যক্তি।

কেহ বলে—পরে তওবাহ করিব এবং সৎ কাজ করিব। কিন্তু এরূপ আশাকারীর আশা কখনওঁ পূর্ণ হয় না; মৃত্যু আসিয়া তাহার সব কিছু শেষ করিয়া দেয়। কোন কোন সময় তওবাহ করার সুযোগ হয় না; আবার সুযোগ হইলেও আল্লাহর দরবারে তওবাহ কবুল হয় না। তওবাহ কবুল হইলেও পাপ করার লজ্জা থাকিয়া যায়। আবার কেহ তওবাহ করে কিন্তু তওবাহ ঠিক থাকে না। শয়তান তাহার এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাকে আরও পাপে জড়িত করে।

মুবারক ইবনে ফোযালা বর্ণনা করেন হাসান বলিয়াছেন—শয়তান যখন তোমাকে সর্বদা আল্লাহর অনুগত দেখে তখন সে তোমার জন্য বিলাপ করে। তখন তোমাকে ছাড়িয়া যায়। আবার যখন দেখে তুমি ক্ষণেক ইহা কর ক্ষণেক উহা কর তখন তোমার প্রতি লালায়িত হয়।

কেহ কেহ শয়তানের ধোকায় পড়িয়া বলে, আমি হযরত আবু বকরের বংশধর, হযরত ওমরের বংশধর অথবা অমুক পীরের বংশধর।

দুইটি কারণে তাহারা এমন দাবী করিয়া থাকে।

প্রথমত—যে যাহার প্রতি ভালবাসা রাখে সে তাহার পরিবার পরিজনকেও ভালবাসে।

দ্বিতীয়ত—এই সমস্ত বুযুর্গ শাফাআত করিবেন। সুতরাং পরিবার পরিজনই শাফায়াত পাওয়ার বেশী যোগ্য।

কিন্তু এই দুইটি ধারণাই ভুল। অবশিষ্ট রহিল ভালবাসা। মানুষের ভালবাসার ন্যায় আল্লাহর ভালবাসা নয়। যে আল্লাহর অনুরক্ত আল্লাহ তাহাকেই ভালবাসেন। আহলে কিতাবও তো হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর বংশধর। তাহাদের পিতৃপুরুষ দ্বারা তাহারা কোন প্রকারেই উপকৃত হইবেন না। ভালবাসা প্রতিক্রিয়াশীল হইবে ক্রোধও প্রতিক্রিয়াশীল হইবে।

তারপর বাকী রহিল—শাফাআত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى بِهٖ -

শাফাআত তাহারই করা হইবে যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ রাযী থাকিবেন।

হযরত নূহ (আঃ) যখন তাহার পুত্রকে নৌকায় উঠাইতে ইচ্ছা করিলেন তখন আল্লাহ বলিলেন—

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ -

সে তোমার পরিবারের কেউ নয়।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর শাফাআত তাহার পিতার জন্য আমাদের নবীবরের শাফাআত তাহার মায়ের জন্য আল্লাহর দরবারে কবুল হয় নাই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)কে ইরশাদ করিয়াছিলেন—আল্লাহর নিকট আমি তোমার কোন কাজেই আসিব না। কেহ যদি মনে করে যে তাহার পিতা মুক্তি পাইলে সেও মুক্তি পাইবে—তবে উহার উদাহরণ এই যে তাহার পিতা খাইলে তাহারও খাওয়া হইবে।

আবার কোন কোন লোক নফল ইবাদত বন্দেগীর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া ফরয তরক করে। যেমন কোন ব্যক্তি আযান হওয়ার পূর্বেই মসজিদে আসিয়া নফল নামায পড়িতে আরম্ভ করে। ফরয নামাযে দাঁড়াইয়া ইমামের আগেই রুকূ সেজদাহ করিতে থাকে।

আবার কেহ কেহ ফরয নামায না পড়িতে গেলেও শবে বরাত এবং মেরাজের রাতে মসজিদে ভীড় করে। আবার কেহ ইবাদত বন্দেগী করে, আল্লাহর নিকট কান্নাকাটিও করে কিন্তু অন্যায় কাজ করা হইতে বিরত থাকে না। কেহ কিছু বলিলে উত্তর দেয়—মানুষ ভাল মন্দ সব কিছুই করে—আল্লাহ ক্ষমাশীল ক্ষমা করিয়া দিবেন। আবার কেহ কেহ নিজের মতানুযায়ী ইবাদত করিতে গিয়া ভালর চেয়ে মন্দই বেশী করিয়া থাকে।

আমি এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি কুরআন শরীফ হেফয করিয়া দরবেশ হইয়াছে। পরে পুরুষাঙ্গ কাটিয়া ফেলিয়াছে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য কাজ।

ধনীদের প্রতি শয়তানের ধোকা

ধনীদি .কে শয়তান চারি উপায়ে ধোকা দিয়া থাকে।

প্রথমত—উপার্জনের সময় খেয়াল থাকে না যে তাহাদের টাকা পয়সা কিভাবে উপার্জন হইতেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসিবে যখন তাহারা টাকা পয়সা উপার্জনের বেলায় চিন্তা করিবে না যে উহা হালালভাবে হইতেছে না হারাম পন্থায়।

দ্বিতীয়ত—কৃপণতা। অধিকাংশ ধনী আল্লাহ ক্ষমা করবেন এই আশায় যাকাত দেওয়া হইতে বিরত থাকে। আবার কেহ সামান্য কিছু যাকাত দিয়াই বলে—এতটাই যথেষ্ট। আবার কেহ যাকাত না দেওয়ার টালবাহানা করে। যেমন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাহার সম্পত্তি কোন আপন আত্মীয় স্বজনের নামে হেবা করিয়া দেয়। তারপর আবার ফিরাইয়া লয়। আবার কেহ কোন গরীবকে একখানা কাপড় দিয়া উহার মূল্য ধরে দশ টাকা। অথচ উহার মূল্য কোনমতেই দুই টাকার বেশী হইতে পারে না। যাকাত দানকারী মনে করে ইহাতেই আমার যাকাত আদায়

হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ তাহার খাদেমকে যাকাত দেয়—অথচ উহা খাদেমের মজুরী হিসাবেই পরিগণিত হয়।

যেহাক হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে টাকশালে যখন প্রথম টাকা তৈয়ার হইল তখন শয়তান উহা উঠাইয়া চোখে মুখে লাগাইয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলিল—হে টাকা! তোমার সাহায্যেই আমি আদম সন্তান আমার ভক্তে পরিণত হইবে।

আমাশ শাকীক হইতে বর্ণনা করেন—আবদুল্লাহ বলিয়াছেন—শয়তান প্রত্যেকটি ভাল বস্তু দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ করে। যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহার ধনসম্পদের উপর শুইয়া থাকে এবং তাহাকে দান খয়রাত করা হইতে বিরত রাখে।

তৃতীয়ত—ধনী হওয়ার দরুন নিজকে ফকীর দরবেশ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অথচ ইহা অত্যন্ত দোষণীয়। কারণ, মর্যাদা ঐ সমস্ত ফযীলত হইতে লাভ করা যায় যাহা নফসের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। পাথর সঞ্চয় করার মধ্যে কোন ফযীলত নাই—যাহা নফসের বহির্ভূত বস্তু তাই কোন কবি বলিয়াছেন—

জ্ঞানবানদের নিকট সম্পদ সুখের চেয়ে আত্মার সুখের মূল্য অনেক বেশী। কারণ, মানবের মর্যাদা তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যে অবস্থার মধ্যে নয়।

চতুর্থত—সম্পদশালী লোক অযথা খরচ করে। যেমন কেহ বাড়ী তৈয়ার করিয়া উহার প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকার নকশা করে ছবি আঁকে—যাহা অতি সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা অহংকার প্রকাশ করারই নামান্তর মাত্র। এই সমস্ত কাজ হারাম এবং মাকরূহের পর্যায় পৌঁছে। অথচ তাহার প্রত্যেকটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি করিতে হইবে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—চারিটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত বান্দা আল্লাহর সম্মুখ হইতে যাইতে পারিবে না। প্রথম—তোমার বয়স কি কাজে কাটাইয়াছ; দ্বিতীয়—দেহকে কোন্ কাজে লাগাইয়াছ। তৃতীয়—কি উপায়ে টাকা পয়সা অর্জন করিয়াছ এবং চতুর্থ—কোন্ কাজে টাকা পয়সা বায় করিয়াছ?

কোন কোন ধনী মসজিদ মাদ্রাসা এবং পুল তৈয়ার করাইয়া দেয়। উদ্দেশ্য তাহার নাম ফাটা—লোকে জানুক অমুক ব্যক্তির নামে ইহা হইয়াছে। এইজন্য তাহাকে প্রশ্নবাদ করা হইবে। যদি সে খোদার সন্তুষ্টি বিধানার্থে করিত, তবে আল্লাহর অবগত হওয়া পর্যন্তই যথেষ্ট মনে করিত। যদি তাহাকে বলা হয় যে, তুমি অমুক মসজিদ মাদ্রাসা করিয়া দাও, কিন্তু উহাতে তোমার নামফলক থাকিবে না, তবে সে রাযী হইবে না।

আবার কেহ কেহ রমযান মাসে মসজিদে আলোর ব্যবস্থা করে। অথচ সারাবৎসর মসজিদ অন্ধকার থাকে তখন উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। কারণ, রমযান মাসে তাহার নাম হইবে এই আশায়ই খরচ করিয়া থাকে। অধিকাংশ সময় এই প্রকার আলোর ব্যবস্থা করায় অযথা খরচও হইয়া থাকে। এইভাবে রিয়া তাহার কাজ করিয়া যায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বাতি হাতে করিয়া মসজিদে যাইতেন এবং উহা সম্মুখে রাখিয়া নামায আদায় করিতেন।

কোন কোন ধনীর অভ্যাস দরবেশকে দান খয়রাত করিলে লোকে উহা দেখে। দানকারীর উদ্দেশ্য প্রশংসা কুড়ানো, দরবেশকে অপমানিত করা। আবার কেহ অচল এবং ওজনে কম দীনার দেয় এবং লোকের সামনে দান করে যেন লোকে বলে—অমুক ধনী দীনার খয়রাত করে।

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের নিয়ম ছিল ওজনে দেড় গুণ দীনার ছোট কাগজে জড়াইয়া গরীবদিগকে দান করিতেন। গরীব হাতে লইয়া মনে করিত হয়ত সামান্য কিছু হইবে। যখন খুলিয়া দেখিত এবং ওজন করিত—তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইত।

আবার কোন কোন লোক আপনজনকে না দিয়া অন্যকে দান খয়রাত করে। অথচ আপনজনকে দান করা সবচেয়ে ভাল।

আমাশ হাফসা হইতে বর্ণনা করেন—সোলায়মান ইবনে আমের বলিয়াছেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—গরীবকে দান করিলে এক সদকা এবং গরীব আত্মীয়কে দান করিলে দ্বিবিধ সওয়াব হয়। প্রথম সদকার দ্বিতীয় সেলায়ে রহম অর্থাৎ আপনজনকে উপকার করা।

কোন কোন ধনী জানে যে, আপনজনকে দান করিলে সওয়াব বেশী হয় কিন্তু কোন প্রকার মনোমালিন্য থাকার জন্য দেয় না। তাই আপন জনের দুঃখ দুর্দশা জানা সত্ত্বেও তাহাকে দান করে না। অথচ তাহাকে দান করিলে ত্রিবিধ পুণ্য লাভ হইত। প্রথম—দানের, দ্বিতীয়—আপনজনকে দান করার এবং তৃতীয় নফসের বিরোধিতা করার।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাযিঃ) বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে আত্মীয়ের সাথে শত্রুতা তাহাকে দান করাই শ্রেষ্ঠ দান।

গ্রন্থকার বলেন—কারণ ইহাতে নফসানী খাহেশের বিরোধিতা করা হয়।

কোন কোন ধনী দান খয়রাত রীতিমতই করে কিন্তু পরিবার পরিজনের জন্য খরচ করিতে কৃপণতা করে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—সচ্ছলতার পর যে দান করা হয় উহা শ্রেষ্ঠতর দান। প্রথম তোমার পরিজনকে দাও।

আরও ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা দান কর। এক ব্যক্তি বলিল—

—আমার নিকট একটি দীনার আছে।

—উহা তোমার নিজের জন্য খরচ কর।

—আমার নিকট আরও একটি দীনার আছে।

—স্ত্রীর জন্য খরচ কর।

—আরও একটি আছে।

—ছেলেমেয়েদের জন্য খরচ কর।

—আরও একটি আছে।

—দাস-দাসীর জন্য খরচ কর।

—আরও একটি আছে।

—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।

কেহ কেহ অছিয়ত করার সময় খুব বেশী বেশী করিয়া অছিয়ত করে। মনে করে আমার সম্পত্তি আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব। ফলে উত্তরাধিকারীগণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু এই কথা জানে না যে, সে অসুস্থ হওয়ার সাথে সাথেই তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহার ধনসম্পত্তির সাথে

সম্পর্ক যুক্ত হইয়া যায়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যেই ব্যক্তি অছিয়ত করার সময় খেয়ানত করে তাহাকে 'ওবা'–র নিক্ষেপ করা হইবে। ওবা জাহান্নামের একটি জঙ্গলের নাম।

আমাশ খাইছামা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—শয়তান বলে আদম সন্তান আমার উপর জয়ী হইতে পারে না। জয়ী হইলেও আমি তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দেই। অসৎ উপায়ে আয় করা ; অন্যায় পথে খরচ করা এবং সত্য হইতে বিমুখ থাকা।

দান গ্রহণে শয়তানের ধোকা

দরবেশকে শয়তান দান গ্রহণেও ধোকা দিয়া থাকে। কোন কোন লোক ধনী হওয়া সত্ত্বেও নিজের দারিদ্রতা প্রকাশ করে। এই অবস্থায় সে যদি দান খয়রাত গ্রহণ করে তবে সে দোযখের আগুন জমা করে।

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যেই ব্যক্তি ধনসম্পদ বাড়াইবার জন্য লোকের নিকট যাচঞা করে সে আগুনের অঙ্গার সঞ্চয় করে পরিমাণে উহা বেশীই হউক বা কমই হউক।

কোন ব্যক্তি যদি লোকের নিকট কোন কিছু না চায় এবং দারিদ্রতা প্রকাশের অর্থ এই হয় যে, লোকে তাহাকে দরবেশ বলুক তবে সে রিয়াকার। আর যদি কেহ সম্পদশালী হইয়া উহা প্রকাশ না করে এবং দান গ্রহণও করে না তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক ব্যক্তিকে ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরিধান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তোমার টাকা পয়সা আছে কি? সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেন—জ্বি হাঁ আছে। নবীজী ইরশাদ করিলেন—তবে তোমার উচিত উহা প্রকাশ করা।

দরবেশ অভাবগ্রস্থ হইলে তাহার কর্তব্য নিজের দারিদ্রতাকে গোপন করিয়া রাখা এবং ধৈর্যধারণ করা। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কেহ কেহ কোমরে চাবি রাখিতেন। উদ্দেশ্য লোকে যেন মনে করে তাহার ঘর-বাড়ী আছে। অথচ তাহারা রাতে মসজিদে থাকিতেন।

শয়তানের ফেরেবে পড়িয়া কোন কোন দরবেশ নিজকে ধনীদের চেয়ে ভাল মনে করে। কারণ, ধনী তাহার যাহার প্রতি আসক্ত তাহারা উহার প্রতি অনাসক্ত। ইহা তাহাদের ভুল। কারণ, কোন বস্তু থাকা না থাকার মধ্যে ভাল নিহিত থাকে না ; বরং অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল।

জনসাধারণের অধিকাংশকে শয়তান এই বলিয়া ধোকা দেয় যে স্বভাবগতভাবেই তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাইতে থাক। ফলে ইহাই হয় তাহাদের সর্বনাশের মূল কারণ। উহার মধ্যে একটি এই যে, ধর্ম বিশ্বাসে তাহারা তাহাদের বাপ–দাদার অনুসরণ এবং অনুকরণ করিয়া থাকে। অথচ বিচার করিয়া দেখে না যে, তাহারা সঠিক পথে ছিল কিনা? ইহুদী, খৃষ্টান এবং জাহেলিয়াত যুগের লোক এই প্রকার তাকলিদ বা অনুকরণ করিত।

এইভাবে মুসলমান তাহাদের নামায, রোযা, ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকে ; লোকের দেখাদেখি নামায পড়ে। অথচ সূরা ফাতেহাও ঠিক মত বলিতে পারে না। ইহাও জানে না যে, নামাযের ওয়াজিব ও সুন্নত কি? আর না জানার কারণ এই যে, তাহারা ধর্মকে অযথা একটা কিছু মনে করে। অথচ ব্যবসায় বাণিজ্যের কিছু হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহা জানিয়া লইতে অলসতা বোধ করে না।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই রুকু সেজদা হইতে মাথা উত্তোলন করে। ফলে তাহার নামায বাতেল হইয়া যায়। আবার কেহ কেহ ফরয ছাড়িয়া নফল বেশী পড়ে। অযু করার সময় কোন কোন অঙ্গ শুষ্ক থাকে। ফলে অযু হয় না, অযু না হইলে নামায হয় না।

আবার কোন কোন লোক রমযান মাসে ফরয নামায আদায় করিতে বিলম্ব করে। ইফতারের সময় হালাল হারামের তারতম্য করে না। পরনিন্দা করা হইতে জিহ্বাকে সংযত রাখে না।

কেহ কেহ গণকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে। কেহ কোন কাজ করার পূর্বে গণকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে। ইহাদের ঘরে কুরআন না থাকিলেও অবশ্য পঞ্জিকা থাকে।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে কোন এক ব্যক্তি গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—ইহা কোন বস্তুই নয়। লোকে আরয করিলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! গণকগণ সময় সময় এমন সব কথা বলে যাহা ঠিক হয়।

ইরশাদ করিলেন—জিন সম্প্রদায় সময় সময় আসমানী কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়া তাহার অভিভাবকদের নিকট বলিয়া দেয় এবং উহাই ঠিক হয়। যেমন অন্ধ মোরগ ঠোকর দিয়া একটি শস্যকণা উঠাইয়া লয়। উহা সাথে হাজারও কথা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর নিকট যায় এবং তাহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার নামায কবুল হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যেই ব্যক্তি গণকের নিকট যায় তাহার কথাকে সত্য জানে সেই ব্যক্তি উহার প্রতি অসন্তুষ্ট, যাহা মুহাম্মদের প্রতি নাযিল হইয়াছে।

কোন কোন লোক স্ত্রীর হক পূর্ণভাবে আদায় করে না। কোন কোন সময় স্ত্রীকে মহর মাফ করিতে বাধ্য করিয়া মনে করে যে, তাহার যিম্মা হইতে মহর আদায় করা মাফ হইয়া গিয়াছে। আবার কেহ কেহ এক স্ত্রী হইতে অন্য স্ত্রীকে অধিক ভালবাসে, তাই দেওয়া থোওয়ার ব্যাপারেও পক্ষপাতিত্ব করে। মনে করে ইহাতে আর কি হইবে। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। পরকালে অবশ্য এই জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আর একটি অন্যায় এই যে, শাবান মাসের পনের তারিখে কবর যিয়ারত করিতে যায় ও কবরস্থানে বাতি জ্বালায় এবং বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর হইতে বরকত লাভের জন্য মাটি লইয়া যায়।

কেরামত সম্পর্কে ধোকা

ইবাদতকারীদের মধ্যে কেহ কেহ আকাশে উজ্জ্বল আলো অথবা নূর দেখিতে পায়। যদি এই ধারণা রমযান মাসে হয় তবে বলে শবে কদর দেখিয়াছি। অথবা বলে যে, আকাশের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আবার কখন কখন কেহ কোন বস্তুর সন্ধান করিতে থাকা অবস্থায় হঠাৎ উহা পাইয়া গেলে উহাকে কেরামত মনে করে। অথচ ইহা কখনও কেরামত হয় আবার কখন ইহা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। আবার কখনও শয়তানের কারসাজি অথবা পরীক্ষার জন্যও এমন ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবান লোক এই সমস্ত ঘটনায় কখনও শান্তি পায় না। এমন কি ইহা কেরামত হইলেও নয়।

গ্রন্থকার বলেন—একজন কম জ্ঞানী দরবেশকে শয়তান ধোকা দিয়া কেরামত জাতীয় কিছু দেখাইয়া দিল। ফলে সে নবুয়তের দাবী করিয়া বসিল। সে মসজিদে আসিয়া হাত দ্বারা বিছানা চটকাইত এবং তাহার হাতে যে সমস্ত কংকর আসিত উহা তসবীহ পাঠ করিত। শীতের মওসুমে গরমের দিনের ফল লোকদিগকে খাওয়াইত এবং লোকদিগকে বলিত আস! তোমাদিগকে ফেরেশতা দেখাইয়া দেই। ইহা ছাড়াও সে বহুত আশ্চর্যজনক বস্তু দেখাইতে পারিত। এইভাবে শয়তান তাহার সাথে ঠাট্টা করিত।

একটি ঘটনা

বসরার জনৈক ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস যায় এবং সেখানে হারেসের সাথে তাহার সাক্ষাত হয়। হারেস প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলিল—আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। বসরী বলিল—তোমার কথা তো বেশ ভাল তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখা দরকার।

হারেস বলিল—দেখ।

বসরী সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয়বার বসরী হারেসের নিকট গেলে হারেস পূর্বের কথার পুনরুক্তি করিল।

বসরী বলিল—তোমার কথা আমার মনে বেশ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছে। আমি তোমার উপর ঈমান আনিলাম। তোমার ধর্ম সত্যই আসমানী ধর্ম।

হারেস তাহাকে বলিল—তুমি আমার নিকট থাক।

বসরী সর্বদা তাহার আশে পাশে থাকিয়াই সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। হারেসের কার্যকলাপও গভীর দৃষ্টির সাথে পর্যবেক্ষণ করিতে

লাগিল। বেশ কিছুদিন পর বলিল—এবার আমাকে যাওয়ার অনুমতি দাও।

হারেস জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাইবে?

বসরী বলিল—বসরা গিয়া জনসাধারণকে তোমার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিতে আহবান করিব।

হারেস তাহাকে যাওয়ার অনুমতি দিল।

বসরী বসরায় পৌঁছিয়া খলীফা আবদুল মালেকের তাঁবুর নিকট গিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিল—নসীহত! নসীহত!!

সেনাবাহিনীর লোক জিজ্ঞাসা করিল—কেমন নসীহত।

বসরী বলিল—আমীরুল মোমেনীনের জন্য নসীহত লইয়া আসিয়াছি।

খলীফাকে সংবাদ দেওয়া হইলে বলিলেন—ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকট লইয়া আস।

সেই ব্যক্তি দরবারে উপস্থিত হইলে খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় তোমার নসীহত?

বসরী বলিল—আমি অতি সংগোপনে আপনার নিকট বলিব। খলীফা সকলকে দরবার কক্ষ হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—এবার বল।

বসরী বলিল—হারেস।

হারেসের নাম শুনিতেই তিনি আসন ত্যাগ করিয়া বলিলেন—কোথায় হারেস।

—আমীরুল মোমেনীন। সে এখন বায়তুল মুকাদ্দাসে আছে। অতঃপর এতদিনে সে হারেস সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছিল সকল কিছু খুলিয়া বলিল।

আবদুল মালেক বলিলেন—আমি তোমাকে এখানকার এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দায়িত্ব অর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যাহা বল তাহাই করিব।

বসরী বলিল—আপনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত বাতিগুলি আমার অধীনে করিয়া দিন। প্রত্যেকটি বাতির জন্য একজন করিয়া লোক দিয়া শৃঙ্খলার সাথে রাস্তায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। আমি যখন আদেশ করি তখন যেন তাহারা বাতি জ্বালায়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা করার পর বসরী একা হারেসের গৃহ দ্বারে গেল। দ্বারপ্রান্তে গিয়া দারওয়ানকে বলিল—নবী উল্লাহর নিকট হইতে আমার প্রবেশ করার অনুমতি লইয়া আস।

দারওয়ান বলিল—আল্লাহর নবী এই সময় কাহারও সাথে সাক্ষাত করেন না।

বসরী বলিল—আমার কথা গিয়া বল।

দারওয়ান হারেসের নিকট সংবাদ দিলে হারেস বসরীকে যাওয়ার অনুমতি দিল।

বসরী নির্দেশ দিল—সমস্ত বাতি প্রজ্জ্বলিত কর। সাথে সাথে সমস্ত বাতি জ্বলিয়া উঠিল। অন্ধকার রাত দিনের ন্যায় আলোময় হইয়া গেল।

বসরী তাহার সাথীদিগকে নির্দেশ দিল—তোমাদের পাশ দিয়া যে কেহ পালাইতে চেষ্টা করিবে—তাহাকেই গ্রেফতার করিবে।

এই কথা বলিয়াই সে হারেসের সন্ধানে ভিতরে প্রবেশ করিল। কিন্তু কোথায়ও হারেসকে পাওয়া গেল না।

হারেসের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলিল—তোমরা আল্লাহর নবীকে হত্যা করার জন্য আসিয়াছ। অথচ আল্লাহ তাহাকে আসমানে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।

বসরী তাহাকে তালাশ করিয়া একটি গর্তের মধ্যে পাইল। হারেস সময়ে কাজে লাগিতে পারে এই আশায় প্রথম হইতেই এই গর্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছিল।

বসরী তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় খলীফা আবদুল মালেকের নিকট উপস্থিত করিল। খলীফার নির্দেশ মত হারেসকে বর্শা মারিয়া হত্যা করা হইল।

ওয়ালীদ বলেন—আমি শুনিয়াছি যে, খালেদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া আবদুল মালেকের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন—আমি যদি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে হারেসকে হত্যা করার অনুমতি দিতাম না।

আবদুল মালেক বলিলেন—কেন?

খালেদ বলিলেন—তাহার শুধু আতঙ্ক ছিল। কয়েকদিন অনাহারে রাখিলেই সব ঠিক হইয়া যাইত।

গ্রন্থকার বলেন—কারামতের সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক সূফী বিপথগামী হইয়া গিয়াছে।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করে যে, আজ আমার ছয়টি দেরহামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ, আমি ঋণগ্রস্ত ছিলাম। আমি ফোরাত নদীর তীর দিয়া যাইতেছিলাম। ঘটনাক্রমে আমি ছয়টি দেরহাম পথের উপর দেখিয়া উঠাইয়া লইলাম।

আবু ইবরাহীম নখয়ী তাহাকে বলিলেন—তুমি ইহা দান করিয়া দাও। কারণ ইহাতে তোমার কোন মালিকানা নাই। ফকীহদের কথায় তোমার কর্ণপাত করা প্রয়োজন। দান করার আদেশ এইজন্য দিয়াছিলেন যে, উহাকে সে যেন তাহার কেরামত মনে না করে।

একজন দরবেশ বলেন যে—একদিন আমার অযূ করার প্রয়োজন হইল। এমন সময় দেখি জওহারে তৈরী একটি লোটা এবং রৌপ্য নির্মিত একখানি মেসওয়াক। আমি মেসওয়াক দিয়া মেসওয়াক করিলাম—এবং লোটার পানি দ্বারা অযু করিয়া উহা সেখানেই রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

গ্রন্থকার বলেন—এই অজ্ঞ সূফীর কাজের প্রতি খেয়াল করা দরকার। সে যদি আলেম হইত তবে জানিত যে, রৌপ্য ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে নাজায়েয। ফেকাহ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ছিল না বলিয়াই সে উহা ব্যবহার করিয়া মনে করিয়াছিল যে উহা তাহার কেরামত। যে বস্তু ব্যবহার করা শরীয়তে নিষিদ্ধ উহা দ্বারা আল্লাহ তাআলা কাহাকেও কখন সম্মানিত করেন না। হাঁ তাহাকে যাচাই করার জন্য এমন কিছু প্রকাশ করিতে পারেন।

গ্রন্থকার বলেন—জ্ঞানবানগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, শয়তানের ফাঁদ খুবই কঠিন। তাই সাধারণত যাহা কিছু কারামত বলিয়া মনে হইত উহা হইতে দূরে থাকিতেন। কারণ, তাহাদের উপর যেন শয়তান আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে।

যাহরুনের নিকট আমি শুনিয়াছি—সে বলিত বনের পাখী আমার সাথে কথা বলে।

ঘটনা এই যে—একদিন আমি একটি জঙ্গলে গিয়া শুইয়া ছিলাম। একটি সাদা পাখী আমাকে বলিল—তুমি রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছ।

আমি বলিলাম—হে শয়তান! অন্য কাহাকে ধোকা দে। পাখীটি দ্বিতীয় বার বলিল—নিশ্চয়ই তুমি পথ ভুলিয়াছ। আমি পূর্ববতই উত্তর দিলাম।

তৃতীয়বার পাখীটি বলিল—যাহরুন! আমি শয়তান নই। নিশ্চয়ই তুমি পথ ভুলিয়াছ। আল্লাহ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। এই কথা বলিয়াই পাখিটি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মুহাম্মদ ইবনে উমর আমার নিকট বলিয়াছেন—যুলফার আমার নিকট বলিয়াছেন—আমি রাবেয়ার নিকট গিয়া বলিলাম—ওহে চাচী! তুমি কেন তোমার নিকট কোন আসার অনুমতি দাও না?

রাবেয়া বলিলেন—লোকের নিকট আমার প্রত্যাশাই বা কি? এই তো যে তাহারা আমার নিকট আসিবে এবং আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিবে—যাহা আমি করি না। আমার কানে আসে লোকে আমার সম্বন্ধে বলে—আমি নাকি আমার জায়নামাযের নিচে টাকা পয়সা পাই। আমার খানা নাকি আগুন ছাড়াই রান্না বান্না হয়।

যুলফা বলিলেন—তোমার সম্বন্ধে তো লোক অনেক কিছুই বলিয়া থাকে। লোকে বলে রাবেয়া ঘরে বসিয়াই তাহার পানাহারের বস্তু পায়। একথা সত্য নাকি?

রাবেয়া বলিলেন—ভাতিজা! এমন কিছু আমার ঘরে পাওয়া গেলেও আমি উহা আমার হাত দ্বারা স্পর্শ করি না।

একবার শীতের সময় আমি রোযা রাখি। ইচ্ছা হইল ইফতারের সময় গরম জাতীয় কোন কিছু আহার্য হইলে ভাল হয়। আমার ঘরে চর্বি ছিল। মনে করিলাম—কিছু পিয়াজ হইলে ভাল হইত। এমন সময় দেখিলাম—একটি পাখী কিছু পিয়াজ ঠোঁটে লইয়া আসিল এবং আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। আমি উহা স্পর্শ করিলাম না। মনে করিলাম—হয়ত শয়তান আমাকে ধোকা দেওয়ার জন্য এরূপ করিয়াছে।

ওয়াহাইব সম্বন্ধে আমি শুনিয়াছি যে লোকে স্বপ্নে দেখিত—ওয়াহাইব বেহেশতী। ওয়াহাইব এই কথা শুনিয়া খুব কাঁদিলেন। পরে বলিলেন—আমি ভয় পাইতেছি যে ইহা শয়তানের ধোকা তো নয়?

আবু হাফ্‌স নিশাপুরী সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে—একবার তিনি কিছু সাথী সহ সফরে ছিলেন। তাহারা সকলেই একস্থানে বসা ছিলেন। তিনি তাহার সাথীদের কিছু কথাবার্তা শুনিলেন—যাহাতে তাহার অন্তর সন্তুষ্ট হইল।

এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি বন্য ছাগ তাহার নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া তিনি খুব কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার কান্না কিছুটা থামিলে সাথীরা জিজ্ঞাসা করিল—হে ওস্তাদ! আপনি এতক্ষণ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন—যাহা শুনিয়া আমাদের অন্তর আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু এই জন্তুটি আসিয়া আপনার নিকট বসিতেই আপনি কেন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আবু হাফ্‌স বলিলেন—হাঁ! আমার চারিপাশে তোমাদের সমাবেশ দেখিয়া আমার মন খুশী হইল। আমার মন বলিল—এখন যদি একটি ছাগ পাইতাম তবে যবেহ করিয়া তোমাদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইতাম। এই কথা মনে উদয় হইতে না হইতেই দেখিলাম বন্য ছাগটি আমার নিকট আসিয়া বসিয়া পড়িল।

আমার মনে হইল—আমি ফেরআউনের মত তো নই? সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল—আমার কথায় যেন নীল নদী প্রবাহিত হয়। আল্লাহ তাহার এই প্রার্থনা মনযুর করিয়াছিলেন। সুতরাং, আমি কেন এই ভয় করিব না যে আমার যাহা কিছু পাওনা আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতেই দান করুন এবং পরকালে যেন রিক্তহস্তে থাকি। এই ভয়েই আমি কাঁদিয়াছি।

একজন দরবেশ একটি মাটির পাত্র খরিদ করিয়া উহার মধ্যে মধু রাখিলেন। পাত্রটি মধুটুকু শুষিয়া লইল। সেই ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় সাথে করিয়া পাত্রটি লইয়া যাইত। পাত্রে পানি ভরিয়া উহা হইতে লোকদিগকে পানি পান করাইত। পানি মধুর মত মিষ্টি এবং স্বাদ লাগিত।

গান-বাজনা সম্বন্ধে ধোকা

গানে দুইটি বিষয়ের সমাবেশ হয়। প্রথমত আল্লাহর মহানতা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করিতে এবং তাহার ইবাদত-বন্দেগী ও খেদমতে সর্বক্ষণ হাযির থাকিতে অন্তরকে অলস করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় যে বস্তু শীঘ্র পাওয়া যায় অন্তরকে উহার প্রতি প্রলুব্ধ করে, পূর্ণ করিতে উৎসাহ দেয় এবং যাবতীয় স্পর্শনীয় কামনাকে জাগাইয়া তোলে। ইহার মধ্যে বড় কামনা বিবাহ করা। বিবাহের পূর্ণ স্বাদ পাওয়া

যায় নতুন রমণীর মধ্যে। আর এই নিত্য নতুন স্বাদ হালালভাবে পাওয়া যায় না। তাই মানুষ ব্যভিচারীতে লিপ্ত হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, গান এবং ব্যভিচারীর মধ্যে বিরাট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই দিক হইতে গান অন্তরের স্বাদ আর জিনা নফসের স্বাদের বিরাট অংশ। তাই হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—গান ব্যভিচারীর মন্ত্র।

আবু জাফর তাবারী বলিয়াছেন—কাবীলের বংশধরের সাওবাল নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম গান–বাজনার সূত্রপাত করে। মাহলায়েল ইবনে কীনান সর্বপ্রথম বাঁশি, তবলা এবং সারেঙ্গী তৈয়ার করিলে কাবীলের বংশধর গান–বাজনায় মাতিয়া উঠিল।

হযরত শীশ (আঃ)এর বংশধর পাহাড়ে বসবাস করিত। ইহাদের গান–বাজনার কথা শুনিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া আসিল এবং গান বাজনায় লিপ্ত হইল।

গ্রন্থকার বলেন—গান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রহিয়াছে। কেহ বলেন হারাম আবার কেহ বলেন মোবাহ আবার কেহ মাকরূহ বলিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইল—ইহার মীমাংসা কি? প্রথমে কোন বস্তুর আসল দেখিতে হইবে। তারপর বলা যাইতে পারে যে উহা মাকরূহ না হারাম।

গান বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। অনারবগণ যখন উটের কাফেলায় হজ্জ করিতে যায় তখন তাহারা কাবা যমযম ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া একপ্রকার কবিতা পাঠ করিয়া থাকে।

তদ্রূপ ধর্মযোদ্ধাগণও বীরত্ব কাহিনীপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া প্রতিপক্ষকে যুদ্ধে আহবান করিয়া থাকে। তারপর উট চালকগণও একপ্রকার গান করিতে করিতে উট চালনা করিয়া থাকে। ইহাকে হুদী বলে।

হুদী সম্বন্ধে আবুল বাহতারী ওয়াহাব হইতে তালহার বর্ণনা মতে বলেন—কোন কোন আলেম বলিয়াছেন—এক রাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন হুদী খান (হুদী গায়ক) ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সালাম দিয়া বলিলেন—আমাদের হুদী খান ঘুমাইতেছে। তোমাদের হুদী গানের আওয়াজ পাইয়া আসিলাম। তুমি কি জান—এই হুদী পাঠ কিভাবে প্রচলন হইল?

তাহারা বলিল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

ইরশাদ করিলেন—একবার আরব জাতির পিতৃপুরুষ মুযার তাহার রাখালের নিকট গিয়া দেখিলেন—তাহার উটগুলি এদিক ওদিক ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার খুব ক্রোধ হইল। তিনি একখানি লাঠি দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিলেন।

রাখাল হাতের ব্যথায় দৌড়াইতেছিল আর বলিতেছিল—আমার হাত গেলরে। আমার হাত গেলরে।

উট রাখালের গলার আওয়াজ পাইয়া তাহার নিকট গিয়া সমবেত হইল।

ইহা দেখিয়া মুযার মনে করিলেন—এই প্রকার গান তৈরী করিতে পারিলে সেই গান গাহিয়া উটগুলিকে এক সাথে রাখা সহজ হইবে।

গ্রন্থকার বলেন—আনজাশাহ নামক হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন হুদী খান ছিল। তাহার গান শুনিয়া উট খুব দ্রুতগতিতে চলিত।

সালমা ইবনে আকওয়া বলেন—আমরা একবার রাতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খয়বর যাইতেছিলাম। আমাদের একজন আমেরকে বলিল—আমের তোমার কবিতা কেন আমাদিগকে শুনাইতেছ না? আমের কবি ছিলেন। তিনি নিম্ন অর্থযুক্ত কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন—

"হে খোদা! তুমি তওফীক না দিলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম ; নামায এবং যাকাতও আদায় করিতাম না। হে খোদা! তুমি আমাদের অন্তরে গায়েবী সান্ত্বনা দান কর আমরা যখন শত্রুদের মোকাবেলা করিব তখন আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখিও।"

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবিতা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ইহা গাহিতেছে?

সাহাবীগণ বলিলেন—আমের ইবনে আকওয়া। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—আল্লাহ তাহার প্রতি মেহেরবান হউন।

হযরত শাফী (রহঃ) বলিতেন—বেদুঈনগণ যেই হুদী গায় উহা শুনা ম্যারাত্মক কিছু নয়।

গ্রন্থকার বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথমবার মদীনা তাশরীফ লইয়া যান তখন মদীনাবাসী নিম্ন অর্থযুক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিল—

"বেদা পর্বতের ঘাঁটি হইতে চাঁদের ন্যায় আমাদের উপর এক চাঁদ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দোআকারী খোদার নিকট দোআ করে, এই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা আমাদের পক্ষে ওয়াজিব।"

আবার কখনও মদীনাবাসী গানের সাথে দফ (একমুখী ঢোল বিশেষ) বাজাইতেন।

ইমাম যুহরী উরওয়া হইতে বর্ণনা করেন একবার হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর গৃহে যান। তখন হজ্জের সময় ছিল। তিনি দেখিলেন দুইটি বালিকা হযরত আয়েশার নিকট বসিয়া দফ বাজাইয়া গান গাহিতেছে এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিয়াছেন।

হযরত আবু বকর মেয়ে দুইটিকে ধমক দিলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ হইতে চাদর সরাইয়া ইরশাদ করিলেন—আবু বকর! ইহাদিগকে কিছু বলিও না। এখন ঈদের সময়।

গ্রন্থকার বলেন—সম্ভবত মেয়ে দুইটি কম বয়স্কা ছিল। কেননা, তখন হযরত আয়েশা (রাযিঃ)ও কমবয়স্কা ছিলেন। তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাথে খেলা করার জন্য কমবয়স্কা মেয়েদিগকে ডাকিয়া দিতেন।

জাফর ইবনে মুহাম্মদ বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—উপরোক্ত হাদীসে যে গানের কথা উল্লেখ রহিয়াছে উহা কোন্ প্রকারের গান ছিল?

তিনি বলিলেন—উষ্ট্রারোহীর গানের ন্যায়। যেমন—

اتينا كم اتينا كم -

আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি! আমরা তোমাদের নিকট আসিয়াছি।

আবূ আকীল নুহবা হইতে বর্ণনা করেন—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন—আমাদের নিকট একজন ইয়াতীম আনসার মেয়ে ছিল। তাহাকে একজন আনসারের সাথে বিবাহ দেওয়া হইল। তাহার স্বামীর সাথে বিদায়কারিণীদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন—আয়েশা! আনসারগণ গজল পছন্দ করে। তোমরা কি বলিয়াছিলে?

আমি বলিলাম—বরকতের জন্য দোআ করিয়াছি।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—তোমরা কেন এই গান করিলে না.....

اتينا كم اتينا كم نحيونا نحييكم -

গ্রন্থকার বলেন—এই পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম উহা হইতে জানা যায় যে, তাহারা যেই প্রকার গান করিতেন উহাতে কামোদ্দীপমূলক কিছু ছিল না ; যেমন আজকালের গানে হইয়া থাকে।

দরবেশ সম্প্রদায়ও একপ্রকার কবিতা বা গান করিয়া থাকেন যাহা মানুষকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করে। যেমন তাহাদের কবিতার অর্থ—হে সকাল সন্ধ্যায় অলসতাকারী! তুমি কতদিন আর খারাপকে ভাল মনে করিবে। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে স্থানে আল্লাহর সমীপে সাক্ষ্য দান করিবে, সেই স্থান সম্বন্ধে কেন ভয় করিতেছ না? তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া যাই যে, তোমার চোখ থাকিতেও কেন আলোকিত পথ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছ।

এই প্রকার কবিতা পাঠ করা মোবাহ বা নির্দোষ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই জাতীয় কবিতাকেই মোবাহ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐশী প্রেমের গান মোবাহ বা নির্দোষ।

কিন্তু যে সমস্ত গানে সুন্দরী রমণী এবং মদের বর্ণনা থাকে যাহা শুনিয়া কাম রিপু উত্তেজিত হয়, খেল-তামাশার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করে—যেমন আজকালকার গানে হইয়া থাকে—তদ্রূপ গান করা কখনও জায়েয নহে।

গ্রন্থকার বলেন—গানকে হারাম মাকরূহ অথবা মোবাহ বলার পূর্বে আমাদের মধ্যে জ্ঞানবানদের কর্তব্য নিজকে এবং ভাই-বন্ধুকে নসীহত

করা এবং শয়তানের চক্রান্ত সম্বন্ধে সতর্ক করা। আমরা সকলেই জানি যে, মানুষের স্বভাব প্রায়ই একপ্রকার।

কোন সুস্থদেহী যুবক যদি বলে—কোন সুন্দর আকৃতি দেখিলে তাহার মন প্রতিক্রিয়াশীল হয় না, তাহার ধর্মের কোন ক্ষতি হয় না—তবে আমরা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিব। আর যদি সে তাহার দাবীতে সত্যবাদী হয় তবে মনে করিব যে, সে সুস্থ নয় তাহার কোন রোগ আছে।

গান, গজল জায়েয হওয়া সম্বন্ধে ভুল প্রমাণ

এক তো হযরত আয়েশার হাদীস যে—তাহার নিকট দুইটি মেয়ে দফ বাজাইতেছিল, হযরত আয়েশার কোন কোন বাক্য এই যে—আমার নিকট হযরত আবু বকর আসিলেন—তখন দুইটি আনসার মেয়ে আমার নিকট ঐ কবিতা পাঠ করিতেছিল যাহা বুয়াস যুদ্ধের সময় আনসারগণ পাঠ করিয়াছিল।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বলিলেন—আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের সুর কেন?

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—হে আবু বকর! ইহাদিগকে কিছু বলিও না। প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আছে। আজ আমাদের ঈদের দিন। এই হাদীস এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর বর্ণিত অন্য এক হাদীস—একটি মেয়েকে একজন আনসারের সাথে বিবাহ দেওয়া হইল।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন—হে আয়েশা! বিয়েতে গান বাদ্যের কোন ব্যবস্থা করিয়াছ কি? কেননা, আনসারগণ বিয়েতে গানবাদ্য পছন্দ করে। এই হাদীসও উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্য হাদীস ফোযালা ইবনে ওবাইদ হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—কোন মালিকের তাহার বাঁদীর গান শুনার চেয়ে আল্লাহ তাআলা মিষ্টস্বরে কোরআন তেলওয়াত করার সুরকে অধিক পছন্দ করেন।

আবু তাহের বলেন—এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, গান শুনা

জায়েয। কেননা, কোন হালাল বস্তুকে হারাম বস্তুর উপর কেয়াস করা জায়েয নহে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আল্লাহ তাআলা কোন বস্তুর প্রতি এমন খেয়াল করেন না যেমন খেয়াল করেন গানের আওয়াজের (সুমিষ্ট স্বরে) সাথে কুরআন পাঠ করার দিকে।

হাতেব হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—দফ বাজানো দ্বারা হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় হইয়া থাকে।

তাহাদের দেওয়া প্রমাণের উত্তর এই যে—হযরত আয়েশার নিকট যে দুইটি মেয়ে গান করিতেছিল—উহা ছিল কবিতা। ঐ জাতীয় কবিতায় মানুষের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আসে না। যখন ঐ কবিতা পাঠ হইতেছিল, তখন ছিল হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ এবং তাহারই সম্মুখে। সুতরাং তখনকার যুগের সাথে বর্তমান যুগের তো কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না।

সহীহ হাদীসে কি বর্ণিত হয় নাই যে—হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দেখিতেন যে, এই সময় মেয়েদের মধ্যে কি কি নতুন ভাবের প্রবর্তন হইয়াছে তবে তিনি তাহাদিগকে মসজিদে নামায পড়িতে আসিতে নিষেধ করিতেন।

তাই ফতওয়া দানকারীদের কর্তব্য স্থান কাল পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ফতওয়া দেওয়া। যেমন চিকিৎসক রোগীর অবস্থা, বয়স ইত্যাদির প্রতি খেয়াল করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিয়া থাকেন। কোথায় বুয়াস যুদ্ধের সময়কার পঠিত কবিতা আর কোথায় বর্তমান যুগের দাড়ি মোচবিহীন যুবক বা রমণীদের সুমিষ্ট সুরের গান। ইহাদের গানের বিষয়বস্তু তো প্রেম, বিরহ, প্রেমিকার অঙ্গের সৌন্দর্য এবং সৌষ্ঠব বর্ণনা করা।

আবু তাইয়্যেব তাবারী বলেন—এই হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, গান নাজায়েয। কেননা, হযরত আবু বকর যখন শয়তানের গান বলিয়াছিলেন—তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথায় প্রতিবাদ করেন নাই। হযরত আয়েশার কমবয়স্কা হওয়া এবং

ঈদের দিনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত প্রকার কবিতা পাঠ করার কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) পরিণত বয়সে পৌঁছার পর গান শুনাকে পছন্দ করেন নাই বরং খারাপ মনে করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ছাত্র কাসেম ইবনে মুহাম্মদও গান গাওয়া এবং শুনা নিষেধ করিয়াছেন।

অন্য হাদীসে গায়িকা দাসীর সাথে যে উপমা দেওয়া হইয়াছে উহা দোষণীয় নহে। কারণ, কেহ যদি বলে যে মধুতে আমি মদের স্বাদ পাই তবে উহা দোষণীয় হইবে না। উক্ত হাদীসে উভয় অবস্থায়ই কান লাগানোর সাথে উপমা দেওয়া হইয়াছে। উপমার বেলায় একটি বস্তু হালাল অন্যটি হারাম হইলে তেমন কোন দোষের নয়।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একস্থানে ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা আল্লাহ তাআলাকে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় দেখিতে পাইবে।

এখানে শুধু দেখার উপমাই দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ, যে বস্তু দেখিয়া মানুষ চোখের আয়ত্বে আনিতে পারে মহান আল্লাহ সেইরূপ দেখা হইতে পবিত্র। অর্থাৎ তিনি অসীম।

ফকীহগণ যেমন অযুর পানি সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অযুর পানি মুছিয়া ফেলা উচিত নয়। কেননা, উহা ইবাদতের চিহ্ন। উহা মুছিয়া ফেলা সুন্নত বিরোধী। যেমন শহীদ ব্যক্তির অঙ্গ হইতে রক্ত মুছিয়া ফেলা উচিত নয়।

পানি এবং রক্তকে এই জন্য সমাবেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ই ইবাদতের চিহ্ন। যদিও পানি পবিত্র এবং রক্ত নাপাক।

অবশিষ্ট রহিল দফ বাজানো। তাবেঈনদের একটি দল দফ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। অথচ তখন এই সময়কার মত দফ ছিল না। আজকালকার দফ দেখিলে খোদা জানেন কি করিতেন।

হযরত হাসান বসরী বলেন—পয়গাম্বরদের সুন্নতের মধ্যে দফ বলিতে কোন বস্তু নাই।

আবু উবায়েদ আল কাসেম ইবনে সালাম বলেন—যেই সমস্ত সূফী দফ বাজানো জায়েয বলে তাহারা রাসূলের মহব্বতে ভুল পথের পথিক। আমাদের নিকট দফ বাজানোর অর্থ হইল বিয়ের সময় বাজাইয়া বিয়ের প্রচার করা মাত্র।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বিয়ে শাদীতে দফ বাজানোর অনুমতি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তবলা বাজানো মাকরূহ।

আমর ইবনে সাঈদ বাজালী বলেন—আমি একবার সাবেত ইবনে সাঈদকে তালাশ করিতেছিলাম। তিনি বদর যুদ্ধের একজন মুজাহিদ ছিলেন। তালাশ করিতে করিতে তাহাকে এক বিবাহ মজলিশে পাইলাম। যেখানে কয়েকটি মেয়ে দফ বাজাইতেছিল এবং গান করিতেছিল।

আমি হযরত সাবেত ইবনে সাঈদকে বলিলাম—যেখানে দফ বাজানো এবং গান গাওয়া হইতেছে আপনি সেখানে?

হযরত সাবেত (রাযিঃ) বলিলেন—কেন থাকিব না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে-শাদীতে দফ বাজাইতে অনুমতি দিয়াছেন।

কাসেম হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা বিয়ের প্রচার কর এবং দফ বাজাও।

আবু নাঈম ইস্পাহানী বলেন—বারা ইবনে মালেক সামা (ধর্মীয় গান) পছন্দ করিতেন এবং গুণ গুণ করিয়া গান করিতেন।

গ্রন্থকার বলেন—আবু নাঈম বারা হইতে শুধু এতটাই বর্ণনা করিয়াছেন যে—একদিন তিনি শুইয়া গুণ গুণ করিতেছিলেন।

পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই যে, একটু আধটু গুণ গুণ না করে। কোথায় গুণ গুণ করা আর কোথায় রাগ-রাগিনী সহকারে গান করা।

মুহাম্মদ তাহের তাহার গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন কাওয়ালকে ফরমায়েশ করা সুন্নত। প্রমাণস্বরূপ বলেন—আমর ইবনে শারীদ তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উম্মিয়া রচিত কবিতা হইতে পাঠ করার আদেশ করেন। দুই একটি চরণ পাঠ করার পর ইরশাদ করিতেন—আবার পড়। এই ভাবে আমি একশত কবিতা পাঠ করি।

অন্য স্থানে আবু তাহের গজল শুনা সম্বন্ধে বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একবার এই জাতীয় কবিতা পাঠ করা হইয়াছিল।

طاف الخينان فيها جاسقيما -

স্বপ্নে দুইটি আকৃতি দেখা গেল এবং অসুস্থতাকে বাড়াইয়া দিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন—এই জাতীয় কবিতাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠ করা হইত।

গান-বাজনা হারাম হওয়ার দলীল

আল্লাহ পাক বলেন—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ -

কোন কোন লোক খেল–তামাশার কথা খরিদ করে।

সাঈদ ইবনে জোবায়ের হইতে বর্ণিত আছে—আবুস সাহবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট উক্ত আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ইবনে মাসউদ বলিলেন—খোদার কসম উহার অর্থ গান।

আতা ইবনে সায়েব সাঈদ ইবনে জোবায়ের হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন—উক্ত আয়াতের অর্থ গান বাজনা এবং উহার সমতুল্য অন্য কিছু।

মুজাহিদ (রাযিঃ) বলেন— لَهْوَ الْحَدِيثِ অর্থ গান।

সাঈদ ইবনে ইয়াছার বলেন—আকরামার নিকট— لهو الحديث এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন—উহার অর্থ রাগ রাগিনী।

হাসান সাঈদ ইবনে জোবায়ের, কাতাদাহ এবং ইবরাহীম নাখয়ীও উহার অর্থ গান বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় আয়াত—

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ -

অর্থাৎ তোমরা অলস বা উদাসীন। আকরাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলিয়াছেন—উক্ত আয়াতের অর্থ গান

করা। হামিরিয়া গোত্রের প্রচলিত ভাষা— اسمد لنا। আমাদিগকে গান শুনাও।

মুজাহিদ বলেন— سَامِدُوْنَ শব্দের অর্থ গান।

তৃতীয় আয়াত—

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ -

হে শয়তান! তুমি যাহাকে পার তোমার আওয়াজ দিয়া তোমার অনুগত করিয়া লও।

সুফইয়ান সাওরী লাইস হইতে বর্ণনা করেন—মুজাহিদ (রহঃ) বলিয়াছেন—শয়তানের আওয়াজ অর্থ গান এবং বাদ্যযন্ত্র।

হাদীস দ্বারা এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, নাফে বলেন—একবার আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) কোন রাখালের বাঁশির আওয়াজ শুনিয়া দুই হাত দ্বারা দুই কান চাপিয়া ধরিলেন এবং যানবাহন উল্টাদিকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—নাফে! এখনও কি আওয়াজ শুনা যায়! আমি বলিতেছিলাম—হাঁ! তিনি ফিরিয়াই যাইতেছিলেন।

আমি যখন বলিলাম—না! আর শুনা যায় না। তখন তিনি কান হইতে আঙ্গুল নামাইয়া সাওয়ারী রাস্তার দিকে ফিরাইলেন। তারপর বলিলেন—আমার সম্মুখে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাখালের বাঁশির শব্দ শুনিয়া ঠিক আমার মতই করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার বলেন—সাহাবা কেরামগণই যখন বাঁশির শব্দ শুনিয়া এমন করিয়াছিলেন—তখন আমাদের যুগের গান-বাজনার কথা বলিয়া আর কি হইবে।

কাসেম ইবনে আবু উমামা বলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়িকা দাসী ক্রয়-বিক্রয় করা এবং শিক্ষা দেওয়া নিষেধ করিয়াছেন এবং ইরশাদ করিয়াছেন—ইহাকে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় উহা হারাম।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যেই ব্যক্তি গান করে আল্লাহ তাহার নিকট দুইটি শয়তান পাঠাইয়া দেন। শয়তান দুইটি তাহার দুই দিকে বসিয়া গায়কের বুকে পা দিয়া লাথি

মারিতে থাকে। গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই লাথি মারিতে থাকে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আল্লাহ তাআলা আমাকে গানের শব্দ এবং বিপদের সময়কার শব্দ শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ ইহা নাদানী এবং কলহজনক।

ইকরিমা ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—সারেঙ্গী এবং তবলা সংহার করার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমার উম্মতের মধ্যে যখন পনেরটি স্বভাব দেখা দিবে তখন তাহাদের উপর বিপদাপদ অবতীর্ণ হইবে। উহাদের মধ্যে একটি গায়িকা দাসী এবং গান-বাজনা খরিদ করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—মানুষ যখন রাজস্বকে নিজের সম্পত্তি ; আমানতকে গনীমত, যাকাতকে জরিমানা মনে করিবে ; অন্যের কাজের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবে ; মায়ের কথায় কান না দিয়া স্ত্রীর কথা শুনিবে, বাপকে কষ্ট দিয়া বন্ধুর উপকার করিবে, মসজিদে গোলমাল করিবে, ফাসেক গ্রামের নেতা হইবে ; অপদার্থ দেশের সর্বময় কর্তা হইবে, বিপদাপদ হইতে পারে এই ভয়ে লোক তাহার অনুগত থাকিবে, গানবাজনা এবং উহার যন্ত্রাদি বহুল পরিমাণে প্রচলন হইবে, মদ্যপান করিবে, বর্তমান যুগের লোক পূর্ববর্তী বুযুর্গদিগকে মন্দ বলিবে ; তখন লোক এক লাল তুফানের অপেক্ষায় থাকিবে, ভূমিকম্প হইবে, আকৃতি বিকৃত হইয়া যাইবে, আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হইবে। ইহা ছাড়াও একটি পর একটি বিপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে—যেমন মোতির মালার সুতা ছিঁড়িয়া গেলে একটির পর একটি মোতি খুলিয়া পড়িয়া যায়।

সাহল ইবনে সাআদ হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমার উম্মতের মাটিতে ধসিয়া যাওয়া, আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হওয়া এবং আকৃতি বিকৃত হইয়া যাইবে।

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইহা কখন হইবে?

ইরশাদ করিলেন—গান বাজনার প্রচলন যখন খুব বেশী হইবে এবং মদ্য পান করাকে যখন অন্যায় মনে করিবে না।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলেন—একবার আমরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় আমর ইবনে কাররা আসিয়া বলিল—ইয়া রাসুলাল্লাহ ! আল্লাহ তাআলা আমার অদৃষ্টে হীনতা এবং নীচতাই রাখিয়াছেন। আমার মনে হয় দফ বাজানো ব্যতীত জীবিকা অর্জনের অন্য কোন পথ আমার নাই। আপনি আমাকে গান বাজনা করার অনুমতি দিন, আমি ফাহেশা গান করিব না।

ইরশাদ করিলেন—আমি তোমাকে গান বাজনা করার অনুমতি দিব না এবং স্নেহ প্রীতির চোখেও দেখিব না। হে খোদার দুশমন ! তুই মিথ্যা কথা বলিস। আল্লাহ তোকে হালাল এবং পবিত্র জীবিকা দান করিয়াছেন। আর তুই আল্লাহর দেওয়া জীবিকার মধ্যে হারাম পছন্দ করিতেছিস। আমি যদি তোকে আগে সাবধান করিয়া দিতাম তবে আজ তোকে কঠিন শাস্তি দিতাম। যা আমার নিকট হইতে চলিয়া যা এবং আল্লাহর নিকট তওবাহ কর।

স্মরণ রাখিস ! এই সাবধান বাণীর পরও যদি তাহা করিস তবে তোকে ভয়ানক মার মারিব, তোর আকৃতি বিকৃত করিয়া দিব, তোকে দেশ ছাড়া করিব, তোর আসবাবপত্র মদীনার যুবকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব।

ইহা শুনিয়া আমর সেখান হইতে মলিন বদনে চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—ইহারাই পাপী এবং অবাধ্য। ইহাদের কেহ তওবাহ করা ব্যতীত মারা গেলে হাশরের দিন উলঙ্গ হইয়া উঠিবে। যখনই দাঁড়াইবে পড়িয়া যাইবে।

ইবনে মাসউদ বলেন—গান অন্তরে কপটতা উদগম করে যেমন পানি শাক সবজির উদগম করে। মানুষ যখন বিসমিল্লাহ না বলিয়া চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করে তখন শয়তান তাহার পিছনে বসিয়া বলে গান কর। ভাল ভাল গান না জানিলে বলে—একটু চেচামেচিই না হয় কর।

হযরত ইবনে ওমর এহরাম বাধা কিছু লোকের নিকট দিয়া যাওয়ার

সময় দেখিলেন—তাহাদের মধ্যে একজন গান করিতেছে। তিনি ইহা শুনিয়া বলিলেন—আল্লাহ যেন তোমাদের দিকে ফিরিয়াও না দেখেন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মদের নিকট কেহ গান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—আমি তোমাকে গান গাইতে নিষেধ করিতেছি এবং তোমার জন্য আমি উহা খারাপ মনে করি।

সেই ব্যক্তি বলিল—গান কি হারাম?

কাসেম বলিলেন—ভাতিজা! আল্লাহ তাআলা যখন হক এবং বাতেলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন তখন তুমি গানকে কোন্ পর্যায়ে ফেলিবে?

শাবী বলেন—গায়ক এবং যে গান করায় উভয়ের উপরই আল্লাহর লানত।

আবু হাফস ওমর ইবনে উবায়দুল্লাহ আরমুবী বলেন—হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তাহার ছেলের ওস্তাদকে বলিয়াছিলেন—তোমার শিক্ষা দেওয়ার প্রধান বিষয়বস্তু হইবে তাহাকে গান বাজনার প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া। গান বাজনা শয়তান প্রচলিত করিয়াছে—উহার পরিণতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। আমি সত্যনিষ্ঠ আলেমদের নিকট শুনিয়াছি—গান বাজনার মজলিসে গেলে অন্তরে কপটতার সৃষ্টি হয়।

ফোযায়েল ইবনে ইয়াজ বলিয়াছেন—গান ব্যভিচারীর মন্ত্র।

যেহাক বলেন—গান অন্তরকে খারাপ এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে।

যায়েদ ইবনে ওয়ালিদ বলিয়াছেন—হে বনী উমাইয়া! তোমরা গান বাজনা হইতে দূরে থাক। কারণ গান মানুষের কাম-বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে, মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করিয়া দেয় এবং উহা শরাবের স্থলাভিষিক্ত। আর যদি গান শুনিতেই হয় তবে রমণীদিগকে দূরে রাখ। কারণ, গান ব্যভিচারীর প্রতি আহবান জানায়।

আবদুর রহমান ইবনে আবু যিনাদ তাহার পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে—এক রাতে সোলায়মান ইবনে আবদুল মালেক বহুক্ষণ পর্যন্ত দরবারে বসা ছিলেন। দরবারীগণ চলিয়া গেলে তিনি অযু করার জন্য পানি চাহিলেন। এক দাসী পানি লইয়া আসিল। তিনি অযু করার সময় দাসীকে কোন এক কাজে সাহায্য করার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

দাসীর কোন সাড়া না পাইয়া চাহিয়া দেখিলেন—দাসী উদাসীনভাবে শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়া একটি গানের শব্দ শুনিতেছে। গানের শব্দ সেনাবাহিনীর ছাউনীর দিক হইতে আসিতেছিল। তিনি দাসীকে চলিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়া নিজে সেই গানের সুর শুনিতে লাগিলেন এবং গানের তাৎপর্যও বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর অন্য দাসীকে ডাকিয়া অযু সমাধা করিলেন।

সকালবেলা আম দরবার করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি গান এবং যাহারা গান শুনে তাহাদের বিষয় কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি এমনভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, উপস্থিত সকলেই মনে করিল খলীফার গান শুনার ইচ্ছা হইয়াছে। তাই তাহারা তাহাদের গান সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে লাগিল।

সোলায়মান বলিলেন—তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আমাকে এই সম্বন্ধে আরও অধিক কিছু জ্ঞাত করিতে পারে?

এক ব্যক্তি বলিল—আমাদের নিকট ঈলার দুই ব্যক্তি আছে যাহারা এই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ।

খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা সেনাবাহিনীর কোন্ দিকে থাক? খলীফা যেদিক হইতে আওয়াজ শুনিয়াছিলেন সেই দিকে ইশারা করিলেন।

সোলায়মান তাহাদিগকে দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। একজনকে পাওয়া গেল এবং তাহাকেই দরবারে হাজির করা হইল। সোলামায় তাহার নাম জিজ্ঞাসা করায় বলিল—আমার নাম সমীর।

—তুমি কি রকম গান জান?

—আমি এই বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি।

—কতদিন যাবত তুমি গান গাও না?

—আমীরুল মোমেনীন! গত রাতেও আমি গান করিয়াছি।

—গত রাতে তুমি কোন্ গান করিয়াছ?

গায়ক তাহার গান বলিলে সোলায়মান বুঝিতে পারিলেন তিনি এই গানই গত রাতে শুনিয়াছেন।

খলীফা সোলায়মান তখনই সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—উট

যখন বুলবুলায় উটনী তখন আত্মহারা হইয়া উঠে, নর ছাগ যখন কামোদ্দীপ্ত হইয়া ভ্যা ভ্যা করে মাদী ছাগ মাস্তানা হয় এবং কবুতর বাক বাকুম করিয়া পাখা মেলিলে কবুতরী কামানন্দে নাচিয়া আসে। পুরুষ যখন গান করে নারী তখন কামাতুর হইয়া পড়ে।

খলীফার নির্দেশ মত উক্ত গায়ককে খাসী করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন—এই গানের মূল কোথায়?

লোকে বলিল—মদীনার নপুংসকগণ গানে অভিজ্ঞ এবং অগ্রবর্তী।

খলীফা মদীনার গভর্নর আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমরকে নির্দেশ দিলেন—মদীনার গায়কদিগকে খাসী করিয়া দাও।

মুহাম্মদ ইবনে মানসূরের সম্মুখে কাওয়ালী এবং গজল শ্রবণকারীদের বিষয় উল্লেখ হইলে তিনি বলিলেন—ইহারা আল্লাহর দিক হইতে ধোকা পাওয়া লোক। যদি তাহাদের আল্লাহর প্রতি সততা এবং সৎ আকীদা থাকিত তবে তাহারা কখনও এই সমস্ত কাওয়ালী ও গজল শুনিত না।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে বাত্তাহ আকেবরীর নিকট কেহ গান শুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—আমি গান শুনিতে নিষেধ করি, আলেম সম্প্রদায় উহাকে পাপ মনে করেন। বেওকুফ লোক উহাকে ভাল মনে করে।

তথাকথিত সূফীদের একটি দল গান ও কাওয়ালী শোনে, আল্লাহ ওয়ালাগণ তাহাদিগকে আহমক এবং বেদআতী বলেন। ইহারা নিজেদের দরবেশী প্রকাশ করে, রমণী এবং দাড়ি মোচবিহীন যুবকদের গান শুনিয়া বেহুঁশ হইয়া খোদার প্রেমে মত্ততার ভণ্ডামী করে। সাধারণ লোক মনে করে ইহারাই প্রকৃত দরবেশ।

নাউযুবিল্লাহ। এই সমস্ত জাহেল ভণ্ডদের ভণ্ডামী হইতে আল্লাহ অতি মহান এবং পাক-পবিত্র।

গ্রন্থকার বলেন—এই সমস্ত ভণ্ড দরবেশের দল যখন গান, গজল ইত্যাদি শুনে তখন তাহারা অজদ করে অর্থাৎ জ্ঞানহারা হইয়া যায়, তালি বাজায়, গোলমাল করে। এমনকি কাপড়-চোপড় ছিড়িয়া ফেলে। অথচ ইহা শয়তানের ধোকা। তাহারা তাহাদের এই কাজের সঠিকতা সম্বন্ধে প্রমাণ দেয় যে যখন এই আয়াত—

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থাৎ ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতিশ্রুত স্থান জাহান্নাম—অবতীর্ণ হইল তখন হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) ইহা শুনিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান। তারপর দৌড়াইয়া একদিকে চলিয়া যান। তিনদিন পর্যন্ত তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কোন কোন সূফী বলেন—আমরা আল্লাহর অনেক বান্দা সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে—কুরআন শরীফ তেলওয়াত করিতে শুনিয়া কেহ মারা গিয়াছেন, কেহ বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছেন, কেহ উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন—হযরত সালমান ফারসী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাছাড়া এই হাদীসের কোন সনদ নাই। উপরোক্ত আয়াত মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অথচ হযরত সালমান ফারসী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরত করার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মানুষ কখনও কখন ভয়ে বেহুঁশ হইয়া যায় ঠিকই এবং সে মৃত ব্যক্তির ন্যায় পড়িয়া থাকে। উহার প্রকৃত পরিচয় এই যে, যদি সে কোন প্রাচীরের উপর বসা থাকে তবে সেখানে হইতেও পড়িয়া যাইবে। কারণ, ঐ অবস্থায় তাহার হুঁশ জ্ঞান কিছুই থাকে না। এই অবস্থায়ও যদি সে তাহার পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলে তখন মনে করিতে হইবে যে, উহা তাহার শয়তানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আহমদ ইবনে আতা বলেন—শিবলী শুক্রবার কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকার পর জোরে চিৎকার মারিতেন। একদিন তিনি তাহার আশেপাশের লোকের দিকে তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। তাহার মজলিশের পাশেই ছিল আবু ইমরান আশীবের হালকা। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া সেখান হইতে তাহার লোকজন লইয়া অন্যত্র সরিয়া গেলেন।

গ্রন্থকার বলেন—সকলেরই এই কথা জানা আবশ্যক যে, সাহাবা কেরামদের অন্তর অত্যন্ত পরিস্কার ছিল। তাহারা অজদের অবস্থায় সামান্য কান্নাকাটি ব্যতীত আর কিছুই করিতেন না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ায করিতেছিলেন। এমন সময় একজন লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন—এ আবার কোন লোক যে আমাদের ধর্মকে আমাদের উপর সন্দেহজনক করিয়া তুলিতেছে? যদি সে সত্য হয় তবে সে তাহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিল। আর যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করুন।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন—একদিন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ায করিতেছিলেন। ওয়াযের প্রতিক্রিয়ায় কিছু লোককে কাঁদিতে শুনিলাম। কিন্তু কেহই বেহুঁশ হইয়া গড়াগড়ি দেয় নাই।

আরবাব ইবনে সারিয়া বলেন—একবার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে ওয়ায করিলেন। উহা শুনিয়া আমাদের অন্তর ভয় পাইয়া গেল এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হইল।

আবু বকর আজরাদী বলেন—সাহাবাগণ তো এই কথা বলেন নাই যে, আমরা ওয়ায শুনিয়া হৈ-চৈ করিয়াছি, কাপড় ছিঁড়িয়াছি এবং বক্ষদেশে করাঘাত করিয়াছি বা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছি।

হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর মেয়ে হযরত আসমার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল—

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ যখন কুরআন শরীফ তেলওয়াত করিতেন তখন তাহাদের কি অবস্থা হইত? হযরত আসমা বলিলেন—কুরআনে তাহাদের যে অবস্থা বর্ণিত আছে—ঠিক তদ্রূপই হইত। অথবা এই বলিয়াছিলেন যে—তাহাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হইত। তাহাদের দেহের পশম খাড়া হইয়া যাইত।

আমি বলিলাম—এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক আছে তাহাদের সম্মুখে কুরআন তেলওয়াত করিলে তাহারা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়।

হযরত আসমা ইহা শুনিয়া বলিলেন—আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির রাজীম।

আবু হাযেম বলেন—হযরত ইবনে ওমর (রাযিঃ) কোথাও যাওয়াকালীন দেখিলেন—এক ব্যক্তি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিল—কুরআন শরীফ তেলওয়াত শুনিয়া

তাহার এই অবস্থা হইয়াছে। ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিলেন—আমরা অবশ্য আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু এমনভাবে পড়িয়া যাই না।

উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু বারদাহ বলেন—আমি ইবনে আব্বাসের নিকট বলিতেছিলাম যে, কুরআন পাঠ করিলে খারেজীদের কি অবস্থা হয়। ইবনে আব্বাস বলিলেন—নামায আদায় করার পরিশ্রমে তাহারা ইহুদী নাছারাদের চেয়ে বেশী নয়।

হযরত আনাস ইবনে মালেকের নিকট কেহ বলিল—কোন কোন লোক এমনও আছে যে তাহাদের সম্মুখে কুরআন শরীফ তেলওয়াত করিলে তাহারা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়। হযরত আনাস (রাযিঃ) বলিলেন—ইহা খারেজীদের কাজ।

আমের ইবনে যোবায়ের বলেন—আমি একদিন আমার বাবার নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় গিয়াছিলে? বলিলাম—আমি এমন কিছু লোক দেখিয়াছি—যাহাদের চেয়ে ভাল আর কাহাকেও দেখি নাই। তাহারা আল্লাহর যিকর করিতেছিল এবং প্রত্যেকেই আল্লাহর ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিল। আমি তাহাদের সাথে বসিয়া যিকর করিতেছিলাম।

আমার বাবা আমাকে বলিলেন—আর কোন দিন তুমি তাহাদের নিকট যাইও না। তাহার কথা না শুনিলে তিনি আমাকে বলিলেন—আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তেলওয়াত করিতে দেখিয়াছি। আবু বকর এবং ওমরকেও কুরআন তেলওয়াত করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহারা তো এমন করেন নাই। ইহারা কি তাহাদের চেয়েও খোদাকে বেশী ভয় করে? আমি মনে করিলাম—তাইতো! ইহার পর আমি আর তাহাদের সংশ্রবে যাই নাই।

অতঃপর আমার বাবা আমাকে বলিলেন—বৎস! আল্লাহ তো বলিয়াছেন—

تَفِيْضُ اَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ -

তাহাদের চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়।

অন্যত্র বলিয়াছেন—

تَقْشَعِرُّ جُلُوْدُهُمْ -

তাহাদের দেহের পশম খাড়া হইয়া যাইত।

জরীর ইবনে হাযেম আমাকে বলিয়াছেন—মুহাম্মদ ইবনে সীরিনের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল—আমাদের এখানে কিছুসংখ্যক লোক আছে তাহাদের সম্মুখে কুরআন শরীফ তেলওয়াত করিলে তাহারা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যায়। ইবনে সীরিন বলিলেন—তাহাদের কাহাকেও প্রাচীরের উপর বসাইয়া দাও। তারপর তাহার সম্মুখে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলওয়াত কর। যদি সে পড়িয়া যায় তবে মনে করিও সে তাহার কাজে ঠিকই আছে।

হাসান একদিন ওয়ায করিতেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলে তিনি বলিলেন—যদি খোদার ভয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থাক তবে লোকের নিকট তোমাকে প্রকাশ করিয়া দিলে। আর যদি দেখানোর জন্য করিয়া থাক—তবে সর্বনাশ।

ফোযায়েল ইবনে ইয়াযের পুত্র একদিন এরূপভাবে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলে তিনি বলিলেন—বৎস ! যদি সত্যিকার কিছুই করিয়া থাক তবে তোমাকে অপমানিত করিয়াছ। আর যদি মিথ্যা হয় তবে তোমার সর্বনাশ। অন্য বর্ণনামতে তুমি শেরক করিয়াছ।

এখন যদি কেহ কোন প্রশ্ন করে যে, সত্যই যদি কাহারও অজদ হয় তবে তাহার সম্বন্ধে কি বলিবে?

উহার উত্তর এই যে—অজদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণেই মানুষের মধ্যে একপ্রকার অস্বস্তি এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। অন্য লোক উহা যাহাতে জানিতে না পারে তজ্জন্য যদি থামাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে তবে সে কৃতকার্য হয় এবং শয়তানও তাহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া চলিয়া যায়।

কথিত আছে, আইউব সুখতিয়ানী যখন হাদীস পাঠ করিতেন তখন তাহার অন্তর কোমল হইয়া যাইত এবং তিনি নাক মুছিতেন আর বলিতেন—ইস ! কত সাংঘাতিক সর্দি।

আর যদি সে নিজকে সংযম করিতে না পারে তখনই শয়তান তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব বলেন—একদিন আবদুল্লাহ বাহির হইতে আমার নিকট আসিলেন। এই সময় এক বুড়ী আমার নিকট বসা ছিল।

সে আমার অসুস্থতার জন্য আমাকে ঝাড়ফুঁক করিত। আবদুল্লাহকে দেখিয়া আমি বুড়ীকে খাটের নিচে লুকাইয়া রাখিলাম।

আবদুল্লাহ আমার নিকট আসিয়া বসিলেন এবং আমার গলায় একটি সুতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? আমি বলিলাম—আমার জন্য পড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আবদুল্লাহ উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—মন্ত্রতন্ত্র, ঝাঁড়ফুঁক এবং তোলা করা শেরেক।

আমি বলিলাম—এ কেমন বলিতেছ। অথচ একবার আমার চোখের অসুস্থ হইয়াছিল। এক ইহুদীর নিকট যাইতাম। সে ঝাড়িয়া দেওয়ায় ভাল হইয়া গিয়াছিল। আবদুল্লাহ বলিলেন—ইহা শয়তানের কাজ।

গ্রন্থকার বলেন—তোলা এক প্রকার মন্ত্র যাহা দ্বারা স্বামীকে বশীভূত করা হয়।

আবার যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি কেহ কৃতকার্য না হয় তবে উহাকে শয়তানের ধোকা কিভাবে বলা যাইতে পারে?

উত্তর এই যে, কাহারও মধ্যে এমনিতরই দমন শক্তি দুর্বল। কিন্তু প্রকৃত অজ্ঞদের পরিচয় এই যে, ঐ অবস্থায় সে জানিতে পারে না যে, তাহার উপর দিয়া কি অবস্থা যাইতেছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا -

'মূসা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল।'

কোন কোন লোক গান ও কাওয়ালী শুনিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। প্রমাণস্বরূপ বলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন—

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ

হে আইউব! পা দিয়া মাটিতে লাথি মার।

গ্রন্থকার বলেন—ইহা তো ভুল প্রমাণ। কেননা, হযরত আইউব (আঃ) যদি আনন্দে মাটিতে পা দ্বারা আঘাত করিতেন তবে হয়তো কিছুটা সন্দেহ থাকিতে পারিত। মাটি হইতে পানি বাহির করার জন্য তো তাহাকে পদাঘাত করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

ইবনে আকীল বলেন—বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে মোযেজা দ্বারা পানি বাহির করার জনাই মাটিতে পদাঘাত করার হুকুম দিয়াছিলেন। এখানে নাচার দলীল কোথা হইতে আসিল। যদি ইহাকে নাচার দলীলস্বরূপ গ্রহণ করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা যে মূসা (আঃ)কে পাথরের উপর লাঠি দ্বারা করা হয় তবে আল্লাহ যে মূসা (আঃ)কে পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে বলিয়াছিলেন—উহাকেও কাঠের সারেঙ্গী বাজানোর দলীলস্বরূপ গ্রহণ করা যায়।

নাচা জায়েয হওয়া সম্বন্ধে তাহারা এই হাদীস প্রমাণ স্বরূপ বলে যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আলী (রাযিঃ)কে বলিলেন—আমি তোমার এবং তুমি আমার। এই কথা শুনিয়া হযরত আলী (রাযিঃ) আনন্দে একটু হেলিয়া দুলিয়া পথ চলিতে থাকেন।

অন্য আর একবার তিনি যায়েদ (রাযিঃ)কে ইরশাদ করিয়াছিলেন—তুমি আমার ভাই এবং গোলামী হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত। হযরত যায়েদও তখন খুশীতে একটু হেলিয়া দুলিয়া পথ চলিয়াছিলেন।

আবার কোন কোন সূফী বলেন—হাবশীগণ নাচিয়াছিল এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা দেখিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার বলেন—মানুষের মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয় তখন সে স্বভাবতই একটু হেলিয়া দুলিয়া চলে। কোথায় হেলিয়া দুলিয়া চলা আর কোথায় শয়তানের নর্দন কুর্দন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে বর্শা, বল্লম নিক্ষেপ করার জন্য যে অনুশীলন করা হয়; হাবশীরা তাহা করিতেছিল এবং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাই দেখিতেছিলেন।

ইবনে আকীল বলেন—নর্দন কুর্দন কুরআন শরীফে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَمْشِ فِى الْأَرْضِ مَرَحًا ـ

খুশীর সাথে মাটির উপর দিয়া চলিও না।

আল্লাহ তাআলা গর্ব সহকারে চলাফেরা করাকে দোষণীয় বলিয়াছেন। নাচা এবং গর্বভাবে পথ চলা খুবই খারাপ কাজ।

কবর সম্পর্কীয় বেদআত

কোন প্রকার সন তারিখ, দিন নির্দিষ্ট বা লোক সমাবেশ না করিয়া কবর যিয়ারত করা জায়েয, মুস্তাহাব। বরং সুন্নত। কারণ কবর যিয়ারতে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে। কিন্তু এই নিয়ত ব্যতীত অন্য কোন নিয়তে বহু দূর দূরান্ত হইতে কবর যিয়ারত করিতে যাওয়া, নির্দিষ্ট তারিখে যাওয়া, মেলা করা, বাতি জ্বালানো, কবরের জন্য কবরের পাশে মসজিদ করা, মেয়েদের কবর যিয়ারত করিতে যাওয়া, কবরে চাদর বা গেলাফ দেওয়া, কবর পাকা করা, কবরের উপর কুরআনের আয়াত লেখা, অর্ধ হাতের চেয়ে উঁচু করা, ভাল মনে করিয়া কবরের পাশে নামায পড়া, কবরের খাদেম হওয়া, মসজিদের ন্যায় কবরকে তাযিম করা, কবরের পাশে গান বা কাওয়ালী করা মাকরূহ, হারাম এবং বেদআত।

যাহারা ইহা করে তাহাদের উদ্দেশ্য এই থাকে যে, মৃত বুযুর্গ ব্যক্তি তাহার মনের আকাংখা পূর্ণ করিয়া দিবেন। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেহই কাহারও মনের আশা পূর্ণ করিতে, বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অথচ এই সমস্ত বুযুর্গও আল্লাহর মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাহারই নিকট দোয়া করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে ইহা খৃষ্টান এবং ইহুদীদের কাজ। তাহারা শয়তানের ধোকায় পড়িয়া তাহাদের মৃত বুযুর্গদের কবর পাকাপোক্ত করিয়া উহার পূজা অর্চনা করিত।

ইহুদী সম্প্রদায় হযরত উযাইর (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র মনে করিত। তাহাদের বিশ্বাস তিনি আল্লাহকে বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাই তাহারা হযরত উযাইরের পরলোকগত আত্মার পূজা করিত এবং তাহার নিকট মনের আশা-আকাংখা নিবেদন করিত। তদ্রূপ তাহাদের কোন আলেম দরবেশ মারা গেলেও তাহারা কবর পূজা করিত। খৃষ্টানগণও হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র মনে করে এবং বিশ্বাস করে তিনি আমাদের সম্বন্ধে আল্লাহর নিকট যাহা কিছু বলিবেন—আল্লাহ তাহাই কবুল করিবেন। এই ধারণার বশীভূত হইয়াই লোকে কবর পূজা আরম্ভ করিয়াছে এবং মৃত বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট

মনের আশা–আকাংখা পূর্ণ হওয়ার জন্য আবেদন নিবেদন করিয়া থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ يَقُولُونَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ -

তাহারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সব কিছুর উপাসনা করে যাহা তাহাদের লাভ–লোকসান করার ক্ষমতা রাখে না এবং বলে ইহারা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশকারী। বলুন ! তোমরা কি বল যমীন আসমানের মধ্যে যাহা কিছু আছে আল্লাহ অবগত আছেন। তাহারা যাহা কিছুকে অংশীদার করে আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র।

অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত তাহারা যে সমস্ত দেব–দেবী, কবর বা বুযুর্গদের আত্মার পূজা অর্চনা করে এবং বলে—ইহারা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে ইহা তাহাদের মুখের কথা মাত্র। বরং এই প্রকার পূজারীগণ মুশরিক।

সহীহ বুখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তিনটি মসজিদ বায়তুল্লাহ, বায়তুল আকসা এবং মসজিদে নববী ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করিতে যাইবে না।

অর্থাৎ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে এই তিন স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করা নিষেধ। আগের দিনের লোক তুর পর্বত এবং ইউহান্নার কবর যিয়ারত করার জন্য বহু দূর দূরান্ত হইতে আসিত। আর এই যুগে আজমীর, নজফ আশরাফ, সিলেট ইত্যাদি স্থানে শুধু কবর যিয়ারত করিতে যায়। ইহা শরীয়ত মতে নাজায়েয।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমার কবরকে তোমরা ঈদগাহে পরিণত করিও না। তোমরা আমার জন্য দরূদ পাঠ কর। যেখান হইতেই পাঠ কর না কেন উহা আমাকে পৌছানো হইয়া থাকে।

এই হাদীস দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাইতেছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাযার শরীফের জন্য যখন দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয নহে তখন আর কাহারও কবরের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া উরশ করা জায়েয হইতে পারে না।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন বুযুর্গের জন্য সওয়াব বখশাইতে হইলে কবরের নিকট যাওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহার উদ্দেশ্যে যেখান হইতেই পাঠ করা বা দান খয়রাত করা হয় উহার সওয়াব তাহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—কবর যিয়ারতকারিণীদের উপর আল্লাহর লানত। (ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ইমাম মালেক আতা ইবনে ইয়াসার হইতে বর্ণনা করেন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—হে আল্লাহ! আমার কবরকে দেব মূর্তিতে পরিণত করিও না যে ইহা পূজিত হয়। যাহারা তাহাদের পয়গাম্বরের কবরকে মসজিদে পরিণত করে—তাহাদের উপর আল্লাহর কঠোর শাস্তি হইবে।

মসজিদে ইবাদত বন্দেগী এবং এতেকাফ করা, মসজিদে বাতি দেওয়া অধিক পুণ্যের কাজ। ইহার পরিবর্তে পূর্ববর্তী লোক কবর স্থানে এই সমস্ত কাজ করিয়া ভীষণ শাস্তি পাইয়াছিল।

মুসলিম শরীফে হযরত জুনদুব হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—তোমরা সতর্ক হইয়া যাও। তোমাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদের পয়গাম্বর এবং বুযুর্গদের কবরকে মসজিদে পরিণত করিত। তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করিও না। আমি তোমাদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করিতেছি।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মসজিদকে যেই সম্মান করা হয় তেমনি কোন প্রকারের কোন পীর পয়গাম্বরের কবরকে সম্মান করা জায়েয নহে। যেমন কবরের দিকে দাঁড়াইয়া সেজদাহ করা, প্রদীপ জ্বালানো, গেলাফ বা চাদর বিছানো।

হযরত আবী মারসাদ গানুবী হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে,

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—তোমরা কবরের উপর বসিও না এবং উহার দিক মুখ করিয়া নামায পড়িও না।

মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে কবরের দিকে ফিরিয়া নামায পড়া কুফরী ; মৃত ব্যক্তিকে কেবলাহ হিসাবে পড়া হারাম অথবা অন্য কোন নিয়তে হইলে মাকরূহ তাহরীমি। অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই কবরের দিকে ফিরিয়া নামায পড়া জায়েয নহে।

উপর বসার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম ঠিক কবরের উপর বসা। দ্বিতীয় কবরের খাদেম হিসাবে সেখানে অবস্থান করা। তদ্রূপ কবরের নিকট মেলা বা উরশ করাও নিষেধ।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করিতে এবং কবরের উপর সৌধ নির্মাণ করিতে এবং উপরে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المسجد والسرج -

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—যে সমস্ত মেয়েরা কবর যিয়ারত করিতে যায়, যাহারা কবরের উপর মসজিদ করে এবং যাহারা কবরে প্রদীপ জ্বালায় তাহাদের উপর আল্লাহর লানত। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নেসায়ী)

যে কবরে প্রদীপ জ্বালায় বা যে খরচ দেয় উভয়েই আল্লাহর লানতের ভাগী। জ্ঞানের দিক হইতেও ইহা খারাপ। কেননা, অন্ধকারে আলো জ্বালাইয়া কাজ করিতে হয়। কবরে মৃত ব্যক্তির আলোর কি প্রয়োজন? তদুপরি মৃত ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তবে আল্লাহই তাহার কবর আলোকিত করিয়া দেন। আর যদি পাপী হয় তবে তো আযাবই ভোগ করিতে থাকে। তাছাড়া উপরে বাতিতে কবরের ভিতরে কিভাবে আলোকিত হইবে? কবর যিয়ারতকারিণীদের স্বামীরাও লানতের ভাগী হইবে। কারণ খারাপ কাজে অনুমতি দেওয়া খারাপ কাজ করারই শামিল।

Contents

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—কবর এবং হাম্মামখানা ব্যতীত আর সমস্ত ভূমিই মসজিদ। অর্থাৎ হাম্মাম এবং কবর ব্যতীত আর সকল স্থানেই নামায পড়া জায়েয।

عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد فى الدنيا و تذكر الاخرة -

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন—আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা এইজন্য কবর যিয়ারত কর যে, কবরের নিকট গেলে দুনিয়ার প্রতি মানুষকে অনাসক্ত করে এবং পরকালের স্মরণ করাইয়া দেয়। (ইবনে মাজাহ)

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে কবর যিয়ারত করিতে যাইতে নিষেধই করিয়াছিলেন। তারপর ইরশাদ করিলেন—কবর যিয়ারত করিতে যাও ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হয়। প্রথম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি আসিবে এবং দ্বিতীয় কবর দেখিলে পরকালের কথা স্মরণ হইবে।

কেহ যদি এই নিয়তে কবর যিয়ারত করিতে যায় যে—এই মৃত ব্যক্তি একদিন আমার মতই দুনিয়ায় চলাফেরা করিত, কাজকর্ম করিত, ধনদৌলতের অধিকারী ছিল, ছেলে সন্তানকে স্নেহ করিত। কিন্তু আজ তাহার সেই সমস্ত কোথায় রহিল? আমিও একদিন এইভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া আসিব। তখন সে অবশ্যই পুণ্যের কাজ করিতে থাকিবে। এই অবস্থায় কবর যিয়ারত করিতে যাওয়া দোষণীয় নহে।

আর যদি এই উদ্দেশ্যে যায় যে, মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করিলে আমার বিপদাপদ দূর হইবে, সুখে শান্তিতে থাকিতে পারিব, আমার ধনসম্পদ অধিক হইবে—তখন কোনমতেই জায়েয হইবে না।

সমাপ্ত